রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস

চার খণ্ডে

প্রাচীন জগৎ ও
মধ্য যুগ

আধুনিক কাল

রাশিয়া ও জার্মানি:
উনিশ শতক

পশ্চিম ইউরোপ:
উনিশ শতক

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস

খণ্ড ৩ রাশিয়া ও জার্মানি:
উনিশ শতক

গ্রন্থপদী ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

Anti Duhring · Frederick Engels : a Bengali Translation by Deepak Roy.

প্রকাশিকা : প্রীতি মুখার্জী, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক : অমি প্রেস, ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ১৯৫৯ ।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

সূচি

ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির রাষ্ট্র ও আইন ইনস্টিটিউটের গবেষক গোষ্ঠী এই যে গ্রন্থটি প্রকাশ করছেন সেটি চার খন্ডে রাজনৈতিক ও আইনী মতবাদের ইতিহাস বিষয়ক প্রকাশনার তৃতীয় খন্ড। পূর্বোক্ত যে দুই খন্ডে প্রাচীন জগৎ ও মধ্য যুগের (খন্ড ১), এবং আধুনিক কালের (১৮ শতক অবধি -- খন্ড ২) রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ অনুসরণ করা হয়েছে, আশা করি তার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় আছে।

গত শতকে রুশ ও জার্মান মনীষীরা রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ধারণার প্রবর্তন করেছেন, এবার আমরা তার বিশ্লেষণে মনে দেব। এই ধারণাগুলিকে একটা গ্রন্থে আলোচনা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

সর্বাগ্রে উল্লেখ্য যে রাশিয়া ও জার্মানি (ইংলন্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স থেকে যেখানটায় পার্থক্য) উনিশ শতকে প্রবেশ করেছে বুর্জোয়া বিপ্লব প্রসূত আমূল সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে না গিয়ে। পুরনো, সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাঁড়াশিতে আটক উভয় দেশের পক্ষে সেরূপ পরিবর্তন ছিল তখনো ভবিষ্যতের ব্যাপার।

রাশিয়া ও জার্মানির রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় তত্ত্বের গতিপথে একগুচ্ছ সমাপতন ও সমান্তরালের কারণ উভয় দেশের সামাজিক-ঐতিহাসিক বিকাশ পথের সাদৃশ্য, সেই সঙ্গে জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে বিদ্যমান প্রখর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। মহান ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের মতো ঘটনাও প্রভাবিত করে উভয় দেশের আত্মিক জীবনকে। এসবের ফলে উনিশ শতকের রাশিয়া ও জার্মানির রাজনৈতিক-আইনী চিন্তাকে একসঙ্গে আলোচনার যুক্তি ও ঔচিত্য থাকে।

পূর্বেও এবং বর্তমান গ্রন্থটি সংকলন প্রসঙ্গে লেখকবৃন্দ যে মৌল বিবেচনায় চালিত হয়েছেন, সেটা হল ইতিহাস ও সমকালের মধ্যে দ্বান্দ্বিক প্রভাবপাতের নীতি, যেটা রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক মতবাদের বিকাশে একটা বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। যথোচিত রূপে এ নীতির বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে ক্ল্যাসিকাল মতবাদগুলির 'নতুন জীবন' জানা চাই, ভালো করে ভেবে দেখতে হবে কেন তা জরুরি, আমাদের কালে যে ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম চলছে, তাতে তাদের আকর্ষণের বৈশিষ্ট্য বুঝতে হবে।

পূর্ববর্তী দু'টি গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থেও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের যেমন 'পোট্রেটধর্মী', তেমনি ধারণামূলক বিবরণকে মেলানো হয়েছে। অন্য কথায়, সর্বাগ্রে আলোচিত হয়েছে তেমন সব মনীষীর রচনা যাঁরা স্বকালের কতকগুলি প্রধান সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবণতাকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পেরেছেন, রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক বিজ্ঞানে তাঁদের সমকালীন ও উত্তরকালীন বিকাশে যাঁরা লক্ষণীয় প্রভাব ফেলেছেন। তবে লেখকেরা এক-একজন মনীষীর চিন্তাকে সাধারণ রাজনৈতিক-আইনী ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করেন নি, কেননা কোনো একটা ঐতিহাসিক পর্বের বিভিন্ন ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা দেখা দেয় না। এখানে সেগুলির উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা টিপিক্যাল নিদর্শন হিশেবে, যাতে সবচেয়ে স্পষ্টাকারে প্রকাশ পেয়েছে রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় চিন্তার ধারণামূলক ধারা, শ্রেণী সমাজের রাষ্ট্রীয় ও আইনী জীবনের ব্যবহারিক কাজ, রাষ্ট্রবিদ্যা ও ব্যবহারশাস্ত্রের তাত্ত্বিক সমস্যা উপস্থাপন ও সমাধানের বৈশিষ্ট্যসূচক পদ্ধতি।

বইটি নিম্নলিখিত লেখকদের রচনা: ল. স. মামুত — ভূমিকা, ১ম অধ্যায়, উপসংহার; প. স. গ্রাৎসিয়ানস্কি — অধ্যায় ২য়, ৪র্থ; ন. ন. দেয়েভ — অধ্যায় ৫ম; ভ. স. নের্সেসিয়ান্‌ৎস — অধ্যায় ৬ষ্ঠ।

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকে রাশিয়া ও জার্মানিতে রাজনৈতিক ও আইনী মতবাদ বিকাশের সাধারণ চরিত্রলক্ষণ

আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিক্ষণে রাশিয়া তার বিকাশের নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। সামন্ত-তান্ত্রিক-ভূমিদাসপ্রথার ভাঙনের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। অনেক দ্রুততর বেগে বাড়তে লাগল স্বাধীন মজুরি-শ্রম নিয়োগে উৎপাদন। কৃষিতে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ল পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ক, দৃঢ় হল নিখিল রুশ বাজার। অর্থনীতিতে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হল পুঁজিবাদী ধারা। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রগতিশীল এই প্রক্রিয়ায় বাধা দিচ্ছিল জমিদারদের নিকট কৃষকদের ভূমিদাসমূলক অধীনতা, পরারাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক-আইনী আমল। সামাজিক যে বিরোধ পরিপক্ক ও তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছিল, তাতে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ জাগে, জমিদারদের অমানুষিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রকাশ্যই বিদ্রোহও দেখা দেয়। অধিবাসীদের বিভিন্ন যেসব গ্রুপ বিদ্যমান আমলের সংস্কারে আগ্রহী এবং অচল হয়ে পড়া ব্যবস্থা ও তার প্রতিষ্ঠানাদির পুনর্গঠন দাবি করছিল, অবজেকটিভ ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ প্রকাশক সামাজিক স্তরগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠল।

রাশিয়ায় গড়ে-ওঠা পরিস্থিতি, আ. ন. রাদিশ্চেভের এবং পশ্চিম ইউরোপীয় জ্ঞানপ্রচারণী মতবাদের প্রভাবে দেখা দিল স্বাধীন ভাবনার

একসারি মনীষী। দেশে যে সামাজিক অন্যায়, অধিকারহীনতা ও পীড়ন ছিল তার প্রচণ্ড নিন্দা করেন রুশ আলোকদাতারা (তথা আইনবিদেরাও); মাঝে মাঝে তাঁরা স্বৈরতন্ত্রবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিও প্রকাশ করেছেন। বিশেষ জোর দিয়েছেন তাঁরা লোকেদের আলোকপ্রাপ্তি, শিক্ষা ও নৈতিক লালনে। সর্বাগ্রে রাজাদের বিচারবুদ্ধির কাছে, সুশিক্ষিত অভিজাতদের হৃদয়ধর্মের কাছে তাঁদের একান্ত আবেদন এরই সঙ্গে জড়িত। তাঁদের ডাক দেওয়া হয় আলোকদাতা দার্শনিকদের প্রেরণায় নিজেদের শিক্ষিত করে তুলে, তাঁদের নীতিগুলি মেনে নিয়ে তারপর রাষ্ট্রের সমস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যথাপ্রয়োজনীয় পুনর্গঠনে সহায়তা করার জন্য।

স্বাভাবিক বিধি ও সামাজিক চুক্তির তত্ত্বকে বিকশিত করে উনিশ শতকের গোড়াকার বহু রুশ আলোকদাতা তা থেকে সামন্ততন্ত্রবিরোধী সিদ্ধান্ত টানেন। তাঁদের চেষ্টা ছিল বিজ্ঞ ও মানবিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রে ব্যক্তি, বাক্য ও ধর্মের স্বাধীনতা রক্ষা, ব্যক্তিগত মালিকানার অলঙ্ঘনীয়তার নিশ্চিতি দান, জ্ঞানের দরজা হাট করে খুলে দেওয়া, সমাজের কাছে উপকারী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা। এইসব প্রয়াসের বুর্জোয়া-উদারনৈতিক, অংশত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক চরিত্র স্বতঃস্পষ্ট, যেমন স্বতঃস্পষ্ট এরূপ শুভ কামনা কী উপায়ে কার্যকর করা যাবে তার অনুল্লেখও। পুরনো ক্ষমতার যে কর্ণধারেরা প্রাপ্ত সম্পদটুকু আঁকড়ে ধরে আছে, তাদের বিচারবুদ্ধি, বিবেক, ইচ্ছা নীতিগতভাবে কিছুটা নবপ্রবর্তনার হাতল হতে পারে না।

রাশিয়ার শাসক মহল বিশেষ করে ১৮১২ সালের পিতৃভূমির যুদ্ধে বিজয়ের পর যে বিরোধী মনোভাব জেগে উঠতে থাকে তাতে ভয় পেয়ে জমিদার-ভূমিদাস মালিক শ্রেণীর প্রভুত্বের কঠোরতর ব্যবস্থার দিকে পদক্ষেপ করে। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া চলে ভাবাদর্শীয় প্রতিক্রিয়ার হাত ধরে। এটা প্রকাশ পায় সর্বাগ্রে বিজ্ঞানকে হীন করা, দর্শনকে সনাতন ধর্মের অধীন করা (উভয়কেই স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার সেবাদাসত্বে লাগিয়ে), অচল হয়ে পড়া পিতৃতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক-ভূমিদাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠানাদির জয়গান গাওয়ার ব্যবস্থা সমষ্টিতে।

রক্ষণশীলতার ভাবনা পৃষ্ঠপোষকতা পায় প্রখ্যাত রুশ ঐতিহাসিক ন. ম. কারামজিনের (১৭৮৬-১৮২৬) রচনায়। ১৮১১ সালের মার্চে সম্রাট প্রথম আলেক্সান্দরকে প্রদত্ত তাঁর বিখ্যাত 'নূতন ও প্রাচীন রাশিয়া সম্পর্কে লিপি'তে তিনি এই ভাবনা প্রতিপন্ন করেন যে সেরা রাজনৈতিক ব্যবস্থা

হল জারের স্বৈরতন্ত্র, যার কাজ হল ভূমিদাসপ্রথা ও অভিজাতদের একাধিপত্য (বিশেষ করে কৃষকদের ওপর জমিদারদের ক্ষমতা) রক্ষা করা। কারামজিনের মতে, রাজপুরুষেরা (মন্ত্রিগণ সহ) জার-প্রভুর সেবক, কেবল তাঁর কাছেই তারা জবাবদিহি করবে। জারের প্রতি বিশ্বস্ত জমিদাররা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিচারক্ষমতার ফলে কার্যত হয়ে দাঁড়ায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পুলিস-মাস্টার এবং রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার খুঁটি।

'লিপি'তে বলা হয়েছে যে স্বৈরপ্রভুর যেকোনো দ্বিধাতেই ভয়ানক তোলপাড় ঘটবে এবং রাশিয়া দুর্বল হয়ে পড়বে। কারামজিনের মতে, 'বর্বর জনগণ স্বাধীনতা ভালোবাসে, বিজ্ঞ জনগণ ভালোবাসে শৃঙ্খলা, আর স্বৈরপ্রভুর ক্ষমতা ছাড়া কোনো শৃঙ্খলাই থাকে না।' রাষ্ট্রিক প্রশ্নের সমাধানে অংশ নেবার কোনো অধিকার নেই প্রজাদের। তাদের কাজ হল বিনা গুঞ্জনে ক্ষমতার অধীনস্থ হওয়া, রাজার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা, সর্বদা সহিষ্ণুতা ও বশ্যতা অবলম্বন করা। কারামজিনেব মতে, জনগণের শক্তি 'অধীনতার শক্তিতে'। এটা মানতে হবে যদি সিংহাসনে বসে টাইর‍্যাণ্ট (প্রজাপীড়ক সর্বেসর্বা), তাহলেও। টাইর‍্যাণ্টের শাসন সহ্য করে যেতে হবে ভগবানের শাস্তি হিশেবে। স্বৈরক্ষমতা পবিত্র। সেটা হল রাশিয়ার শ্রীবৃদ্ধির গ্যারাণ্টি, তাতে কোনো রকম পরিবর্তন, কোনো রকম সংস্কার সাধন করা চলবে না, কেননা 'রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্ববিধ নূতনত্বই হল অভিশাপ'।

জারের স্বৈরক্ষমতাই হল প্রধান কারিকা যাতে নির্ধারিত হচ্ছে রাশিয়ার সমস্ত ঐতিহাসিক বিকাশ. এমনধারা পক্ষপাতী ভ্রান্ত ধারণাই রয়েছে কারামজিনের মহাগ্রন্থ 'রুশ রাষ্ট্রের ইতিহাস'এর মূলে। লেখকের পরিকল্পনা অনুসারে. এ রচনাটির উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ নাগরিকদের এইটে দেখানো যে 'বাহ্য ব্যাপারাদির' অসম্পূর্ণতা, (সুতরাং সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটিও) 'সমস্ত যুগেই সাধারণ ঘটনা হিশেবে' দেখা দিয়েছে। এইভাবে কারামজিন রুশ পরারাজতন্ত্রের নিষ্ঠুব জনবিরোধী শাসনকে ন্যায়সঙ্গত ও চিরস্থায়ী করে তুলতে চেয়েছেন।

অধিপতি শ্রেণীদের নরমপন্থী-উদারনৈতিক গ্রুপটার অবস্থান নেন ম. ম. স্পেরানস্কি (১৭৭২-১৮৩৯), যিনি একসময় শাসনযন্ত্রে উচ্চ কতকগুলি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের গোড়াকার অনেক রুশ আলোকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মতো তিনি ভলটেয়ার ও দিদেরোর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দেকার্ত, লেইবনিট্স, নিউটন, কন্দিলিয়াকের রচনা তিনি পাঠ করেন; কাণ্ট, ফিখ্টে, শেলিঙ্গের দার্শনিক

ধারণাদি তাঁর জানা ছিল। বেনথামের উপযোগবাদও তাঁর ওপর নির্দিষ্ট একটা প্রভাব ফেলে, যাঁর ধারণাকে তিনি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন তাঁর রচিত রাষ্ট্রিক সংস্কারের প্রকল্পে (১৮০২, ১৮০৩, ১৮০৯ সাল)।

স্পেরানস্কি এই থেকে এগোন যে সামন্ততান্ত্রিক-ভূমিদাস সমাজ ও তদুপযোগী রাষ্ট্রপাটের দিন ফুরিয়েছে, সেই জন্য 'একেবারে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিকে' নাকচ করা দরকার। পুরনো সমাজব্যবস্থা যেহেতু সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে, তাই, স্পেরানস্কির মতে, নতুন ব্যবস্থায়, নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চলে আসা উচিত। যে স্বৈরক্ষমতা দাঁড়িয়ে ছিল ভূমিদাসপ্রথার ওপর এবং পুলিস-রাষ্ট্রে রূপ নিয়েছিল, তার বদলে এমন প্রথা প্রবর্তন করা উচিত যা ভূমিদাসপ্রথাকে উচ্ছেদ করবে, নির্ভর করবে নাগরিকদের ইচ্ছা, আইনানুগত্য, জনগণের আলোকপ্রাপ্তির ওপর, দেশের অর্থনীতির প্রখর বিকাশ থেকে তা শক্তি আহরণ করবে।

স্বৈরক্ষমতার স্থলে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য, কেননা শাসনের রূপ যখন সমাজের বিকাশের মাত্রা থেকে পেছিয়ে পড়ে, তখন সর্বদাই 'বেশি বা কম ঝাঁকুনি খেয়ে তার উচ্ছেদ হয়'। এরূপ বদল যদি ওপর থেকে সংস্কারের মাধ্যমে না ঘটানো হয়, তাহলে তা অবশ্যই ঘটবে নিচু থেকে বিপ্লবের ফলে। তবে বৈপ্লবিক ঝাঁকুনি হোক, এটা স্পেরানস্কি একেবারেই চান না। ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের ঘটনাবলিতে, বিশেষ করে জ্যাকোবিন একনায়কত্বের ব্যবস্থাদি দেখে তিনি ভীত। জার নিজেই স্বৈরাচারী ধরনের শাসন তুলে নিন এই আহ্বান করেছেন তিনি, কেননা অন্যথায় 'বল্গাহীন যথেচ্ছাচার ও অরাজকতাই হবে মুক্তির একমাত্র উপায়'।

ক্রমে ক্রমে, পর্যায়ে পর্যায়ে ভূমিদাসপ্রথা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেবার পরিকল্পনা করেন তিনি। সেই সঙ্গে জমিদারি সম্পত্তিকে (যেমন ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পত্তিই) অলঙ্ঘনীয় বলে স্বীকার করেন। রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের যে প্রকল্প তিনি রচনা করেন তার তাত্ত্বিক ভিত্তি হল ক্ষমতার সেই রূপ বিভাগ যা বিকশিত করেছিলেন জ. লক ও ড. হিউম। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব দেন তিনি: ভলোস্ত, অক্রুগ, গুবের্নিয়ার[১] দুমা। এই ব্যবস্থাটার শীর্ষে থাকবে রাষ্ট্রীয় দুমা যার ওপর ন্যস্ত থাকবে আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা। এই শেষোক্তের অনুমোদন ছাড়া কোনো আইন বলবৎ হতে পাববে না। কিন্তু আইন অনুমোদনের অধিকার রেখে দেওয়া হল সম্রাটের জন্য, যাঁর হাতে কেন্দ্রীভূত

থাকবে সমস্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা। তাহলেও স্পেরানস্কি রাষ্ট্রীয় দুমার কাছে মন্ত্রীদের বাধ্যবাধকতা এবং যেমন মন্ত্রীদের তেমনি তাঁদের অধস্তন কর্মচারীদের কাজকর্মের সমালোচনার জন্য সংবাদপত্রের কিছুটা স্বাধীনতা তিনি প্রয়োজন জ্ঞান করেছিলেন।

স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে 'সত্যকার' রাজতন্ত্রে রাশিয়ার উৎক্রমণকে স্পেরানস্কি জড়িত করেছেন প্রজাদের সাম্প্রদায়িক বিভাগে বদলের সঙ্গে, এবং প্রজাদের অধিকারের প্রশ্নে এসেছেন। তিনি নাগরিক ('ব্যক্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা') ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে তফাৎ করেছেন। প্রথমটিকে তিনি বোঝেন বুর্জোয়া অর্থে। রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাখ্যায় কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক-সম্প্রদায়ভেদী ধারণার প্রবল প্রভাব পড়েছে। স্পেরানস্কির মতে, রাজনৈতিক অধিকার (সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভোটাধিকার, রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত হবার, আইনপ্রণয়নে অংশ নেবার অধিকার) থাকতে পারবে কেবল স্থাবর সম্পত্তির মালিকদের (অর্থাৎ কার্যত ভূস্বামীদের)। এসব অধিকার কারুজীবী, শ্রমিক, দিনমজুর, বাড়ির চাকরদের দেওয়া চলবে না, পুঁজি হিশেবে তাদের যদি সম্পত্তি থাকে, তাহলেও।

স্পেরানস্কির পরিকল্পনা কার্যত বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। তখনো প্রভুত্বকারী এবং শক্তিধর জমিদার শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল তা। ভূমিদাসমালিক অভিজাতদের প্রতিবাদ ও হুমকিতে স্পেরানস্কির রাজসেবার অবসান হয়। তবে উনিশ শতকের ২০ ও ৩০-এর দশকে তিনি জার স্বৈরক্ষমতার বিশ্বস্ত সেবক বলে নিজেকে দেখান, নিজের উদারনৈতিক ঝোঁক ঘুচিয়ে দেবার জন্য তিনি ডিসেম্ব্রিস্টদের ওপর সম্রাট প্রথম নিকোলাইয়ের দলনাভিযানে সক্রিয় অংশ নেন। ১৮২৫ সালের ১৪ ডিসেম্বরের এই অভ্যুত্থান পরাস্ত হয়।

সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে ডিসেম্ব্রিস্টদের আগমনে রাশিয়ায় সূচিত হয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত। প্রথম রুশ বিপ্লবীরা ছিলেন প্রধানত অভিজাত (অনেকে আবার সৈন্যবাহিনীর অফিসারও)। তবে বিচারবুদ্ধি ও বিবেক থেকে তাঁরা এই প্রত্যয়ে আসেন: ভূমিদাসপ্রথা হল স্বদেশের পক্ষে প্রচণ্ড অভিশাপ। তাঁরা পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে ভূমিদাসপ্রথা ও স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ হল রাশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ও অবিলম্ব একটা কর্তব্য। ডিসেম্ব্রিস্টরা ছিলেন দৃপ্ত দেশপ্রেমিক, নব ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁরা চেয়েছিলেন সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভর করে বিপ্লব ঘটাতে, স্বৈরতন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথার উচ্ছেদ করে দেশে সাংবিধানিক ব্যবস্থার

প্রবর্তন করতে। এ ব্যবস্থার যে প্রকল্প বিপ্লবী অভিজাতরা রচনা করেছিলেন তা রূপায়িত হতে পারলে রাশিয়ার বিপুল একটা অগ্রপদক্ষেপ ঘটত। এইসব প্রকল্পে যে ব্যবস্থার কথা ছিল তাতে (তা কার্যকৃত হলে) প্রভুত্বকারী জমিদার শ্রেণীর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানা যেত, ভূমিদাসপ্রথা ও স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ হত। এক কথায়, তাতে রাশিয়ার সে সময়ের পক্ষে প্রগতিশীল পুঁজিবাদী বিকাশের দরজা খুলে যেত।

ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রকল্পগুলি ছিল 'উত্তরী সমাজ' ও 'দক্ষিণী সমাজে' — এগুলি হল গুপ্ত রাজনৈতিক সংঘ যাতে সংগঠিত হয়েছিলেন ডিসেম্ব্রিস্টরা।

তাঁদের প্রত্যয় গঠনে খুবই প্রভাব ফেলে ১৮১২ সালের পিতৃভূমির যুদ্ধ (এ'দের অনেকেই তাতে যোগ দিয়েছিলেন) যা নেপোলিয়নীয় প্রভুত্ব থেকে ইউরোপীয় জনগণকে মুক্ত করে। ডিসেম্ব্রিস্টদের চেতনায় অক্ষয় ছাপ রেখে যায় যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং বিশেষ করে যুদ্ধের পরে রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথাবিরোধী বিক্ষোভ ও কৃষক হাঙ্গামাগুলি এবং পশ্চিম ইউরোপের কতিপয় দেশে বৈপ্লবিক ঘটনাবলি। তাঁদের স্বদেশবাসী রাদিশ্যেভ, কুনিৎসিন, নোভিকভ, লমনোসভ, ফনভিজিন প্রভৃতি রুশ লেখক ও মনীষীদের রচনার সঙ্গে ডিসেম্ব্রিস্টরা ভালোই পরিচিত ছিলেন। ভলটেয়ার, হলবাক, হেলভেশিয়াস, রুসো, মংতেস্ক্য, লক, স্মিথ, বেক্কারিয়া, বেনথাম প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপীয় প্রগতিশীল মনীষীদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল তাঁদের ভাবধারার উপর।

ভূমিদাসপ্রথা ও স্বৈরক্ষমতার ধ্বংসসাধন এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য নিয়ে ডিসেম্ব্রিস্টরা ব্যক্তি, বাক্ ও মুদ্রণের স্বাধীনতা, ধর্মমত প্রচারের স্বাধীনতা দাবি করেন। কৃষকদের ভূমি অর্পণের পক্ষে ছিলেন তাঁরা, দাবি করেন যেন ব্যক্তিগত মালিকানা পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় থাকে। নিজেদের প্রস্তাবাদি ও দাবির যৌক্তিকতা তাঁরা খুঁজেছেন সামাজিক চুক্তির তত্ত্বে (সঠিক বললে সে তত্ত্বের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাষ্যে)।

রাষ্ট্রের উদ্ভব, তার গঠনের রূপ, কাজ চালাবার প্রণালী ইত্যাদি প্রশ্নে বিপ্লবী অভিজাতরা (ডিসেম্ব্রিস্টরা) যে সাধারণ নীতি অনুসরণ করেছেন সেটা হল এই থিসিস যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় জনগণ ও শাসকদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের ফলে। এ থেকে, ডিসেম্ব্রিস্টদের মতে, আসে যে ক্ষমতাধরের অধিকার আর নাগরিকদের কর্তব্য থাকে অচ্ছেদ্য ঐক্যে, পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অবস্থায়; রাষ্ট্রীয় শাসনের চেহারা নির্ধারিত হওয়া উচিত

কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-খুশি দিয়ে নয়, জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতি দিয়ে। এ নীতি লঙ্ঘনের পরিণাম — আত্মক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচার।

আঠারো শতক ও উনিশ শতকের গোড়ায় রুশ ও পশ্চিম ইউরোপীয় আলোকদাতাদের যুক্তিবাদী দার্শনিক মতবাদ থেকে এগিয়ে ডিসেম্ব্রিস্টরা পরারাজতন্ত্রকে যুক্তিহীন ও অন্যায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেন। তাঁদের অনেকেই মনে করতেন যে সামাজিক জীবনে, আইন প্রবর্তনে, শাসন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ নির্বাচনে প্রধান সক্রিয় ব্যক্তি রাজা নয়, জনগণই, যাদের অধিকার হল সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম।

জনসাধারণের স্বার্থ প্রকাশ, আন্তরিকভাবেই তাদের কল্যাণের জন্য কাতরতা, তাদের রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ডিসেম্ব্রিস্টরা জনগণের স্বাধীন আন্দোলনে খুব ভয় পেতেন। বিপ্লবী-ষড়যন্ত্রীদের অপেক্ষাকৃত ছোটো গ্রুপের পক্ষ থেকে আকস্মিক সামরিক কু-দেতার ওপর ভরসা করেছিলেন তাঁরা। অভ্যুত্থানে ব্যাপক জনসাধারণের এসে পড়ার সম্ভাবনায় তাঁরা ভীত ছিলেন। ডিসেম্ব্রিস্টরা স্বীকার করেছেন: 'আমরা সবচেয়ে ভয় করেছি গণবিপ্লবকে। কেননা তা রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী না হয়ে পারে না।' এতে পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে ডিসেম্ব্রিস্টদের বৈপ্লবিকতার আভিজাতিক সীমাবদ্ধতা। সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম চলছে এটা বুঝলেও মানবজাতির ইতিহাসে তার সত্যকার স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন না। এরূপ ভাবনার প্রবণতা তাঁদের ছিল যে সামাজিক সম্পদ বণ্টনের চূড়ান্ত অসমতা রোধ করে, সমাজের প্রতিটি সদস্যকে যদি জমির অধিকার দেওয়া যায়, তাহলে শ্রেণী বিরোধ, সুতরাং শ্রেণী সংগ্রাম পরিহার করা সম্ভব।

রাশিয়ার আসন্ন পুনর্গঠনের একক কর্মসূচি সংরচন ও তাতে সম্মতি লাভের গতিপথে অভিজাত-বিপ্লবীরা রচনা করেন দুটি তেমন প্রকল্প। তাদের একটা প্রস্তুত হয় 'দাক্ষিণী সমাজে', তার নেতা প. ই. পেস্তেল (১৭৯৩-১৮২৬) দ্বারা এবং তার নাম হয় 'রুশী সত্য'; দ্বিতীয় প্রকল্পটি তৈরি করেন 'উত্তরী সমাজের' (সাম্রাজ্যের রাজধানী পিটার্সবুর্গে) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নিকিতা মুরাভিয়েভ (১৭৯৫-১৮৪৩)।

ডিসেম্ব্রিজমের র‍্যাডিকাল উপস্থাপন সবচেয়ে বেশি পূর্ণাকারে প্রকাশ পেয়েছে প. ই. পেস্তেলের 'রুশী সত্যে'। লেখক এটাকে দেখেছিলেন ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক সরকারের কাছে নির্দেশ হিশেবে। পেস্তেলের প্রকল্প অনুসারে, রাশিয়াকে হতে হবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। আইনপ্রণয়নী, প্রশাসনিক

(কার্যনির্বাহী) ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার সবটাই তুলে দিতে হবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। ২০ বছর হয়েছে এমন সমস্ত পুরুষকে রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে নাগরিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুন ব্যবস্থার আমলে প্রতিনিধি সভা — 'জনগণের ভেচে' হবে সর্বোচ্চ আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার অধিকারী। পশ্চিমী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে গৃহীত দুই কক্ষের পার্লামেণ্ট ব্যবস্থাকে জনপ্রতিনিধিত্বের পক্ষে হানিকর বলে পেস্তেল তা বর্জন করেন। কার্যনির্বাহী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত পাঁচ বছরের জন্য জনগণের ভেচে দ্বারা নির্বাচিত পাঁচ জনের ক্ষমতাধর দুমায়।

জাতীয় প্রশ্ন, যা রাশিয়ার পক্ষে ছিল অসাধারণ তীব্র, তা সমাধানের যে চেষ্টা পেস্তেল করেছিলেন, তা মনোযোগের দাবি রাখে। তিনি তার দিকে এগিয়েছিলেন জনগণ ও রাষ্ট্রের ঐক্য নিশ্চিত করার প্রয়াসে। জাতিসত্তাগুলির স্বাধীনতার ও পৃথক রাজনৈতিক সত্তার অধিকার, অর্থাৎ আলাদা, স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার ('রুশী সত্যের' লেখকের মতে) 'সুবিধার অধিকারের' বিরোধী, অর্থাৎ নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্রের যে প্রয়াস এবং 'তাকে ঘিরে থাকা ছোটো ছোটো জাতি' যাতে 'অন্য কোনো বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নয়, তার নিজের শক্তিই বাড়িয়ে তোলে' সে জন্য চেষ্টার বিরোধী। এই বিরোধ থেকে উদ্ধারের পথ পেস্তেল দেখেছিলেন কেবল সেইসব জাতির পৃথক হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার মেনে নেওয়ায় যাদের পক্ষে 'তা পেয়ে তা রক্ষা করাও সম্ভব'।

পেস্তেল মনে করতেন যে রাশিয়ার সমস্ত জাতির সবার ক্ষেত্রে সাধারণ একই রকম নাগরিক অধিকার প্রসারিত করা উচিত। তবে ক্ষুদ্র জাতিরা এই সমাধিকার পেতে পারবে নিজেদের জাতিসত্তা ও জাতীয় আত্মনির্ধারণের অধিকার বিসর্জন দিয়ে। জাতীয় প্রশ্নের এইরূপ উপস্থাপনেই পেস্তেলের রাজনৈতিক মতবাদের দুর্বল দিকটা নিহিত, যিনি বোঝেন নি যে জনগণের সত্যকার ঐক্য নিশ্চিত হতে পারে কেবল প্রতিটি জাতির জাতীয় আত্মনির্ধারণ এবং নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশের অধিকার স্বীকৃতির ভিত্তিতে। ফেডারেশন গঠনকে পেস্তেল গণ্য করেছিলেন সামন্ততান্ত্রিক খণ্ডবিখণ্ডতায় প্রত্যাবর্তন বলে, যা রাশিয়ার অতখানি দুর্দশার কারণ হয়েছিল। সেই কারণে, তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে, রুশ রাষ্ট্রকে ঘোষণা করা হয়েছে 'এক ও অবিভাজ্য'।

পেস্তেল কৃষি সমস্যার আমূল সমাধানের প্রস্তাব দেন। বড়ো বড়ো

জমিদারি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। সমস্ত জমির অর্ধেক নিয়ে গঠিত বিশেষ রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সমস্ত নাগরিক ভূমিখন্ড পেতে পারবে। বাকি অর্ধেকটা বিক্রি করে অথবা খাজনায় দিয়ে দেওয়া যাবে। এইভাবে, প. ই পেস্তেলের কৃষি প্রকল্প সামন্ততন্ত্রের বনিয়াদকে — জমিদারি ভূমি-মালিকানাকে আমূল বিদীর্ণ করছে এবং তাতে করে তৎকালীন রাশিয়ার অর্থনীতির প্রধান শাখা — কৃষিতে বুর্জোয়া সম্পর্ক বিকাশের পথ করে দিচ্ছে।

পেস্তেলের তুলনায় নিকিতা মুরাভিয়েভ অনেক নরমপন্থী অবস্থান নিয়েছেন; তিনি রচনা করেন নিয়মতান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক কর্মসূচির প্রকল্প। তাঁর 'সংবিধান'এ সম্রাটের ক্ষমতায় সীমারোপ ও আইনপ্রণয়নী সংস্থায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের কথা ছিল; রাজার জন্য রেখে দেওয়া হল কার্যনির্বাহী ক্ষমতা, সুতরাং প্রথা হিশেবে রাজতন্ত্র টিকে রইল; রাশিয়াকে ফেডারেটিভ রাষ্ট্রের নীতি অনুসারে গড়ার প্রয়োজন এবং তদনুসারে আইনপ্রণয়নী সংস্থায় দ্বিতীয় কক্ষ — সর্বোচ্চ দুমার প্রয়োজন মেনে নেওয়া হয়, তাতে থাকবে সেই সব 'শক্তির' প্রতিনিধিরা, যাদের মধ্যে বিভক্ত হবে রাশিয়া। পেস্তেল যেক্ষেত্রে মনে করেছেন যে সামরিক বিপ্লবের পরও সর্বোচ্চ শাসনের একনায়কত্ব চালু করতে ১০-১৫ বছর লাগবে, সেক্ষেত্রে মুরাভিয়েভ অবিলম্ব (সামরিক বিপ্লবের পরেই) সংবিধান সভা আহ্বানে জোর দিয়েছেন।

যারা মজুরি খাটে, মুরাভিয়েভের প্রকল্পে তাদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার নেই, আর গ্রাম-সমাজভুক্ত কৃষকেরা নির্বাচন সভাগুলিতে ৫০০ লোক পিছু একজন নির্বাচককে পাঠাতে পারবে। নির্বাচনে সরাসরি অংশ গ্রহণের অধিকার পায় তারা, যাদের সম্পত্তির মূল্য ৫০০ রৌপ্য রুবলের কম নয়। আরো সম্পত্তিগত শর্ত — ৩০-৬০ হাজার রৌপ্য রুবল রাখা হয় সর্বোচ্চ নির্বাচিত পদের প্রার্থীদের জন্য। মুরাভিয়েভও ভূমিদাসপ্রথা থেকে কৃষক মুক্তির দৃঢ় দাবি করেন। কিন্তু তাদের ভূমি দেবার জন্য জেদ করেন নি তিনি। জমিদারি ভূমি-মালিকানা কার্যত অলঙ্ঘ্য থেকে যায়।

এবার আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি: পেস্তেল এবং মুরাভিয়েভ, উভয়ের প্রকল্পেই ভূমিদাসপ্রথা ও পরারাজতন্ত্র উচ্ছেদের দাবি করা হয়, যদিও গুরুত্বপূর্ণ অন্য কিছু প্রশ্নে বেশ মতভেদ দেখা যায়, যথেষ্ট সঙ্গতিশীলতা ছিল না, ছিল অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধও।

ডিসেম্ব্রিস্টদের আন্দোলন জয়লাভ করতে পারত না সর্বাগ্রে এই কারণে যে সচেতনভাবেই তাঁরা জার স্বৈরক্ষমতার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামে জনগণকে সরিয়ে রেখেছিলেন। তবে তাঁদের সাধনা বৃথা যায় নি। রাশিয়ায় মুক্তি চিন্তার আরো বিকাশে ডিসেম্ব্রিস্টরা প্রচণ্ড ঠেলা দেন, বিশেষ করে রুশ বৈপ্লবিক-মুক্তি আন্দোলনে বিভিন্ন প্রগতিশীল ধারার ভাবাদর্শে তাঁরা প্রজাতান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রবাহিত করেছেন। তাঁদের সংগ্রামের দৃষ্টান্ত, তাঁদের উত্থাপিত ভাবধারা গ্রহণ করে তাকে সামন্ততান্ত্রিক-পরারাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যান উনিশ শতকের ৪০-৬০-এর দশকের রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা।

ডিসেম্ব্রিস্ট আন্দোলন চূর্ণ হওয়ায় রাশিয়ার জীবনে পুরো একটা পর্ব শেষ হয়ে শুরু হচ্ছে নিজের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুন পর্ব। ডিসেম্ব্রিস্টদের ওপর জারতন্ত্রের দলনের পরবর্তী বছরগুলি ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল-রক্ষণশীল রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের বর্ধিত প্রয়াসে চিহ্নিত। যেমন, শাসক মহলের উদ্যোগে ব্যাপক প্রচার লাভ করে 'সরকারি জাতীয় চরিত্রের' ধারণা, ১৮৩২ সালে এ নীতিটি সূত্রবদ্ধ করেন জার সরকারের শিক্ষামন্ত্রী স. স. উভারোভ। স্বৈরক্ষমতার প্রধান যে উদ্দেশ্য ছিল এবং ভূমিদাসপতি-জমিদারদের শিবির থেকে তার সাফাইদাররা যেজন্য সর্বোপায়ে চেষ্টা করেছে 'সরকারি জাতীয় চরিত্রের' জয়গান গাইতে সেটা হল রাশিয়ায় বৈপ্লবিক ভাবনার উদ্ভব ও প্রচারে বাধা দেওয়া, এইটে প্রমাণ করা যে রাশিয়ার মাটিতে, রুশ বাস্তবতার পরিস্থিতিতে বিপ্লব অসম্ভব।

উল্লিখিত ধারণা অনুসারে, রাশিয়ায় রাষ্ট্রের ভিত্তি হল 'সনাতন খ্রিস্ট-ধর্ম', 'স্বৈরতন্ত্র', 'জাতীয় চরিত্র'। এমন একটা কথা চালু হল যে রুশ জীবনযাত্রার ধরন যেন পশ্চিম ইউরোপীয় থেকে একেবারে পৃথক। রাশিয়া বাপু সর্বদাই ছিল, রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে একটা স্বকীয় ধরনের দেশ, ইউরোপীয় জনগণের জীবন ধারার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, ওরা শত্রুভাবাপন্ন গ্রুপদের মধ্যে অবিরাম অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের পাঁকে পড়ে আছে। ওই বনিয়াদের পক্ষপাতীরা রাশিয়ার অসাধারণ মৌলিকত্ব ও ব্যতিক্রম দেখেছিলেন এই ব্যাপারে যে তাতে নাকি রয়েছে 'পারিবারিক সমতা', 'পিতৃতান্ত্রিক স্বাধীনতা', কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে 'পারস্পরিক ভালোবাসার' রাজত্ব আর সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে এখানে নাকি গড়ে উঠেছে ও বর্তমান আছে স্বৈরতন্ত্র (এই রূপের রাষ্ট্রক্ষমতা নাকি স্মরণাতীত কাল

থেকে চলে আসছে), সনাতন খ্রিস্টধর্ম (যা দিয়ে বাপু গঠিত জনগণের 'নৈতিক প্রেরণা' ও চিন্তার ধারা) এবং খোদ রুশ জনগণের সাযুজ্য, পিতৃসুলভ স্নেহযত্নের জন্য যারা বুঝি বরাবর পুজো করে এসেছে জারের। 'সরকারি জাতীয় চরিত্রের' ধারণাটা হল ঐতিহাসিক প্রগতি আটকে রাখা, বাকি জগৎ (সর্বাগ্রে পশ্চিম ইউরোপ) থেকে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন রাখা, সামাজিক অচলতাকে ভাবাদর্শের দিক থেকে ন্যায্য প্রতিপন্নের একটা প্রয়াস।

৪০-এর দশকে যখন তার সমস্ত তীক্ষ্নতায় রুশ সমাজের মনোযোগের কেন্দ্রে এসেছিল ভূমিদাসপ্রথার প্রশ্ন, তখন এ প্রথা প্রসঙ্গে বিরোধী শক্তিরা আবির্ভূত হয় নানান সামাজিক ধারায় -- তাতে থাকে যেমন অতি দক্ষিণ, তেমনি উদারনৈতিক অভিজাতদের প্রগতিশীল স্তরের স্বার্থ প্রকাশক চরম বামপন্থী ধারা। এদের মধ্যে প্রধান দুটি ধারা হল স্লাভোফিল (স্লাভ জাতির জীবনধারার ভক্ত) ও পশ্চিমভক্ত।

স্লাভোফিলরা তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত করতেন রাশিয়ায় কৃষক বিক্ষোভের বৃদ্ধি এবং পশ্চিমে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামে ভীত জমিদার-ভূস্বামীদের স্বার্থ। নতুন, প্রভুত্বকারী শ্রেণীর পক্ষে ক্রমশই জটিল একটা পরিস্থিতিতে কিভাবে তাদের ক্ষমতা, জমি, আয় ও বিশেষ সুবিধা রক্ষা করা যায় এই প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতেন তাঁরা। স্লাভোফিলদের খুবই বিশ্বাস করবার ইচ্ছে হচ্ছিল যে রাশিয়ার ঐতিহাসিক বিকাশে কখনো বৈপ্লবিক ঝাঁকুনি ঘটবে না, তা তার আগেকার অনন্যসাধারণ জীবন চালিয়ে যাবে জার স্বৈরতন্ত্রের 'ত্রাণদায়ক' পরিচালনাধীনে। এটা ছিল তাঁদের গ্রহণীয় ও বাঞ্ছনীয়। তাই পুরোপুরি বোঝা যায়, কেন তাঁরা রাজনীতিতে, রাষ্ট্রিক ব্যাপারে জনগণের অংশ গ্রহণের বিরোধী ছিলেন।

তবে তাঁরাও ছিলেন জার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশে অসন্তুষ্ট, পরারাজতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার নরম করার দাবি করেন তাঁরা, প্রজাদের ব্যক্তিগত জীবনে সরকারের হস্তক্ষেপের নিন্দা করেন এবং জেমস্তভো* সভা গঠন করে কিছুটা রাজনৈতিক বাষ্প নিঃসরণ প্রয়োজনীয় মনে করেন। তাঁদের মতে, রাশিয়ায় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এই নীতিতে: 'জারকে দাও ক্ষমতার শক্তি, জনগণকে—মতামতের শক্তি'। তবে এ 'মতামত'

রাজনীতির প্রশ্নে প্রসারিত করা চলবে না, কেননা সেটা রাষ্ট্রযন্ত্রের, রাজার বিশেষাধিকার। সমাজের 'উচ্চকোটি' ও মূল অধিবাসীদের মধ্যে বৈরাবস্থান, ক্ষমতা আর জনগণের মধ্যে বিযুক্তি অতিক্রম করার সংকল্প ছিল তাঁদের। সুস্থ মস্তিষ্কেই তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে এরূপ পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের বিপদ নিহিত। এই থেকেই এসেছে স্বৈরতন্ত্রের চাপানো পুলিসি-ব্যারাক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রমণ, যাতে জনগণের কাছে ক্ষমতা বিজাতীয় হয়ে পড়ছে। হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের, ঘুষখোর ন্যায়বোধহীন বিচার ব্যবস্থার যে সমালোচনা তাঁরা করেন, এই তার ব্যাখ্যা।

জমিদারদের জমি ও ক্ষমতার ওপর সর্ববিধ হানার বিরোধিতা করেন স্লাভোফিলরা। কিন্তু তাঁদের ভয় ছিল যে ব্যক্তিগত ভূমিদাসভিত্তিক অধীনতা টিকিয়ে রাখলে নতুন কৃষক অভ্যুত্থান দেখা দিতে পারে। এই হল ভূমিদাসভিত্তিক অধীনতা সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যের উৎস। তবে তাঁরা এটাও মনে করেছিলেন যে জমিদাররা জমি নিজেদের দখলে রেখেও শেষ পর্যন্ত নিজেদের পক্ষে লাভজনক একটা শোষণব্যবস্থা কৃষকদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে। এ ব্যাপারে তাঁরা বিশেষ ভরসা রেখেছিলেন গ্রাম-সমাজের ওপর। তাঁদের মনে হয়েছিল যে এর সাহায্যে ভূস্বামীরা ভূমিদাসপ্রথা ছাড়াই শোষণের সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি টিকিয়ে রেখে আয় পেতে পারবে। গ্রাম-সমাজকে তাঁরা দেখেছেন 'বিজ্ঞ রক্ষণশীলতা', 'গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যতসব বিদেশী তত্ত্ব প্রবেশের বিরুদ্ধে' বাঁধ হিশেবে; তাঁদের কল্পনায় গ্রাম-সমাজ হল 'অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি ও সরকারের নিরাপত্তার' গ্যারাণ্টি।

যেসব রুশ সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে পশ্চিম ইউরোপীয় সংস্কৃতিই বিশ্বসভ্যতার শেষ কথা, যাঁরা ভাবতেন যে রাশিয়া প্রথমে ইউরোপীয় শিক্ষার ফলাফল ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের বুর্জোয়া রূপগুলি আত্মস্থ না করলে তার অগ্রগমন অসম্ভব, তাঁরা হলেন পশ্চিমভক্ত। পশ্চিমভক্তদের এ কথা অবশ্য ঠিকই যে তাঁদের সমকালীন রাশিয়ার বিকাশ ছিল পশ্চিমের বুর্জোয়া দেশগুলির চেয়ে নিচে। ভূমিদাসপ্রথা ও স্বৈরতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারের যে সমালোচনা তাঁরা বুর্জোয়া উদারনৈতিক অবস্থান থেকে করেন সেটা সামন্ততন্ত্রবিরোধী পুনর্গঠনের দ্বারদেশে পোঁছনো রুশ সমাজের পক্ষে খুবই ইতিবাচক তাৎপর্য ধরেছিল। তবে পশ্চিমভক্তরা প্রায়ই পশ্চিমের অগ্রণী দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আদর্শায়িত করে তোলেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সম্ভাবনার

মূল্যায়ন করেন স্পষ্টতই মাত্রাতিরিক্ত, বুর্জোয়া ব্যবস্থা যেসব সামাজিক বৈরে বিদীর্ণ হচ্ছিল সে সম্পর্কে চুপ করে থাকতেন। সমাজজীবনের নবীকরণের জন্য সংগ্রামের বৈপ্লবিক পদ্ধতিও উদারনীতিক পশ্চিমভক্তরা স্বীকার করতেন না; সামাজিক পুনর্গঠনকে তাঁরা জনগণের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত করতেন না, পুরোপুরি ভরসা রেখেছিলেন শিক্ষা, মানসিক অগ্রগতি আর শান্তিপূর্ণ সংস্কারের ওপর।

পশ্চিমভক্ত ও স্লাভোফিল ভাবাদর্শ গঠনে, এই দুই ধারার মধ্যে ভেদরেখা টানায় রুশ মনীষীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন প. ইয়া. চাদায়েভ (১৭৯৪-১৮৫৬)। তাঁর আটটি 'দার্শনিক পত্র'এর প্রথমটি তিনি প্রকাশ করেন ১৮৩৬ সালে। চাদায়েভের মতে, অশেষ অগ্রগতির সম্ভাবনা ধরে এমন সত্যকার ইতিহাস শুরু হয়েছে কেবল খিস্টধর্মের আবির্ভাবে, যা নাকি বিশ্বকে দিয়েছে তার প্রকৃতিগত অক্ষয় 'আত্মিক নীতি' — 'নৈতিক বিধি' আয়ত্ত ও জীবনে রূপায়িত করা, সর্বজনীন সমৃদ্ধি, ভালোবাসা, শান্তি, বিভিন্ন জাতির ঐক্যের এক রাজত্ব স্থাপনের প্রয়াস। এই প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার সাফল্যে খুবই মূল্য দেন। এ সাফল্যকে তিনি ভুল করে ক্যাথলিক মতের ওপর চাপিয়েছেন, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির জনগণের ঐক্য তার কৃতিত্ব বলে ধরা হয়েছে: চিন্তার ঐক্য গড়ে তুলে ক্যাথলিক মত নাকি সামাজিক ঐক্যও গড়ে তোলে।

এইরূপ ঐতিহাসিক দার্শনিক অবস্থান থেকে চাদায়েভ রাশিয়ার পশ্চাৎপদতা এবং উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত তাতে ভূমিদাসপ্রথা ও পরারাজতন্ত্রের অস্তিত্বের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। রাশিয়া যে দুর্দশার (স্বেচ্ছাচার, আইনহীনতা, ভূমিদাসপ্রথা ইত্যাদি) মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার উৎস হল এখানে কর্তব্য-, ন্যায়-, অধিকার-, শৃঙ্খলাবোধের অভাব, যা সে সময় ইউরোপীয় জনগণের চেতনা ও জীবনযাত্রায় নাকি পাকাপোক্ত গেঁথে বসেছে। এই আত্মিক শূন্যতার ব্যাখ্যা চাদায়েভ এই বলে দিয়েছেন যে রাশিয়ায় তদনুসারী ভাবগত ঐতিহ্য ছিল না, যার দরুন পশ্চিমে উক্ত ধারণাগুলি শিকড় গাড়ার সুযোগ পেয়েছে। আর যে পরিমাণে এই ঐতিহ্যের অভাব ঘটেছে, সেই পরিমাণেই দেশের ইতিহাসে অভ্যন্তরীণ বিকাশ, স্বাভাবিক অগ্রগতিও থাকে নি। পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় রাশিয়ার শোচনীয় দুর্দশার কারণ চাদায়েভ দেখেছেন এই ঘটনায় যে রাশিয়া খিস্টধর্ম গ্রহণ করে তার বাইজান্টাইন রূপভেদে, আর তার ফলে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণকারী ইউরোপীয় জনগণের নৈতিক ঐক্যের বাইরে পড়ে যায়। এই

থেকে প্রধান ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত হল রাশিয়ার পরিত্রাণ সর্বাগ্রে ধর্মান্তরণে, ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণে।

এতটা প্রতিক্রিয়াশীল থিসিসের সূত্রায়ণ স্পষ্টতই সাক্ষ্য দেয় যে রাশিয়ায় জমিদার-সামন্ত শ্রেণীর একনায়ত্বকে রূপ দেওয়া স্বৈরতান্ত্রিক-ভূমিদাসভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্যের বাস্তব কারণের সত্যকার বোধ খুবই অনায়ত্ত ছিল চাদায়েভের। এইরূপ থিসিসের প্রস্তাব ও সমর্থন থেকে দেখা যায় যে তাঁর অনুসন্ধানী চিন্তা ধর্মীয়-ভাববাদী বিশ্ববীক্ষায় জড়িয়ে পড়েছে ও সীমাবদ্ধ হয়েছে। এ থেকে তিনি রাশিয়ায় অভ্যন্তরীণ বিকাশের, ভাবধারার ধারাবাহিকতার অভাব বিষয়ে প্রগাঢ় ভ্রান্ত ও নৈরাশ্যবাদী সিদ্ধান্তে, সমগ্রভাবে রাশিয়ার গোটা পূর্ববর্তী ইতিহাসের ভুল মূল্যায়নে পৌঁছিয়েছেন।

ভূমিদাসপ্রথাবিরোধী শক্তির চরম বাম প্রান্তে ছিলেন প্রথম রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা — আ. ই. গের্ৎসেন, ন. প. ওগারেভ ও ভ. গ. বেলিনস্কি; তাঁদের কাছাকাছি ছিলেন ম. ভ. বুতাশেভিচ-পেত্রাশেভস্কি ও ন. আ. স্পেশনেভের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের একটি গ্রুপ। বুতাশেভিচ-পেত্রাশেভস্কির চক্রে অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ মহান রুশ সাহিত্যিক ফ. ম. দস্তয়েভস্কি।

৪০-এর দশকের বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা কিছু পরিমাণে উদারনীতিক-পশ্চিমভক্তদের কাছাকাছি ছিলেন। তত্ত্ব ও রাজনীতির বহু নীতিগত প্রশ্নে যথেষ্ট মতভেদ থাকলেও (সেই পর্যায়ে, যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেবল ভাবাদর্শীয় প্রস্তুতির পর্ব চলেছে) তাঁরা ছিলেন স্বাভাবিক মিত্র এবং ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টে 'সরকারি জাতীয় চরিত্রের' ভাবাদর্শ এবং স্লাভোফিল মতবাদের প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তির বিরোধিতা করতে থাকেন। বিপ্লবী গণতন্ত্রী ও উদারনীতিক-পশ্চিমভক্তদের ব্লক সম্ভব হয়েছিল এই জন্য যে উভয়েই ছিল ভূমিদাসপ্রথা, পরারাজতন্ত্রের বিরোধী আর স্বৈরতান্ত্রিক-ভূমিদাসভিত্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতির প্রশ্ন তখনো সরাসরি রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রশ্ন হয়ে সামনে আসে নি।

উদ্ভবের গোড়া থেকেই এ ব্লকের মধ্যে যে তাত্ত্বিক মতভেদ ছিল তা খোলাখুলি বিচ্ছেদে বেড়ে ওঠে অনেক পরে, কেবল ৫০-এর দশকের শেষেই, যখন অবজেকটিভ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকখানি বদলায়। দেশে গড়ে ওঠে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি এবং ভূমিদাসপ্রথা বিলোপ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠনের মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যবহারিক পথ ও উপায়ের

প্রশ্নে তা রাজনৈতিক গ্রুপগুলির কাছ থেকে অবস্থানের সুনির্দিষ্ট, অদ্ব্যর্থক নির্ধারণ দাবি করেছিল। কৃষক আন্দোলনের প্রসার সার্বিক সমাজের সমস্ত খুঁটিই ঘুচিয়ে দেবার উপক্রম করছিল, তাতে ভয় পেয়ে উদারনীতিক-পশ্চিমভক্তরা ডাইনের দিকে ঘোরেন, অধিপতি শ্রেণীদের সঙ্গে আপোস করেন এবং এই বিবর্তনের ফলে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন শিবিরে গিয়ে পেঁছন।

বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের উদ্ভব ও রূপলাভ উনিশ শতকের ৪০-৬০-এর দশকের রুশ সামাজিক (বলা বাহুল্য, তথা রাজনৈতিক-আইনীও) চিন্তার সবচেয়ে বৃহৎ ও তাৎপর্যপূর্ণ একটা ঘটনা। এ পর্বে রাশিয়ার সমগ্র আত্মিক জীবনের চরিত্রে তা একটা নির্ধারক ছাপ ফেলে গেছে।

রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন ঠিক সেই সময় যখন পশ্চিমে মার্কসবাদ ইতিমধ্যেই রূপ নিতে শুরু করেছিল। প্রথমে আ. ই. গের্ৎসেন ও ভ. গ. বেলিনস্কি এবং তাঁদের অনুসরণে ন গ. চের্নিশেভস্কি ও ন. আ. দব্রোলিউবভ আসলে সেইসব ভাববস্তু নিয়ে কাজ করেছেন, যা থেকে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নবোদ্ভাবকেরা এগিয়েছেন এবং যার ওপর নির্ভর করেছেন, যথা: জার্মান ক্ল্যাসিকাল দর্শন, ফরাসি ও ব্রিটিশ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র এবং বুর্জোয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র। এ থেকেই এসেছে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের যেমন দার্শনিক, তেমনি সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবধারার উচ্চ তাত্ত্বিক মান। এক্ষেত্রে এই ঘটনাটার ভূমিকাও কম নয় যে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা এগিয়ে আসেন অত্যধিকাংশ নিপীড়িত জনগণ, সর্বাগ্রে কৃষকজনের ভাবাদর্শী হিশেবে, যারা লড়ছিল সামন্ততন্ত্র, ভূমিদাসপ্রথা এবং সাধারণভাবেই সবকিছু শোষণের বিরুদ্ধে। এতে করে ইতিহাসে এই প্রথম বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের সঙ্গে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের একটা আঙ্গিক যোগাযোগ দেখা গেল।

তবে পরিষ্কার মনে রাখা দরকার যে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের পক্ষে ইতিহাস, সমাজ, রাষ্ট্রের সুসঙ্গত বৈজ্ঞানিক বোধের উচ্চতায় ওঠা সম্ভব হয় নি। এর প্রধান কারণ রাশিয়ায় বিদ্যমান সেইসব অবিকশিত, পশ্চাৎপদ সামাজিক সম্পর্ক, আসলে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা মূলত যার বাইরে যেতে পারেন নি এবং যা গুরুতর রূপে সীমাবদ্ধ করেছে তাঁদের তাত্ত্বিক দিগন্ত। প্রসঙ্গত, যে কৃষক শ্রেণীর সামাজিক প্রকৃতি দ্বিবিধ, তাদের দিকে মুখ ফেরানোয় গের্ৎসেন ও বেলিনস্কি তথা চের্নিশেভস্কি, দব্রোলিউবভ প্রভৃতি বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি দুর্বল দিকের খুবই

জটিল জড়াজড়ি আছে। তাদের কয়েকটার উল্লেখ করছি: জঙ্গী বৈপ্লবিকতার সঙ্গে আলোকদানের মোহ; উত্তম ভবিষ্যতের জন্য জনগণের সংগ্রাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের দাবি, আবার সেই সঙ্গে রাশিয়ার বিশেষ রকমের একটা গঠনে বিশ্বাস, যাতে দেশটা বুঝি পুঁজিবাদী পথে বিকাশ এড়িয়ে যেতে পারবে; সামাজিক জীবন, রাজনীতি, সংস্কৃতির ওপর উৎপাদন ও শ্রেণী সংগ্রামের প্রভাব আছে এমন অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে রয়ে গেছে ইতিহাস সম্পর্কে সমগ্রত ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

এইভাবে রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের ভাবাদর্শ সময়ের দিক থেকে মার্কসবাদের সঙ্গে যুগপৎ বিকশিত হলেও তার শ্রেণীগত সারার্থ ও তাত্ত্বিক মানের দিক থেকে তাকে ফেলা উচিত প্রাক্‌মার্কসবাদী পর্বে।

এবার সংক্ষেপে রুশ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রিক-আইনী বিদ্যার অবস্থা কী ছিল বলি। গত শতকের দ্বিতীয় চতুর্থাংশে তার বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হল স্বৈরতন্ত্রের সাফাইদারি, তার সঙ্গে মিলেছিল বিদ্যমান রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় ব্যবস্থার একান্তই আপ্তবাক্য ধরনের বর্ণনা। সে সময় যেসব গ্রন্থ, পাঠ্যপুস্তক, পাঠ-সহায়িকা প্রকাশিত হত, তাদের তাত্ত্বিক মান ছিল নিম্নস্তরের। বিশেষ করে তাতে ঈশ্বরতাত্ত্বিক যুক্তিবিস্তারের ঐতিহ্য প্রকাশ পেত প্রবলভাবে। সে যুক্তি প্রায়ই পেশ করা হত উপযোগী রাষ্ট্রীয়-আইনী প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যায়। সে সময়কার কোনো কোনো রচনায় হেগেল ও শেলিঙের ভাবনা, আইনের জার্মান ঐতিহাসিক স্কুলের কতকগুলি বক্তব্যের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়।

৬০-এর দশকে গড়ে ওঠে রুশ ইতিহাসবিদ্যার ব্যবহারশাস্ত্রীয় (রাষ্ট্রিক) স্কুল। তার প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্রখ্যাত রুশ উদারনীতিক ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিদ ব. ন. চিচেরিন ও ক দ কাভেলিন। এই স্কুলের প্রতিনিধিরা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অবজেকটিভ গতি, নিয়মসঙ্গতি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। কিন্তু এরূপ প্রয়াস করা হয় ভ্রান্ত, দার্শনিক-ভাববাদী অবস্থান থেকে: উপেক্ষিত হয় ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা, ইতিহাসের মূল বিষয় বলে স্বীকৃত হয় 'বৈষয়িক প্রয়োজন নয়, আত্মিক শক্তি'। রাষ্ট্রকে ঘোষণা করা হয় শ্রেণীর ঊর্ধ্বে, সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে এক প্রতিষ্ঠান বলে এবং দেশের বিকাশে মাত্রাতিরিক্ত, প্রধান ভূমিকা তার ওপর চাপানো হত। বিশেষ করে বলা হত, রুশ রাষ্ট্র যেন, তার বিবেচনা অনুসারে, সম্প্রদায়গুলিকে কখনো দাসত্বে নিপতিত করে, কখনো মুক্তি দেয়। রাষ্ট্রিক স্কুলের প্রতিনিধিদের কল্পনায় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে দেখা হয়েছে সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন

ব্যবহারশাস্ত্রীয় রূপের বদল হিশেবে: কৌলিকের জায়গায় এসেছে উত্তরাধিকারী, উত্তরাধিকারীর জায়গায় রাষ্ট্রিক। এই স্কুলের রচনাগুলির ক্ষেত্রে এটা তাৎপর্যসূচক যে তাতে রুশ সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ও আইনী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপের কার্যত কোনো সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ নেই।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবহারশাস্ত্রে ব্যাপকভাবে ছড়ায় দৃষ্টবাদ (positivism)। ৮০-র দশকের গোড়ায় রুশ আইনবিদ্যায় রূপ নেয় দৃষ্টবাদের দুটি ধারা: ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টবাদ এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টবাদ। প্রথম ধারার অনুগামীরা (ন. ম. করকুনভ প্রভৃতি) দার্শনিক দৃষ্টবাদের প্রবক্তাদের অনুসরণে ঘোষণা করেন যে জ্ঞানের অধিগম্য হল কেবল ঘটনা, অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য, আর তার কারণ নিয়ে গবেষণার শক্তি বিজ্ঞানের নেই। তাঁদের কেউ কেউ এমনকি আইনী ব্যাপারের বিশ্লেষণে যথাযথ বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করেন। ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টবাদীদের রচনায় আইনবিদ্যাকে দেখা হয়েছে আইনপ্রণয়নের নিছক বাহ্য বিবরণ হিশেবে; সমাজ সম্পর্কের ব্যবহারশাস্ত্রীয় রূপকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার বলে। এ কথায় জোর দেওয়া উচিত যে ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টবাদীরা আইনী ব্যবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বুর্জোয়া আইনসিদ্ধতা নীতির স্থিতিশীলতাকে সমর্থন করেন, তাতে করে স্বেচ্ছাচার ও আইনহীনতার বিরোধিতা করেন। তাঁদের সমকালীন সমাজে আইনের আধিপত্য রয়েছে, এমন একটা মোহ সৃষ্টিতে সাহায্য করেন তাঁরা, সুতরাং বুর্জোয়া-জমিদার ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণেও সহায়তা করেন।

রুশ আইনবিদ্যায় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টবাদের প্রতিনিধিরা (ম. ম. কভালেভস্কি, স. আ. মুরোমৎসেভ প্রভৃতি) আইনের বিশ্লেষণে একান্ত আপ্তবাক্যসুলভ, বিশুদ্ধ ছকবাঁধা পদ্ধতি অগ্রাহ্য করেন। জারি করা আইন, বলবৎ আইনের প্রণয়নের বিশ্লেষণকে তাঁরা জড়িত করতে চেয়েছিলেন সামাজিক ব্যাপারগুলির বিবেচনার সঙ্গে, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়-আইনী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্র ও আইনের কেবল বাহ্য দিকটা ছুঁয়ে তাদের আনুষ্ঠানিক আপ্তবাক্যমূলক ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যানের (সম্পূর্ণ না হলেও) প্রগতিশীল তাৎপর্য ছিল। কিন্তু আইনবিদ্যায় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টবাদের পক্ষপাতীদের ওপর প্রভুত্ব করেছে সমস্ত বুর্জোয়া সমাজচিন্তার অন্তর্নিহিত সাধারণ ত্রুটি: সাধারণত তাঁরা প্রধান জিনিসটা দেখতে পান নি — রাজনৈতিক ও আইনী ঘটনার বৈষয়িক,

অর্থনৈতিক শিকড়, রাষ্ট্র ও আইনের শ্রেণী প্রকৃতি, সমাজে বিদ্যমান শ্রেণী সংগ্রামের ওপর তাদের প্রত্যক্ষ নির্ভরশীলতা তাঁরা উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি।

উনিশ শতকের রুশ রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় চিন্তার দৃশ্যপটে বড়ো একটা জায়গা নিয়েছে ৭০-এর দশকে বিপ্লবী জনবাদী বা নারোদনিকদের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠা রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের তত্ত্বে এই পর্বের বিপ্লবী নারোদনিকরা গের্ৎসেন ও চের্নিশেভস্কি স্বৈরতন্ত্র ও ভূমিদাসত্বের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে রাশিয়ার আমূল পুনর্গঠন বিষয়ে, গ্রাম-সমাজকে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের যাত্রাবিন্দু ও ভিত্তি বলে যে মতবাদ প্রচার করেন, তার অনুবর্তন করে যেতে থাকেন। কৃষক বিপ্লব ও কৃষক সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শী ছিলেন তাঁরাই। তাঁদের ভাবাদর্শীয় পূর্বসূরীদের মতো বিপ্লবী নারোদনিকরাও সমস্ত শোষণ থেকে মুক্তির সংগ্রামে সমস্ত মেহনতিদের নেতা হিশেবে প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা বুঝতে পারেন নি।

বিপ্লবী নারোদবাদের উদ্ভব হয় যখন সংস্কার পরবর্তী রুশ গ্রামাঞ্চল পুঁজিবাদী পথে বিকাশ শুরু করেছিল। এরূপ বিকাশের নিয়মসঙ্গতি বুঝতে না পারায়, যা কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল, বিপ্লবী নারোদনিকরা ক্রমেই বেশি করে আবির্ভূত কৃষক-পণ্যোৎপাদকের অবস্থান, অর্থাৎ পেটি-বুর্জোয়া অবস্থান নিতে থাকেন। তদনুসারে তাঁদের তাত্ত্বিক নির্মিতিতেও ক্রমেই বেশি করে প্রতিফলিত হতে থাকে ক্ষুদ্র উৎপাদকের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা। ৫০-৬০-এর দশকে মহান বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের ভাবাদর্শের তুলনায় বৈপ্লবিক নারোদবাদের ভাবাদর্শের প্রজ্ঞানমূলক সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে এই কারণে।

নারোদবাদের প্রতিনিধিরা সাধারণত 'নায়ককে' নিষ্ক্রিয় 'জনতা' থেকে আলাদা করতেন। ইতিহাসের স্রষ্টা বলে স্বীকার করা হত 'নায়কদের', 'সমালোচনার দৃষ্টিতে মননশীল ব্যক্তিদের'। নারোদনিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা, সন্ত্রাসের রণকৌশল অনুশীলিত হতে থাকে, সেই সঙ্গে দেখা দেয় উদারনৈতিক হাওয়া। মেহনতিদের স্বার্থের প্রতি পরারাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈরিতার বোধ লোপ পেল এবং মাঝে মাঝেই জার রাজতন্ত্রকে দেখা হতে থাকল শ্রেণী-ঊর্ধ্ব সংগঠন বলে। এই ভিত্তি থেকে কোনো কোনো নারোদনিক জনগণের হিতার্থে সংস্কার সাধনে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রোৎপাদনের সমর্থনে স্বৈরতন্ত্র সমর্থ বলে মেনে

নেওয়ার দিকে ঝোঁকেন। পংজিবাদকে তাঁরা অবক্ষয়, পশ্চাদ্‌গতি, ইত্যাদি বলে ঘোষণা করেন।

৭০-এর দশকের বিপ্লবী নারোদবাদের ভাবাদর্শীদের মধ্যে প্রমুখ স্থান নেনে ম. আ. বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬), প. ল. লাভরোভ (১৮২৩-১৯০০), প. ন. ত্‌কাচেভ (১৮৪৪-১৮৮৫)। বাকুনিন যেক্ষেত্রে ছিলেন হাঙ্গামাবাজ-নারোদনিকদের সর্দার, যারা বিশ্বাস করত যে অবিলম্বে বিপ্লবে উত্থিত হতে যেকোনো মুহূর্তে রুশ কৃষক প্রস্তুত, সেক্ষেত্রে লাভরোভ হলেন নারোদনিক-প্রচারকদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। তিনি স্বীকার করতেন যে বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে তাতে জনগণের অংশগ্রহণের ওপর। কিন্তু জনগণ যেহেতু তমসাচ্ছন্ন ও দলিত, তাই সে নিজের শক্তি সম্পর্কে অচেতন, জাড্যে চালিত ও নিষ্ক্রিয়। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সত্যকার সক্রিয়তা জোগায় বুদ্ধিজীবীরা, জনগণের নিকট নিজেদের দায়িত্ব স্বীকার করে তাদের উচিত জনগণের কাছে যাওয়া, তাদেরকে আলোকদান করে সংগ্রামে উত্থিত করা। পশ্চিমে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি অর্থনৈতিক, রাশিয়ায় সেটা হল নৈতিক (জনগণের নিকট বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য পালন)।

বাকুনিনের বিপরীতে লাভরোভ এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে বিপ্লবের বিজয়ের পরও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের সঙ্গে গুরুতর সংগ্রাম করতে হবে মেহনতিদের, সেই জন্য জয়লাভের পর তাদের স্বহস্তে রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখা উচিত। তা গ্রাম-সমাজকে শক্তিশালী করবে, তাতে 'সমাজতান্ত্রিক' প্রেরণা জাগাবে, গ্রাম-সমাজের মালিকানায় ব্যক্তিগত মালিকানাকে লুপ্ত করবে, গ্রাম-সমাজের জমায়েতকে ভবিষ্যৎ রুশ সমাজব্যবস্থার প্রধান রাজনৈতিক উপকরণ করে তুলবে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই উপায়টাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল লাভরোভের কাছে।

কৃষক জনসাধারণকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে তোলায় সুদীর্ঘ সযত্ন কাজকর্মের ব্যাপারে ত্‌কাচেভ আপত্তি করেন লাভরোভের নীতিতে। তিনি ভরসা করেছিলেন বিপ্লবী ষড়যন্ত্রীদের ওপর, যারা স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ও নতুন সরকার গঠন করে জনগণকে আলোকদান ও সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসারে তাদের জীবন পুনর্গঠনের ব্যবস্থা নেবে। বিপ্লবী শক্তি হিশেবে জনগণকে উপেক্ষা করা এই সর্বনাশা, হঠকারী উপস্থাপন এসেছে স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে প্রগাঢ় ভ্রান্ত, ভাববাদী ধারণা থেকে। ত্‌কাচেভের মতে, পশ্চিম ইউরোপে রাষ্ট্র নির্ভর করে পুঁজির ওপর এবং নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক স্বার্থকে রূপায়িত করে। রাশিয়ায় বাপু ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। এখানে

নাকি খোদ সমাজব্যবস্থাটাই ভর করে আছে রাষ্ট্রের ওপর, যা শূন্যে ভাসমান, বর্তমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে তার শিকড় নেই, টিকে আছে কেবল অতীত থেকে আসা ঐতিহ্যের কল্যাণে। রুশ স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে এরূপ ধারণার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ফ. এঙ্গেলস।

রুশ গ্রামাঞ্চলের পুঁজিবাদী বিকাশ, কৃষকদের মধ্যে স্তরভেদ, শিল্প প্রলেতারিয়েতের রূপলাভ থেকে দেখা দেয় একদিকে নারোদবাদের ওপর পেটি-বুর্জোয়া প্রভাবের বৃদ্ধি, অন্যদিকে তাতে প্রলেতারীয় ধারার উদ্ভব। এর পরিণামে পুরনো নারোদনিকদের মধ্যে ভাঙন ঘটে, তা থেকে আলাদা হয়ে যায় ঠিক প্রলেতারীয়-সমাজতান্ত্রিক ধারাটাই, যা মেহনতিদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের মার্কসীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে ('শ্রম মুক্তি গ্রুপ', ১৮৮৩)। খোদ নারোদবাদ ওদিকে ৮০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ৯০-এর দশকে ক্রমেই বেশি করে অধঃপতিত হতে থাকে উদারনৈতিক একটা বিরোধী আন্দোলনে।

উপসংহারে এই কথা বলা দরকার: বিপ্লবী নারোদনিকদের মতামত এবং বিপ্লব সংঘটনের পথ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের ক্রিয়াকলাপের সমস্ত অপরিপক্কতা, প্রায়ই এমনকি ভ্রান্তি সত্ত্বেও তারা রাশিয়ায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রলেতারীয় পর্যায়ের, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের পূর্বসূরীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

* * *

যে পরিস্থিতিতে রাশিয়া তার উনিশ শতকে প্রবেশ করে, জার্মানির পক্ষে এ শতকের শুরু কিছুটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে। সর্বাগ্রে, রাজনৈতিক দিক থেকে জার্মানি থেকেই যাচ্ছিল খণ্ড-বিখণ্ড দেশ। সে শতকের প্রথম দশকের গোড়াতেই তা নেপোলিয়নীয় সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়ে। বিদেশী প্রভুত্বে ন্যায্য প্রতিবাদ জাগে জার্মান জনগণের মধ্যে, উত্থিত হয় জাতীয় চেতনা, দেশপ্রেমিক আবেগ। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক থেকে জার্মানি সমগ্রভাবে ছিল অগ্রণী ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যেই। তার ওপর প্রবল প্রভাব ফেলে ১৭৮৯-১৭৯৫ সালের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের ঘটনাবলি ও ভাবধারা।

জার্মান ভূমিতে তখন তিনটি মৌল কর্তব্য সমাধানের অপেক্ষায় ছিল: জাতীয় ঐক্য গঠন, ভূমিদাসপ্রথার উচ্ছেদ এবং রাষ্ট্রিক-আইনী ব্যবস্থার

গণতন্ত্রীকরণ। সে সময় পুরনো, কালব্যাতিক্রমে পর্যবসিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী পক্ষের নেতা জার্মান বুর্জোয়া ভয় পাচ্ছিল বড়ো রকমের আমূল কর্মকাণ্ডে। তাদের ভাবাদর্শীরা পছন্দ করেছিলেন বৈপ্লবিক ভাবধারা ও যুগের দাবিকে জনগণের কাছে দুর্বোধ্য দূরানুমানিক দর্শনের ভাষায় প্রকাশ করতে, কালের সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নের তীব্র ব্যবহারিক-রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে বীর্যহীন বা ভোঁতা করে তুলতে। তাঁদের কাছে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ ছিল চেতনা, বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা ইত্যাদি। সরকারকে শংকিত, রাষ্ট্রক্ষমতাকে ক্রুদ্ধ না করার ভাবনায় প্রধানত ব্যাতিব্যস্ত জার্মান বুর্জোয়ার কার্যত অসহায়ত্বের এটা ছিল একধরনের ক্ষতিপূরণ, তার আত্মিক রূপায়ণ।

প্রভুত্বকারী সামন্ত-জমিদার শ্রেণী এবং তার সমর্থক আমলাতন্ত্র ও যাজক সম্প্রদায় ছিল ফরাসি বিপ্লব ও তার প্রগতিশীল ব্যবস্থাদি প্রসঙ্গে চূড়ান্ত নেতিবাচক অবস্থানে। ১৮ শতকের শেষে ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় ও আইনপ্রয়নী ব্যবস্থার যে পুনর্গঠন হয়, তার প্রতি বিরূপতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের ভাবধারায়, তথা রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় চিন্তার অন্যান্য রক্ষণশীল ধারাতেও, যারা আলোকপ্রাপ্তি ও বৈপ্লবিক-প্রজাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সরাসরি বিরোধিতা করে।

জার্মানিতে ১৮ শতকের একেবারে শেষে দেখা দেয় ও ১৯ শতকের প্রথমার্ধে আইনের অধ্যয়নে খুবই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে গবেষণার একটা বিশেষ ধারা। তার তাত্ত্বিক-প্রজ্ঞানমূলক ঔৎসুক্যে ছিল না আইনের মূলকথা কী, কী তার হওয়া উচিত, ছিল এই প্রশ্ন: আইনের উদ্ভব হয় কিভাবে এবং কী তার ইতিহাস।

যাকে **আইনের ঐতিহাসিক স্কুল** বলা হয়, ব্যবহারশাস্ত্রের সেই ধারাটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন গ. হুগো (১৭৬৪-১৮৪৪), হেটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, 'জারি করা আইনের, বিশেষ করে ব্যক্তিগত আইনের দর্শন হিশেবে স্বাভাবিক বিধির পাঠ্যপুস্তক' গ্রন্থের লেখক। এই স্কুলের প্রমুখতম প্রতিনিধি ছিলেন ক. সাভিনি (১৭৭৯-১৮৬১), নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তিনি পরিবেশন করেছেন 'মালিকানার আইন' পুস্তকে, 'আইনপ্রণয়ন ও আইনবিদ্যার কাছে আমাদের কালের কাজ' পুস্তিকায় এবং ছয় খণ্ড 'আধুনিক রোমক আইনের ব্যবস্থা' গ্রন্থে। আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের প্রতিনিধিদের এই গ্রুপটা শেষ হচ্ছে গ. পুখতায়, (১৭৯৮-১৮৪৬), যাঁর প্রধান রচনা হল 'সাধারণ আইন' ও 'প্রতিষ্ঠান বিষয়ে কোর্স'।

স্বাভাবিক বিধির মতবাদ এবং তদ্‌ত্থিত গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তগুলিকে আইনের ঐতিহাসিক স্কুল তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল করে তোলে। সামন্ততান্ত্রিক-পরারাজতান্ত্রিক সম্পর্কের অনুরাগী, এই স্কুলের প্রতিনিধিরা তাই মারমুখী হন ১৭-১৮ শতকে জনপ্রিয় স্বাভাবিক বিধির ধারণার ওপর, কারণ তা সামাজিক অগ্রগতিতে বাধাদায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমালোচনার হাতিয়ার হিশেবে কাজ করেছিল। আধুনিক কালের অগ্রণী মনীষীদের দ্বারা বিকশিত স্বাভাবিক বিধির মতবাদ তার বিরোধীদের রোষ উদ্রেক করে এই জন্য যে সে মতবাদ প্রমাণ করেছিল মধ্যযুগ থেকে বিদ্যমান রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক এমন আইন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা যা 'বিচারবুদ্ধির দাবি', 'মানব প্রকৃতি' আর কার্যত পরিপক্ক সামাজিক চাহিদার দাবি মেটায়।

জারি করা আইন একটা কৃত্রিম নির্মিতি, যা এসেছে আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার সংস্থাগুলির মানপ্রবর্তক ক্রিয়াকলাপ থেকে — সর্বাগ্রে এই থিসিসের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের তাত্ত্বিকেরা। তাঁরা দাবি করেন যে রাষ্ট্রে বলবৎ আইন মোটেই সেইসব আজ্ঞার সমষ্টি নয়, যা নাকি সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাইরে থেকে: 'ওপর থেকে' তা জারি করছে এমন লোকেরা যারা তার জন্য বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত। আইনের (ব্যক্তিগত ও সাধারণী উভয়ই) উদ্ভব হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। নিজের উদ্ভবের জন্য তা মোটেই আইনপ্রণেতার বিবেচনার কাছে ঋণী নয়। হুগো ভাষার সঙ্গে আইনের একটা বৈশিষ্ট্যসূচক তুলনা দিয়েছেন। ভাষা যেমন চুক্তি মারফত চালু হয় না, কারো আদেশে রূপ নেয় না, ঈশ্বর প্রদত্ত তা নয়, তেমনি আইনও দেখা দেয় কেবল আইনপ্রণয়ন কর্মের কল্যাণে নয় এবং ততটা নয় যতটা স্বাধীন বিকাশ মারফত, আদান-প্রদানের তদুপযোগী মানের স্বতঃস্ফূর্ত গঠন অবলম্বনে এবং জনগণ তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে তার জীবন পরিস্থিতির পক্ষে যথোচিত্যের জন্য। আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার কানুন বলবৎ আইনের পরিপূরণ করতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি 'রচনা' করে দিতে তা পারে না। বলবৎ আইন আসে সাধারণ আইন থেকে আর এই শেষেরটার উদ্ভব 'জাতীয় প্রাণ', 'জনচেতনার' গভীরতা ইত্যাদি থেকে। সুতরাং, আলোচ্য স্কুলটির ধারণা অনুসারে, আইনের পোষক প্রধান উৎসটি হল প্রতিটি জাতির 'আত্মা' যা অতিসংবেদনশীল ও ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

স্বাভাবিক বিধির মতবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতাকে আইনের

ঐতিহাসিক স্কুলের প্রতিনিধিরা ঠিকই লক্ষ করেছেন, যথা -- আইনের উদ্ভব ও অস্তিত্বের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা। নিজেদের দিক থেকে তাঁরা আবার ব্যবহারশাস্ত্রীয় মানাদি ও প্রতিষ্ঠানাদির উদ্ভব ও জীবনযাপনকে ব্যাখ্যা করেছেন ঘটনার নির্দিষ্ট অবজেকটিভ গতি বলে। হুগো মনে করেন, আইনের বিবর্তন অনৈচ্ছিক, কালের চাহিদা ও প্রয়োজনের সঙ্গে তা নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়; সেই কারণে লোকের তাতে হস্তক্ষেপ না করা ভালো, পুরাকাল থেকে প্রচলিত এবং শত শত বছরের অভিজ্ঞতায় পবিত্র শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত। সাভিনির ধারণা -- জাতীয় প্রাণের গতি স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে আইনেরও বিবর্তন ঘটায়। আইনের গতিধর্ম এই অর্থে সর্বদাই একটা আঙ্গিক প্রক্রিয়া যে তা নিজের ভ্রূণ থেকে দেহের বিকাশের সমতুল্য। আইনের গোটা ইতিহাস হল সেই সারবস্তুর ক্রমিক উদ্ঘাটন যা প্রথম থেকেই জাতীয় প্রাণের জমিতে বীজের মতো উপ্ত ছিল। বিকাশের প্রথম পর্যায়ে আইন দেখা দেয় রীতিনীতির রূপে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তা বিজ্ঞানী-আইনবিদ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ঝাড়াই-মাড়াইয়ের বিষয় হয়ে ওঠে, তবে এতে করে তার শিকড়ের সঙ্গে, — জনগণের সাধারণ প্রত্যয়ের সঙ্গে সংযোগ হারায় না।

পুখতার মতে, কৃত্রিম নির্মাণ ও কালনির্বিচারে ভেবে বার করা কোনো একটা আইনী ব্যবস্থা লোকেদের কাছে প্রস্তাব করা অর্থহীন। জাতীয় প্রাণের জীবনের ইতিহাস থেকেই তা বিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্ট, তদ্দ্বারা আসিক্ত নয়, সমাজে শিকড় গাড়তে তা পারে না। জীবন্ত দেহের অঙ্গের মতো, জনগণের অখণ্ড সংস্কৃতির শাখার মতো আইনী উপস্থাপনগুলির বৈশিষ্ট্য হল আঙ্গিকতা, যা আরো অনেককিছু ছাড়াও এই ব্যাপারে প্রকাশ পায় যে আইনের বিকাশের পর্যায় ও ছন্দ মিলে যায় জনজীবনের বিবর্তনের গতির সঙ্গে। '...এই আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য আইনের সম্মুখ গতিতেও বজায় থাকে: আইনী নির্দেশগুলির ধারাবাহিকতাও আঙ্গিক। এটা প্রকাশ করা যায় একটা বাক্যে: আইনের ইতিহাস আছে।'

অবশ্যই আইনকে আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত, লোকেদের কল্পনায় উদ্ভূত, প্রকৃতির অনড় হয়ে যাওয়া একটা স্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদি রূপে বোঝা কাটিয়ে ওঠা, আইনী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজজীবনের নিয়মসঙ্গত ঐতিহাসিক সৃষ্টি বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাটা সর্বতোভাবে অনুমোদনীয়। কিন্তু পরিষ্কার মনে রাখা দরকার যে আলোচ্য স্কুলটির ঐতিহাসিকতা একটা কল্পিত ঐতিহাসিকতা। প্রথমত, তা নিহিত ভাববাদী বিশ্ববীক্ষায় এবং ধরে নেয় যে জনগণের মৌলিক প্রাণ চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয়। দ্বিতীয়ত,

বিকাশকে তা উদয়ের পথে দ্বান্দ্বিক গতির প্রক্রিয়ায় গুণগত পুনর্গঠনের শৃঙ্খল বলে নয়, দেখে প্রথম থেকেই জনগণের রহস্যময় 'প্রাণের' সরল, কালানুক্রমিক, ধারাবাহিক, যান্ত্রিক পরিবিকাশ বলে।

আইনের ঐতিহাসিক স্কুলে ব্যবহারশাস্ত্রীদের কাছে রাষ্ট্রের আইনী প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ হল বাহ্য শৃঙ্খলার খুঁটি হওয়া, তা সেটা যতই রক্ষণশীল হোক (গ. হুগো)। জীবনে যত অভিশাপ দেখা দেয়, জারি করা আইন তার সঙ্গে সংগ্রামে অক্ষম। সর্বোত্তম ক্ষেত্রে তা সাহায্য করতে পারে সাধারণ আইন ও রাজনৈতিক কাঠামোর শৃঙ্খলাসাধনে, যা দেখা দেয় জনগণের 'প্রাণে' অব্যাখ্যেয় পরিবর্তনের প্রভাবে স্বাভাবিক-ঐতিহাসিক ধারায় (ক. সাভিনি)। সর্বোচ্চ যাথার্থ্যে 'জাতির সাধারণ প্রতীতিকে' প্রকাশ করতে হবে আইনদাতাকে, আইনী মানগুলিতে তখন ঐশ্বরিক মূল্য বর্তাবে আর তাই তা স্বয়ংসম্পূর্ণ তাৎপর্য পাবে (গ. পুখতা)।

পূর্বোক্ত তথা অনুরূপ যুক্তি খেলিয়ে আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের অনুগামীরা সরাসরি দাসত্ব ও ভূমিদাসত্ব, রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাট এবং কালবৈত্যয়ী সামন্ততান্ত্রিক আইনের প্রতি একনিষ্ঠতার সাফাই গেয়েছেন: তাঁরা বলতেন: সমগ্র জার্মানির পরিসরে আইনের কোডবন্ধন ও অনুরূপ ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তাঁরা রাষ্ট্রের চুক্তিগত উদ্ভবের তত্ত্বকে অস্বীকার করেন, জনগণের যে বিপ্লবের অধিকার আছে এমন কথায় কানই দিতে চান না, ক্ষমতার বিভাগ এড়িয়ে যান এবং সে যুগের অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধ্বনিতে আপত্তি করেন। 'স্কুলটা আজকের জঘন্যতাকে গতকালের জঘন্যতা দিয়ে সঙ্গত প্রতিপন্ন করে, বেতটা কেবল পুরনো, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, ঐতিহাসিক হলেই হল, তার বিরুদ্ধে ভূমিদাসের প্রতিটি চিৎকারকে হাঙ্গামা বলে ঘোষণা করে'* — এইভাবে আইন ও রাষ্ট্র বিষয়ক বিদ্যায় উক্ত ধারার সামাজিক-শ্রেণীগত মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন কার্ল মার্কস।

ব্যবহারশাস্ত্রে হুগো, সাভিনি, পুখতা 'জাতীয় প্রাণের' যে রহস্যময়তা আনয়ন করেন, তা তার জঘন্যতার দরুন সাধারণভাবেই গবেষকদের আকৃষ্ট করেছে কম আর তার ভক্তও কম জুটেছে। তবে ঐতিহাসিক স্কুলের দার্শনিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় ভাবনাদির মধ্যে ইতিবাচক তাৎপর্য ছিল আইনের

চিরন্তনতা, অপরিবর্তনীয়তা, নিশ্চলতা নিয়ে যে স্বাভাবিক বিধির মতবাদ তার সমালোচনায়। এই স্কুলের পক্ষ থেকে আইনী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিটি জাতির জীবনের এক অখন্ড স্রোতে ঐতিহাসিক ও নিয়মসঙ্গতভাবে ভূমিষ্ঠ, ক্রিয়াশীল ও বিকাশমান বিশেষ সামাজিক ঘটনা বলে ব্যাখ্যার প্রয়াস ব্যবহারশাস্ত্রের ইতিহাসে ছাপ রেখে গেছে।

আলোচ্য স্কুলের স্রষ্টাদের সম্পর্কে সে কথা বলা বোধ করি সঠিকই হবে যা লেনিন বলেছিলেন উনিশ শতকের বড়ো দরের ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের সম্পর্কে: দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়াশীলতা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজবিদ্যাকে এগিয়ে দিয়েছেন।* নিজেদের ব্যবহারিক-রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও আইনের ঐতিহাসিক স্কুল সমাজতাত্ত্বিক ও ব্যবহারশাস্ত্রীয় তত্ত্বের পরিপূরণ করে সার্থক প্রকল্প, পদ্ধতিমূলক মূল্যবান পর্যবেক্ষণ দিয়ে। অন্তত পক্ষে উনিশ শতকে আইনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যে অগ্রগতি ঘটেছিল তা এই স্কুলের কাজের হিসাব না নিয়ে বোঝা যাবে না।

উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে রাষ্ট্র ও আইনের সমস্যাদি নিয়ে প্রখর কাজ চলতে থাকে চিরায়ত জার্মান দর্শনের কাঠামোর মধ্যে। তার দুজন প্রমুখ প্রতিনিধি — ইম্মানুয়েল কান্ট ও গেওর্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেলের রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় ধারণার সঙ্গে পাঠকেরা পরিচিত হতে পারেন এই প্রকাশনার দ্বিতীয় খন্ড থেকে। তবে জার্মান চিরায়ত দর্শন রাষ্ট্র ও আইনের অনুধাবনে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান যোগ করেছে, তা যথোচিত পূর্ণতায় হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তার আরো একজন বড়ো দরের প্রতিনিধি, কান্ট ও হেগেলের সমসাময়িক ই. গ. ফিখ্‌টের রাষ্ট্রিক-আইনী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবস্থাটাকে ভালো করে বুঝে দেখা দরকার।

বিশিষ্ট দার্শনিক ও সামাজিক কর্মকর্তা ইয়োহান গটলিব ফিখ্‌টের (১৭৬২-১৮১৪) দৃষ্টিভঙ্গিতে জার্মান বার্গার (নাগরিক) সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রবণতার দ্বৈততা ফুটেছে কান্টের চেয়েও অনেক স্পষ্টাকারে।

রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে ফিখ্‌টের সাধারণ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়েছে স্বাভাবিক-বিধির মতবাদের খাতে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির পদ্ধতিগত,

দার্শনিক মর্মার্থের বৈশিষ্ট্য হল মৌলিকতা। ফিখ্‌টে স্থিরপ্রত্যয়ী সাবজেকটিভ ভাববাদী। বাস্তব জগৎ তার অসংখ্য দিক নিয়ে তাঁর কাছে বিদ্যমান কেবল মানবিক আত্মার স্বাধীনতা প্রকাশের জন্য; মানবিক চেতনা ও মানবিক ক্রিয়াকলাপের বাইরে কোনো অবজেকটিভ বাস্তবতা নেই।

ফিখ্‌টের মতেও, আইন একটা আগে থেকে ধরে নেওয়া বর্গ। তার উদ্ভব 'বিশুদ্ধ রূপের বিচারবুদ্ধি' থেকে। আইনের প্রকৃতির সঙ্গে বাইরের ব্যাপারগুলির কোনো সম্পর্ক নেই। আইনের প্রয়োজনীয়তা আসছে আত্মচেতনা থেকে, কেননা কেবল আইন থাকলেই ব্যক্তিত্বের প্রাধান্যকারী সারবস্তুর অভিব্যক্তির মতো পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। তবে আইন ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে থাকে না। তা রচিত হয়ে ওঠে ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে। তিনি বোঝান: 'আইনের বোধটা হল বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে সম্পর্কের বোধ। তা থাকে কেবল যখন এরূপ-প্রাণীরা পারস্পরিক সম্পর্কে কল্পনীয়...।'*

এক-একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত ও তার সঙ্গে সকলের স্বাধীনতাকে মেলানোর জন্য প্রয়োজন লোকেদের আইনী সাধারণীয়তা। এরূপ আইনী সাধারণীয়তার নির্ভর-দণ্ড হওয়া উচিত নৈতিক বিধি থেকে নয়, বুদ্ধিমান-স্বাধীন প্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত ব্যবহারশাস্ত্রীয় আইন। ফিখ্‌টের মতে, আইন কাজ করে নীতিসূত্র থেকে স্বাধীনভাবে, কেবলমাত্র মানুষের ক্রিয়া ও আচরণের ক্ষেত্রটাই তা নিয়ন্ত্রণ করে।

দার্শনিকের এই মত ছিল যে আইনী সম্পর্ক, সুতরাং, ব্যক্তির স্বাধীনতা লঙ্ঘন থেকে মুক্ত নয়। আইনের আধিপত্য আপনা-আপনি দেখা দেয় না। আইনী সম্পর্ক, স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে বাধ্যকরণ মারফত। অন্য কোনো উপায় নেই। লোকেদের ব্যক্তিগত অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকে ফিখ্‌টে রাষ্ট্রকে নিষ্পন্ন করছেন। রাষ্ট্রে প্রতিমূর্ত বাধ্যকরণ শক্তি হতে পারে না ব্যক্তিগত ইচ্ছা। সেটা হতে পারে কেবল একক, যৌথ ইচ্ছা, তা গঠনের জন্য দরকার সকলের সম্মতি, প্রয়োজন তদুপযোগী চুক্তির। লোকেরাই তেমন নাগরিক-রাষ্ট্রিক চুক্তি সম্পাদন করে। তার কল্যাণে দেখা দেয় সাধারণ ইচ্ছা এবং প্রতিষ্ঠিত হয়

রাষ্ট্রপাট। জনগণের সাধারণ ইচ্ছা হল আইনপ্রণয়নের নির্ভর-দণ্ড এবং রাষ্ট্রের প্রভাবের সীমা তা নির্ধারণ করে দেয়। এখানে বেশ দেখা যায় যে গণতন্ত্রী হিশেবে ফিখ্টে প্রজাদের ওপর পরারাজতান্ত্রিক-পুলিসি ক্ষমতার স্বেচ্ছাচার ঠেকাবার চেষ্টা করেছেন এবং স্বাভাবিক-বিধির মতবাদ আশ্রয় করে ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা সপ্রমাণ করতে চেয়েছেন।

প্রজাতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি গোপন না করে ফিখ্টে ঠিকই ভেবেছিলেন যে সর্ববিধ বিচক্ষণ, আইনের দাবির সঙ্গে সঙ্গত রাষ্ট্রের (তার রূপ নির্বিশেষে) পার্থক্যসূচক দিক হল সমাজের কাছে শাসকদের জবাবদিহি। এই জবাবদিহি না থাকলে রাষ্ট্রব্যবস্থা অধঃপতিত হয় স্বেচ্ছাচারে। জনগণের সার্বভৌমত্ব যাতে ফাঁকা বুলি হয়ে না থাকে এবং সরকার কঠোরভাবে আইন মেনে চলে তার জন্য ফিখ্টে এফোরাট — অবিরত নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছেন, যার সংস্থাগুলিকে — এফোরগুলি — নির্বাচিত করবে স্বয়ং জনগণই। আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষে বিপদ দেখতে পেলেই এফোরগুলি কার্যনির্বাহী ক্ষমতার উদ্যোগকে থামিয়ে দিতে পারবে। সরকারের ব্যবস্থাদির চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবে জনগণ। পরে, ১৮১২ সালে ফিখ্টে এফোরাট গঠন অবাস্তব বলে মানেন এবং সে ধারণা ত্যাগ করেন।

জনগণের প্রশ্নাতীত কর্তৃত্বে গভীর বিশ্বাস ছিল ফিখ্টের: '...জনগণ বস্তুতই এবং স্বাধিকারে হল সর্বোচ্চ ক্ষমতা, যার ওপরে আর কোনো ক্ষমতা নেই, সর্ববিধ অন্যান্য ক্ষমতার উৎস তা এবং নিজে তা কেবল ভগবানের কাছে জবাবদিহি করবে।'* রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণের কাছে সুবিধাজনক নয়, তাতে যেকোনো পরিবর্তন ঘটাবার শর্তহীন অধিকার, সমগ্র জনগণের বিপ্লবের অধিকারের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এ থেকে এসেছে।

অবিশ্যি মোটামুটি ১৮০০ সাল নাগাদ ফিখ্টে অতটা র‍্যাডিকেল অবস্থান থেকে সরে যেতে থাকেন এবং ক্রমেই বেশি করে ওপর থেকে সংস্কারের ওপর আস্থা রাখেন। তাহলেও রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার উদারনৈতিকীকরণ, সম্প্রদায়ভেদী বিশেষ সুবিধার দূরীকরণ, সুদৃঢ় আইনানুগত্য প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রয়োজনীয়তায় দৃঢ় বিশ্বাস, জনগণের জন্য প্রবল সহানুভূতি ফিখ্টেকে কখনো ছেড়ে যায় নি। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন আলোকদান যুগের মানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত, অগ্রণী, সে কালের পক্ষে রাজদ্রোহী, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করেন নি।

ফরাসি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের তত্ত্বের প্রভাবে রচিত 'রুদ্ধদ্বার বাণিজ্যিক রাষ্ট্র' গ্রন্থে ফিখ্‌টে আদর্শ রাষ্ট্রের একটা ছবি দেন যার বনিয়াদে থাকবে বিচারবুদ্ধি ও সত্যকার স্বাধীনতা, প্রতিটি ব্যক্তির সমৃদ্ধি যা নিশ্চিত করবে। সংগঠিত শ্রমের ভিত্তিতে হতভাগ্য জনগণের স্বার্থে স্থাপিত এরূপ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে ফিখ্‌টে জার্মানিতে তাঁর সমকালীন সামাজিক সম্পর্কের তীব্র সমালোচনা করেন এবং মানুষের বেঁচে থাকার ও শ্রমের অধিকার বিষয়ে তাঁর প্রখ্যাত থিসিস পেশ করেন। 'রুদ্ধদ্বার বাণিজ্যিক রাষ্ট্র' ব্যক্তিগত শ্রমার্জিত ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত। উৎপাদনী শক্তির বিকাশ ও উত্থানের জন্য রাষ্ট্র তার যথাসাধ্য করবে। উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর বিশদ নিয়ন্ত্রণ রাখবে রাষ্ট্র, তবে কারুকর্মের পুরনো গিল্ড-সংগঠন বজায় থাকবে এবং প্রধান জোর পড়বে কৃষির ওপর। অধিবাসীরা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত: কৃষিজীবী, শিল্পজীবী ও বণিক। তা ছাড়া আরেক দল লোক থাকছে সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে লিপ্ত। শিল্পকর্ম ও পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা নিষিদ্ধ। জীবনযাত্রা কঠোরভাবে রুটিনে বাঁধা। অর্থনীতির দিক থেকে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের পথ নিচ্ছে, দেশকে পরিণত করতে চাইছে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ', 'স্বনির্ভর' সংস্থায়।

এই ইউটোপিয়াকে সত্যকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নিদর্শন বলে ধরলে অবশ্য খুবই ভুল হবে। এর রচয়িতার ওপর অচল হয়ে পড়া প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির বাঁধন বড়োই বেশি, সত্যকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। সেই সঙ্গে বিদ্যমান অবস্থাকে ফিখ্‌টে যে খারাপ, অসহনীয় গণ্য করেছেন, এমন সমাজব্যবস্থা ও এমন রাষ্ট্রের সন্ধান করতে চেয়েছেন, যেখানে সমস্ত লোকই সত্যই মানুষের মতো, সহজে, স্বাধীনভাবে চলছে, তাঁর এ মহনীয় প্রয়াসকে তুচ্ছ করা অনুচিত।

রাষ্ট্রই রাষ্ট্রের লক্ষ্য এমন কথা ফিখ্‌টে মনে করতেন না, তাঁর কাছে রাষ্ট্র হল এমন একটা আদর্শ ব্যবস্থা লাভের হাতিয়ার যাতে বিজ্ঞানে সশস্ত্র এবং যথাসম্ভব যান্ত্রিক প্রযুক্তি নিয়োগে সক্ষম লোকে বড়ো বেশি সময় ও শক্তি ব্যয় না করে ব্যবহারিক, পার্থিব কাজগুলি নিষ্পন্ন করতে পারে এবং নিজের আত্মা ও অপার্থিব ব্যাপারগুলি নিয়ে চিন্তার অবকাশ পায়।

শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের সমস্যাদি থেকে একেবারে নির্যাস ছেঁকে নিয়ে ফিখ্‌টে লিখেছেন: 'রাষ্ট্রে জীবনযাত্রা মানুষের পরম লক্ষ্য নয়... নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তা হল পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমাজ স্থাপনেব বিদ্যমান উপায় মাত্র। সমস্ত মানবিক প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রও হল একটা অমার্জিত উপায়,

নিজের বিলোপের জন্য তা চেষ্টিত: সমস্ত সরকারের লক্ষ্য হল নিজেকে অনাবশ্যক করে তোলা।'* ফিখ্‌টে অবশ্য মনে করেন যে তেমন অবস্থা আসবে কোটি কোটি বছরের পর।

জার্মানিতে যখন নেপোলিয়ন বাহিনী হানা দেয়, ফিখ্‌টে তখন বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর সংগ্রামের জন্য ব্যাপক জনগণকে উত্থিত করার বাসনায় খেপে ওঠেন। সর্বাগ্রে তিনি বিজয়ীদের হাতে জার্মানদের লাঞ্ছিত জাতীয় আত্মচেতনা জাগাবার চেষ্টা করেন; তাদের জাতীয় গর্বের কাছে আবেদন করেন তিনি। দেশপ্রেমিক আন্দোলনের উত্তেজনায় তিনি প্রায়ই এমন কথা বলেছেন যাকে তার ঐতিহাসিক পট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে অন্য সমস্ত জাতির তুলনায় জার্মান জাতির আত্মিক ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা বলে ধরা যেতে পারে। ফিখ্‌টের নিজের কিন্তু দাম্ভিক শোভিনিজমে ঘোর বিতৃষ্ণা ছিল, অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর জার্মানির প্রভুত্ব, জার্মানি কর্তৃক অন্যান্য দেশ জয় ও তাদের দাসত্বের উদ্দাম ভাবনা তিনি সইতে পারতেন না। কাণ্টের মতো তিনিও যে শান্তি ও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ন্যায্য সম্পর্কের জন্য, এরূপ সম্পর্ক বজায় রাখার মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপনের জন্য লড়েছেন সেটা অকারণে নয়।

ফিখ্‌টের বৈশিষ্ট্য হল স্বদেশের জাতীয় জাগৃতিকে তিনি সামাজিক নবীভবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট করে দেখেছেন: সংশ্লিষ্ট করেছেন একটিমাত্র কেন্দ্রীভূত জার্মান রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে যা অবশেষে হয়ে উঠবে 'জাতীয় রাষ্ট্র', বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন তা চালাতে থাকবে। এ লক্ষ্যার্জনে ফিখ্‌টে প্রধান ভূমিকা দিয়েছেন জনগণকে শিক্ষিত এবং স্বদেশ ও স্বাধীনতার প্রতি অপরিসীম ভালোবাসায় লালিত করে তোলায়। এই জন্যই তিনি জাতির সত্যকার গুরু হিশেবে বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদের শ্রমে অসাধারণ মূল্যার্পণ করেছেন, তাঁরা জাতিকে প্রগতির পথে এগিয়ে দিতে সমর্থ।

জীবন সায়াহ্নে ফিখ্‌টের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মিটমাটের প্রবণতা বেশ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ধর্মের সমস্যা নিয়ে তিনি অনেক খাটেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর দর্শনে প্রবেশ করে ফিডেইজম: ব্যক্তির নৈতিক অভিপ্রায়কে তিনি মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক অভিপ্রায়ের প্রকাশ বলে ঘোষণা

করেন। দার্শনিকের ঈশ্বর আশ্রয় হল তখন সমগ্রভাবে জার্মান বুর্জোয়াদের বিরোধী-গণতান্ত্রিক সম্ভাবনার প্রায় অনিবার্য নির্বাপণের একরকম প্রতিফলন।

জার্মানিতে বুর্জোয়া উদারনৈতিক ভাবনা গত শতকের একেবারে গোড়ায় কোনো না কোনো ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশেষ করে তা সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে ১৮৩০ সালের ফরাসি বিপ্লবের পরে, তার ঘটনাবলিতে জার্মান সামাজিক আন্দোলনে একটা জোয়ার দেখা দেয়। এই জোয়ারের তরঙ্গে এবং সেই সঙ্গে একসারি জার্মান রাষ্ট্রে কোনো কোনো সংস্কারের (খুবই সীমিত) ফলে জার্মান উদারনীতিকদের পক্ষে সম্ভব হল সে সময়ে প্রসিদ্ধ 'রাষ্ট্রের অভিধান অথবা রাষ্ট্রবিদ্যার বিশ্বকোষ' প্রকাশ করা। তাতে রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে জার্মান উদারনৈতিক বুর্জোয়া কর্মকর্তা ও ভাবাদর্শীদের টিপিকাল ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়। এই প্রকাশনার সংগঠক এবং তার সাধারণ ধারা ও বিষয়বস্তুর নির্দেশক ছিলেন কার্ল ফন রটেক ও কার্ল ভেলকার।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক. রটেকের কাছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সর্বোচ্চ রাজনৈতিক আদর্শ নয়। এই রূপের রাষ্ট্রব্যবস্থা তিনি মেনে নেন কেবল এই জন্য যে তা তাঁর কাছে সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় প্রজাতান্ত্রিক রূপের কাছাকাছি। তিনি ছিলেন স্বাভাবিক বিধি নীতির অনুগামী এবং মধ্যযুগীয়তাকে আদর্শ করে তোলা আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের ধ্যানধারণার ঘোর বিরোধী। রাজনৈতিক প্রগতির জন্য মোটেই তিনি বলাত্মক রাষ্ট্রিক বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহলেও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যাঁরা বর্তমানকে, চিরাচরিত রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদ্ধারের উপায় দেখতেন, তাঁদের তীব্র সমালোচনা করতেন।

প্রতিনিধিত্বমূলক সাংবিধানিক শাসনের পক্ষে ছিলেন রটেক। সমস্ত সংবিধান (এবং স্বতঃই তদুপরি স্থাপিত রাষ্ট্র রূপ) আইনসঙ্গত, যদি তা সাধারণ ইচ্ছার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রক্ষমতা ভাগ করা উচিত আইনপ্রণয়নী ও পরিচালকে (কার্যনির্বাহী সমেত প্রশাসনিকে)। আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা আসলে সেইটে যার পেছনে থাকে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত লান্ডটাক (প্রতিনিধি সভা) রূপে সম্প্রদায় (জনগণ)। এই ক্ষমতার বিশেষাধিকার হল: আইনপ্রণয়নে উদ্যোগ, কর স্থাপনে সম্মতিদান, রাষ্ট্রীয় বাজেটের ওপর প্রভাবপাত, প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ। প্রশাসনিক ক্ষমতা হল সেই ক্ষমতা যা জনগণ দেয় সরকারকে, তার কার্যকরী সংস্থাকে।

সংবিধানের ধারায় সীমাবদ্ধ রাজার হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতি মেনে নেন রটেক।

ভেলকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, রাষ্ট্র নিহিত প্রকৃতি, ইতিহাস ও স্বাধীনতার সমবেত ও পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপে। তা সর্বাগ্রে নির্ধারিত হয় মানবজীবনের সাধারণ শক্তি, মানবজাতি ও তার সংস্কৃতির ওপর নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীটির নির্ভরশীলতা, ঐশ্বরিক অভিপ্রায়, সমুচ্চ ভাবধারা, প্রাকৃতিক উজ্জীবন দ্বারা। রাষ্ট্রপাটের প্রকৃতি যেসব কারিকায় নির্ধারিত হচ্ছে বলে ভেলকারের ধারণা, তার পাঁচমিশেলি চরিত্র খুবই চোখে পড়ে। তিনি মনে করেন, আদি নায়কত্ব (সার্বভৌমত্ব) ন্যস্ত ঈশ্বর ও প্রকৃতিতে। তাদের কাছ থেকে নিজস্ব আইন লাভ করে ধর্মবিশ্বাস, ইন্দ্রিয়বোধ, বিচারবুদ্ধি; কিন্তু সামাজিক সংঘের স্বাবলম্বী ব্যক্তিত্ব (সার্বভৌমত্ব) অবাধ স্বীকৃতি পাক এই আবশ্যকতা থাকায় সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে করা হয় 'সমস্ত জাতির, অথবা সরকার সমেত সংঘের সমস্ত স্বাবলম্বী নাগরিকের, সাধারণভাবে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের' অধিকারাধীন।

ভেলকারের মতে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনের রূপের প্রশ্ন মীমাংসা করবে সরকার ও শাসিত জাতি। সরকারের অধিকারাধীন হওয়ায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্বভাবতই তারই প্রাপ্য, তবে কেবল সংবিধানে কঠোরভাবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। জনগণ ও সরকার পরস্পরবিপরীত। কিন্তু এটা তেমন বৈপরীত্য যা পরস্পরের পরিপূরণ করে। সরকার যদি হয় জনগণের অঙ্গ যাদের ছাড়া তার অস্তিত্বই থাকে না, তাহলে সরকার ছাড়া জনগণ হল অসম্পূর্ণ সংঘ। ভেলকার মনে করতেন, তাঁর সময়ের পক্ষে সবচেয়ে অগ্রণী প্রতিনিধিত্বমূলক সাংবিধানিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপাট তার বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় রূপ পেয়েছে, কেননা তার মধ্যে নাকি অবশেষে রাজতান্ত্রিক, আভিজাতিক ও গণতান্ত্রিক উপাদান সামঞ্জস্যের সঙ্গে মিলেছে।

জার্মানি যতই বিপ্লবের কাছে এসে পড়ছিল (ফেটে পড়ে তা ১৮৪৮ সালে) জার্মানির বিরোধী সমাজচিন্তা ততই র‍্যাডিকেল হয়ে উঠছিল। ১৯ শতকের ৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ৪০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জার্মানির আত্মিক জীবনে বড়ো একটা ভূমিকা নেন নবীন হেগেলপন্থীরা (বামপন্থী)। প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবীদের এই গ্রুপটার কাছে হেগেলের মতবাদের চর্চা হয়ে দাঁড়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রকাশ ও

প্রতিপাদনের একটা বিশেষ রূপ, সরকারি ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামের উপায়, বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সমালোচনার মাধ্যম।

নবীন হেগেলপন্থীরা মনে করতেন যে প্রথম জরুরি কর্তব্য হল জার্মানির পশ্চাৎপদ সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে আলোকদান নীতির উচ্চতায় তোলা। তাঁদের বিশ্বাস, এ কর্তব্য পালন করতে পারে ও করা উচিত প্রটেস্টান্ট ও আলোকপ্রাপ্ত রাষ্ট্র হিশেবে প্রাশিয়ার। নবীন হেগেলপন্থীরা সামাজিক বাস্তবতার বিশ্লেষণে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে ক্রমে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে রাষ্ট্র ও গির্জা, রাজনীতি ও ধর্ম হল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। যৌক্তিক প্রয়োজন হিশেবে বংশগত রাজতন্ত্র, মেয়রপ্রথা, দুই কক্ষের ব্যবস্থা প্রভৃতির মতো 'ঐতিহাসিক ফলেরও' মূল্যায়নে তাঁরা আর যান নি। সাধারণভাবে কয়েক বছর কাটার পর খোদ প্রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থাও তাঁদের কাছে আর বিজ্ঞ বলে ঠেকছিল না, কেননা তাঁদের চোখের সামনেই তার আবশ্যকতা লোপ পেল। এই থেকেই প্রুশীয় স্বাধীনতাকে সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি যে বেড়ি পাড়িয়েছিল তা ভাঙার দাবি ওঠে। নবীন হেগেলপন্থীরা মনে করতেন, 'বিচারবুদ্ধির রাষ্ট্রের' কাছে ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান রাষ্ট্রকে জায়গা ছেড়ে দিতে হলে দরকার এমন মহৎ প্রতিষ্ঠানের যা জার্মানদের প্রায় আদৌ এখনো নেই, যথা — জনগণের সরকার, শপথগ্রহীতাদের আদালত, মুদ্রণের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

নবীন হেগেলীয় আন্দোলন বেশি দিন টেকে নি। দেশে সামাজিক বৈরিতার তীক্ষ্ণায়ণ, নিজেদের মুক্তির জন্য প্রলেতারীয় জনসাধারণের সংগ্রামবৃদ্ধি, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক আমল এবং তার সমর্থক ভাবাদর্শের সঙ্গে বর্ধমান বৈরাবস্থান — এসবের ফলে নবীন হেগেলপন্থী ও তাঁদের সহগামীদের মধ্যে একটা ভাগাভাগি হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ়পণেরা স্থান নেন বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের শিবিরে, নিজেদের পূর্বেকার ভাববাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্বিচার করেন, সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত করে তোলেন।

বিবর্তনের ঠিক এই পথ ধরে এসেছেন তরুণ ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, যাঁরা একই সময়ে যোগ দিয়েছিলেন নবীন হেগেলপন্থীদের দলে। পরে কমিউনিজম ও দার্শনিক বস্তুবাদের অবস্থানে এসে তাঁরা প্রলেতারিয়েতের বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা রচনা করেন। শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকা বিষয়ে একটা সর্বাঙ্গীণ মতবাদ বিকশিত করেন তাঁরা: সে শ্রমিক শ্রেণী

শোষক বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবসান করবে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়ে ন্যায্য শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ গড়বে (এ সম্পর্কে পাঠক বিশদে জানবেন এই প্রকাশনার চতুর্থ খণ্ডে)।

তবে হেগেলের দর্শন এবং সাধারণভাবেই সারা ইউরোপীয় সমাজচিন্তার শ্রেষ্ঠ সুকৃতিগুলি আয়ত্ত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম হয়ে নবীন হেগেলপন্থীদের মধ্যে থেকে মাক্স স্টির্নারের (ছদ্মনাম কাসপার শ্মিড্‌ট) মতো নৈরাজ্যবাদের অন্যতম নামকরা প্রবক্তাও বেরিয়েছেন।

স্টির্নার প্রকাশ করেন আধাসামন্ত-রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলিত জার্মান পেটি বুর্জোয়ার মেজাজ, যাদের রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমত্তায় একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও আতঙ্ক ছিল। তাঁর মতে, লোকেদের বেষ্টন করে আছে যে সামাকিজ পরিবেশ, সেটা তাদের চেতনার পরিণাম। মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যক্তির চিন্তন হল ইতিহাসের আদি কারণ ও চালিকা শক্তি। তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি সব ধরনের ধর্ম, নৈতিকতা, বিবাহ, আইন, শৃঙ্খলা, ক্ষমতা, রাষ্ট্র ইত্যাদি অস্বীকার করছেন। যেকোনো ধরনের সামাজিক সংগঠনকে তিনি মনে করতেন এমন শক্তি, যা চিরকাল নিজ উন্নতির জন্য চেষ্টিত ব্যক্তির ('অহংবাদী') স্বাধীনতার শত্রু!

স্টির্নারের মতে, প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির আপোসহীন শত্রু হল সর্বাগ্রে রাষ্ট্রপাট, যার পরম লক্ষ্য – নিজের অস্তিত্ব, নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করা। মানুষের ওপর রাষ্ট্রের হুকুম জারি হয় যেমন দৈহিক বাধ্যকরণ ব্যবস্থায়, তেমনি আত্মিক বশ্যতার সাহায্যে। তবে রাষ্ট্রপাটের শ্বাসরোধী জোয়াল থেকে মুক্তির জন্য স্টির্নার শোষক সমাজের কার্যত বিদ্যমান রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানাদির (বলাই বাহুল্য, সেই শোষক সমাজ সমেত) বাস্তব উচ্ছেদের কথা মোটেই বলেন না। তাঁর সুপারিশটা মোটের ওপর এই যে লোকে মাথা থেকে ক্ষমতা, রাষ্ট্র, আইন, শৃঙ্খলা ইত্যাদির ভাবনা স্রেফ ঝেড়ে ফেলুক। তিনি মনে করেছিলেন, এরূপ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর অপচ্ছায়ার মতো, স্বপ্নের মতো রাষ্ট্রপাট মিলিয়ে যাবে এবং গড়ে উঠবে ব্যক্তির স্বাধীন জীবনযাপনের পরিস্থিতি। এইসব বিদ্ঘুটে এবং কার্যক্ষেত্রে অতি ক্ষতিকর ধারণাগুলিকে মার্কস ও এঙ্গেলস 'জার্মান ভাবাদর্শ' গ্রন্থে প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় সর্বাঙ্গীণরূপে বিধ্বস্ত করেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পশ্চিম ইউরোপে শ্রেণী বিরোধ অত্যন্ত তীব্র

হয়ে ওঠে, শ্রেণী সংগ্রাম ব্যাপক হয়ে বৈপ্লবিক রূপ নিতে থাকে। অধিপতি শ্রেণীদের পক্ষে এ সংগ্রামে সক্রিয় কারিকা হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্র। এই পরিস্থিতিতে এইসব শ্রেণীর ভাবাদর্শীদের কাজ হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের শ্রেণী-ঊর্ধ্ব চরিত্র সপ্রমাণ করা। জার্মানিতে সে দায়িত্ব নেন খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিদ, ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ, হেগেলের অনুগামী লরেন্‌টস ফন স্টেইন।

তিনি এই থেকে এগোন যে সমাজ শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু, এই সমাজের ওপরে স্থাপিত রাষ্ট্রের উচিত শ্রেণীর ঊর্ধ্বে থাকা। যেকোনো শ্রেণীর (বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত ইত্যাদি) উপর রাষ্ট্রের নির্ভরতা গোটা সমাজের পক্ষে সর্বনাশা। একমাত্র যে রূপে রাষ্ট্র শ্রেণীর ঊর্ধ্বস্থ প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকতে পারে সেটা হল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। স্টেইনের মতে, রাজার অবস্থান এতই উঁচুতে যে পৃথক কোনো একটা শ্রেণীর স্বার্থ তাঁর কাছে বিজাতীয়। একমাত্র রাজাই নাকি পারেন সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ বুঝতে এবং তাতে চালিত হয়ে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর ওপর পীড়ন রোধ করতে।

হেগেল অনুসরণে স্টেইন ক্ষমতাকে আইনপ্রণয়নী, সরকারি ও প্রিন্সমূলক (রাজতান্ত্রিক) বিভাগে ভাগ করেছেন। আইনপ্রণয়নে অংশ নিতে হবে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের, মন্ত্রীরা তার কাছে জবাবদিহি করবে। স্টেইন আইনানুগত্যের প্রয়োজন, নাগরিক অধিকারের অলঙ্ঘনীয়তা (উদারনৈতিকতা ধরনে) প্রতিপন্ন করেছেন — তবে এ অধিকার বলতে বোঝা হয়েছে একমাত্র 'আইনী উপায়ের' সাহায্যে নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সমাজের সভ্যদের 'সমান সুযোগ'। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে 'শ্রেণী সংঘাত মিটমাটের' হাতিয়ার বলে ঘোষণা করে তিনি এমনকি এও বলেন যে রাজা নাকি সর্ববিধ ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকায় পুঁজিপতিদের মাত্রাতিরিক্ত পীড়ন থেকে নিপীড়িতদের (অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতকে) রক্ষা করার দিকেই বরং আগ্রহী।

স্টেইনের ভাবধারা প্রাশিয়ার চ্যান্সেলার বিসমার্ক এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক কর্মকর্তারা পরে কাজে লাগান জার্মান সাম্রাজ্যের এই সাফাই গাইবার জন্য যে তা 'সামাজিক রাজতন্ত্র' হিশেবে নাকি শ্রেণী বিরোধের ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান। স্টেইনের দৃষ্টিভঙ্গির বেশ প্রভাব পড়েছিল ফার্ডিনান্ড লাসাল ও লাসালপন্থীদের ওপর, যাঁরা জার্মানির ইতিহাসে শ্রমিকদের প্রথম স্বাধীন পার্টি — সাধারণ জার্মান শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেন।

উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে জার্মানিতে অধিপতি শ্রেণীদের ভাবাদর্শীরা রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে যে মতবাদ প্রচার করেন তাতে প্রতিফলিত হয়েছে এইসব শ্রেণীর রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবাদী প্রবণতা আর সেই সঙ্গে এইসব শ্রেণীর অভ্যন্তরস্থ নির্দিষ্ট কিছু উদারনৈতিক গ্রুপের স্বার্থ। এক্ষেত্রে টিপিকাল হল অট্টো গির্কের দৃষ্টি, আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের কিছুটা পৃথক অনুগামী ইনি, মনে করতেন যে আইন 'জনগণের' রহস্যময় 'প্রাণ' থেকে উৎপন্ন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তার প্রতিষ্ঠানাদিকে আদর্শায়িত করে তিনি বুর্জোয়া যুগে আবির্ভূত রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাবেকী, সামন্ততান্ত্রিক-সম্প্রদায়ভেদী রূপের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে রাষ্ট্রের জার্মান ধারণায় ধরে নেওয়া হয় এমন একটা সাধারণ্য, ব্যক্তিদের বিভিন্ন মিলনী যেখানে সোপানতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একীভূত। যৌথভাবে গঠিত এরূপ মিলনের, 'সমাজদেহের' কল্যাণে মানুষ জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। পৃথক পৃথক ব্যক্তির চেয়ে এরূপ মিলনই আসলে উচ্চতম ধরনের ব্যক্তিস্বরূপ। শুধু তাতে যোগ দিয়ে, তার সাহায্যে ব্যক্তি তার চাহিদা মেটাতে পারে। রাষ্ট্র বিষয়ে মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে গির্কে রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন তুলেছেন, প্রচার করেছেন সংঘের আইনের, যা রাষ্ট্র থেকে স্বাধীন, 'সামাজিক' আইনের, এবং প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান থেকে আক্রমণ করেছেন বুর্জোয়া স্বাভাবিক-বিধি স্কুলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে। এতে অবাক হবার কিছু নেই যে গির্কের একাধিক ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছিল জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের আমলে।

'রাজনৈতিক ভূগোলের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রিডরিখ রাট্‌সেলের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা মোটামুটি একই রকম দাঁড়ায়। মূলত তিনি বিভিন্ন নরজাতি ধারাকে সামাজিক শ্রেণীগুলির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন এবং সমাজের রাজনৈতিক জীবনে বড়ো বেশি বাড়িয়ে তুলেছেন ভৌগোলিক পরিস্থিতির ভূমিকা। তাঁর মতে, স্বাভাবিক সীমানায় (পাহাড়, সমুদ্র) ক্ষীণবিকশিত রাজনৈতিক ক্ষমতার বিচ্ছিন্ন সামাজিক গ্রুপ গঠনে সাহায্য হয় আর সমভূমিতে সাহায্য হয় যাযাবরদের হানা থেকে আত্মরক্ষার জন্য কেন্দ্রীভূত শক্তিশালী ক্ষমতা গঠনে, যা পরে পরিবিকশিত হয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সংহত বৃহৎ রাষ্ট্রিক সংগঠনে। এই শেষোক্তটা (মালিকানা আর আইনের মতোই) গড়ে ওঠে নরকৌলিক ব্যাপারাদির প্রভূত প্রভাবেও;

রাট্‌সেলের কাছে এমনকি 'পরিবার বা কুল সরল রাষ্ট্র হয়েই থেকে গেছে'।

রাষ্ট্র কাজ করে উত্থান-পতনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অধীন সজীব দেহের মতো এবং সজীব দেহের মতোই তাকে কঠোর সীমার মধ্যে ধরে রাখা যায় না। অবস্থান ও বিস্তার রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই যুক্তি থেকে রাট্‌সেল সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে জাতির উদ্বর্তন তার সম্প্রসারণ সামর্থ্য ও ভৌগোলিক অবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। এখান থেকে জীববিদ্যা গোছের একটা অবৈজ্ঞানিক আনুরূপ্যকে উপযোগী রাজনৈতিক ভাবাদর্শে পরিণত করতে বিশেষ কিছু লাগে না। রাট্‌সেল নিজেই সেটা করেন, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির ঔপনিবেশিক নীতি সমর্থন করেন তিনি। এ দিকে আরো খোলাখুলি এগোয় জার্মানির তথাকথিত 'ভূ-রাজনৈতিক' স্কুল, যারা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিকাশ ও সম্প্রসারণের ওপর নাকি ভৌগোলিক ব্যাপারের প্রভাবই প্রধান এমন 'মতবাদ' প্রচার করে। ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনকে ন্যায্য প্রতিপাদনের জন্য জার্মানির 'বাঁচার জায়গার' অপ্রতুলতা ও রাজনৈতিক সীমানার অস্বাভাবিকতা নিয়ে হতভাগ্য যুক্তিগুলি এসেছিল এই ভূ-রাজনীতির অস্ত্রাগার থেকেই।

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিখ নিট্‌শের রচনায় এই ভাবাদর্শ খোলাখুলি গণতন্ত্রবিরোধী চরিত্র ধারণ করে। নিট্‌শেপন্থাকে দেখা উচিত প্যারিস কমিউন (১৮৭১), সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রসার ও শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদের বিজয়, প্রলেতারিয়ান জনসাধারণের সংগঠনশীলতার বৃদ্ধিতে জার্মান বুর্জোয়া ও জমিদারদের (ইউঙ্কার) সবচেয়ে আক্রমণমূলক স্তরের প্রতিক্রিয়া হিশেবে। আসন্ন সমাজতন্ত্রে আতঙ্ক, জনগণ সম্পর্কে বিদ্বেষ, যেকোনো মূল্যে পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য বিনাশ ঠেকাবার প্রয়াসে নিট্‌শের মতবাদ আচ্ছন্ন। আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের ভীতি তাঁকে প্ররোচিত করেছে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত গৃহীত মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নে: 'বাহ্যত অমোঘ সর্বজনীন বিপ্লবের লাভাস্রোত থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করা যায়?' (তাঁর রাজনৈতিক-আইনী দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ বিবরণ এ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

প্রুশীয় ইউঙ্কারদের সঙ্গে জোটবদ্ধ বৃহৎ জার্মান বুর্জোয়াদের স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৯ শতকের পশ্চিম ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজবিদদের (কান্ট, স্পেনসার প্রভৃতি) ভাবনা দিয়ে রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক ধারণা প্রয়োগের চেষ্টা করেন বিশিষ্ট জার্মান আইনবিদ রুডোলফ ইয়েরিঙ্গ (তাঁর রাষ্ট্রীয়-আইনী মতামতের জন্য এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

তাত্ত্বিক-প্রজ্ঞানমূলক ক্ষেত্রে উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে জার্মানিতে বুর্জোয়া রাজনৈতিক ও আইনী মতবাদ বিকশিত হতে থাকে প্রধানত দৃষ্টবাদের ভিত্তিতে, যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার পদ্ধতিগত ভিত্তি হিশেবে দূরানুমানিক-আধিবিদ্যক দর্শনকে খুবই কোণঠাসা করেছিল। আইনবিদ্যায় দৃষ্টবাদ প্রয়োগের ফলে দেখা দেয় ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টবাদ। এই ধারাটা (গবেষণার বিষয়বস্তু ও প্রণালীর দিক থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারশাস্ত্রীয়) বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রীয় বিশ্ববীক্ষার ঐতিহ্য চালিয়ে যায়, রাষ্ট্রীয় ও আইনী রূপগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিশেবে, সামাজিক-অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত, রাজনৈতিক সারার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে ব্যাখ্যা করে।

জার্মানিতে ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টবাদের একজন বড়ো প্রতিনিধি হলেন কার্ল বের্গবম। আইনের প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর কী ধারণা, সেটা বোঝাবার জন্য তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি তুলে দেওয়া যাক: 'যে আইন সত্যই আইন হিশেবে কাজ করে, তা বিরোধ ও ফাঁক থেকে মুক্ত এবং লোকেদের মধ্যে সম্পর্কের যেকোনো গঠনের ভিত্তি। স্বাভাবিক, বিজ্ঞ এবং জারি না করা যেকোনো আইনও এমনিতেই সম্পূর্ণ, কিন্তু যেহেতু তা অনুমানের বেশি কিছু নয়, তাই তা বুদ্ধি বিভ্রান্তির উৎস এবং তাকে আইনী ঘটনা বলে গুরুত্ব সহকারে নিলে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়ে অরাজকতার সৃষ্টি হবে।'* এও তাৎপর্যপূর্ণ যে বের্গবম অপ-ব্যবহারশাস্ত্রীয় উপস্থাপন বলে আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের অবস্থানকে অগ্রাহ্য করেছেন (অবশ্য অতটা দৃঢ়তার সঙ্গে নয়)। তাঁর মতে, এ অবস্থান (বিশেষ করে তথাকথিত 'জনগণের প্রাণ' বিষয়ে থিসিস) কার্যত ওই একই স্বাভাবিক-বিধিমূলক মনোভাবে আচ্ছন্ন।

ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টবাদে রাষ্ট্রীয়-আইনী ঘটনার ভেতরে প্রবেশ করে তার মর্মার্থ জানার সম্ভাবনা অস্বীকৃত। এই ধারার অনুগামীরা ব্যবহারশাস্ত্রীয় মানগুলিকে মনে করেন পুরোপুরি রাষ্ট্রের ইচ্ছাপ্রসূত এবং ব্যক্তির সাবজেকটিভ অধিকার এইরূপ মর্জিমাফিক মানের অনুসিদ্ধান্ত। তদুপরি খোদ মানগুলিকে দেখা হয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতার স্রেফ বাহ্যিক যুক্তিগ্রাহ্য, নিছক বিমূর্ত আদেশ বলে। নির্দিষ্ট ক্ষমতাটি তার সামাজিক সারার্থ, ঐতিহাসিক টাইপ, শ্রেণীগত বিষয়বস্তু ইত্যাদির দিক দিয়ে কী ছিল, এরূপ প্রশ্নাদিতে ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টবাদীদের কার্যত কোনো আগ্রহ ছিল না।

এ কথা অবশ্য গেওর্গ এলিনেক সম্পর্কে বলা যাবে না। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব উদারনৈতিক রাষ্ট্রবিদ্যায় একটা প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর তত্ত্বে তিনি রাষ্ট্রপাটের ব্যবহারশাস্ত্রীয় ধারণাকে (ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টবাদ অনুসারে বিকাশমান) আইনবিদ্যার সমাজতাত্ত্বিক-অভিজ্ঞতাবাদী ধারার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রবিদ্যায় শক্তির মাহাত্ম্য, রাষ্ট্রক্ষমতার অসীমতার প্রচার করতেন। তাদের থেকে এলিনেকের পার্থক্য হল এই যে বুর্জোয়া উদারনৈতিকতার অবস্থান থেকে তিনি আত্মসীমায়ন, রাষ্ট্র তৎসৃষ্ট রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের নির্দিষ্ট মানাদির সঙ্গে বাঁধা এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন।

এলিনেকের মতে, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত হওয়া উচিত পাকাপোক্ত আইনী মান দিয়ে যা গৃহীত ও পরিবর্তিত হয় আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ তদনুযায়ী রূপে, কার্যপ্রণালীতে। আইনের মান রাষ্ট্রীয় সংস্থাদির পক্ষে অবশ্যপালনীয়, সুতরাং তাদের ক্রিয়াকলাপকে তা বেঁধে রাখে। এরই কল্যাণে নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। এলিনেক মনে করেন যে আইন কেবল সেখানেই বিদ্যমান যেখানে শুধু প্রজারা নয়, রাষ্ট্রক্ষমতাও তার বাধ্য (প্রসঙ্গত, র. ইয়েরিঙ্গও অনুরূপ যুক্তি দিয়েছেন)। আইনে বাঁধা থাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতা কার্যত নগ্ন শক্তি থেকে পরিণত হয় আইনী শক্তিতে, অর্থাৎ তা কার্যকৃত হয় আইনে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। 'আইনী রাষ্ট্রের' মতবাদকে ঈষৎ রদবদল করে এলিনেকের তত্ত্বে নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে আইনী যোগাযোগের ব্যবস্থা হিশেবে (সাবজেকটিভ সাধারণী আইনের ধারণা)। পুলিস-আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে, এ তত্ত্ব চালিত বুর্জোয়া আইনানুগত্যের সমর্থনে। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানি, অস্ট্রিয়ায়, আর রাশিয়ার ক্ষেত্রে তো আরো বেশি, প্রয়োগ করলে এ তত্ত্ব রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলনের চাইতে বরং ছিল একটা বুর্জোয়া-উদারনৈতিক আদর্শ।

জার্মানিতে উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশের রাজনৈতিক-আইনী চিন্তাধারার বিকাশের ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত ফাঁক থেকে যাবে, যদি তাতে রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে মার্কসীয়, ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী ধারণার প্রসার ও প্রচারের প্রক্রিয়া উল্লিখিত না হয়। এ প্রক্রিয়ার পেছনে সর্বাগ্রে ছিল জার্মান প্রলেতারিয়েতের আন্দোলনের বর্ধমান শক্তি ও সংগঠনশীলতা, তবে

সেটা অবশ্য একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন বিচারের অপেক্ষা রাখে। বিশেষ করে তা ভ. লিবক্নেখ্‌ট, আ. বেবেল, ক. কাউটস্কি, ফ. মেরিং প্রভৃতিদের মতো বড়ো দরের জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের তাত্ত্বিক কাজের সঙ্গে জড়িত, যাঁরা সে সময় ছিলেন সরাসরি মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রভূত প্রভাবাধীন।



দ্বিতীয় অধ্যায়

আলেক্সান্দর গেৎসেন

আলেক্সান্দর গেৎসেনের (১৮১২-১৮৭০) জন্ম ধনী রুশ জমিদার ই. আ. ইয়াকভলেভের বংশে। কৈশোরে তাঁর ওপর প্রগাঢ় ছাপ ফেলে ডিসেম্ব্রিস্টদের অভ্যুত্থান। 'বিক্ষোভের, বিচারের যত কাহিনী, মস্কোয় আতঙ্ক আমায় প্রচণ্ড ঘা দেয়; নতুন একটা দুনিয়া খুলে গেল আমার সামনে; আমার নৈতিক সত্তার কাছে তা ক্রমেই একটা কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে লাগল; জানি না সেটা হল কেমন করে, কিন্তু কী ব্যাপার সেটা কম বুঝে বা খুবই ঝাপসা রকম বুঝেও আমি অনুভব করছিলাম, যে পক্ষে কামান আর বিজয়, কারাগার আর শেকল, আমি সে পক্ষে নেই। পেস্তেল আর তাঁর সাথীদের মৃত্যুদণ্ড আমার

প্রাণের ছেলেমানুষি ঘুম থেকে আমায় পুরোপুরি জাগিয়ে দিল।'* ডিসেম্ব্রিস্টদের সঙ্গে তাঁর ভাবগত সম্পর্কে গেৎর্সেন বরাবর জোর দিয়েছেন, নিজেকে মনে করতেন তাঁদের সাধনার ধারাবাহী। ভ. ই. লেনিন যা বলেছেন, ডিসেম্ব্রিস্টদের অভ্যুত্থান গেৎর্সেনকে জাগিয়ে দেয়।**

১৮২৯ সালে গেৎর্সেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময়েই রুসোর 'সামাজিক চুক্তি'র সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ৩০-এর দশকের শেষে তিনি লেখেন, এই বই দিয়ে 'রুসো দীর্ঘ কাল আমায় তাঁর কর্তৃত্বের বশীভূত করে রাখেন; এমন আকর্ষণীয় শক্তিতে উদারনৈতিক ভাবধারার উপস্থাপন আমি আর কোথাও দেখি নি। জাঁ জাককে আমি পুজো করতে শুরু করি।'***

গেৎর্সেন এবং তাঁর বন্ধু ওগারেভ নিবিষ্ট চিত্তে ফ্রান্সে ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লব ও পোল্যাণ্ডের অভ্যুত্থানের গতিধারা লক্ষ্য করে যান। 'পোলীয় অভ্যুত্থান শান্ত করার পর যে সময়টা কাটল তা দ্রুত শিক্ষা দিয়েছে। আমাদের শুধু এইটেই কষ্ট দেয় নি যে নিকোলাই বেড়ে উঠেছে এবং কঠোরতায় গেড়ে বসেছে; ভেতরে ভেতরে আতঙ্ক নিয়ে আমরা দেখতে শুরু করি যে ইউরোপেও, বিশেষ করে ফ্রান্সে, যেখান থেকে আমরা রাজনৈতিক সংকেত ও ধ্বনি আশা করছিলাম, সেখানেও ব্যাপারটা সুবিধেয় হচ্ছে না; আমাদের তত্ত্বগুলিতে আমরা সন্দিহান হয়ে উঠছে।'**** গেৎর্সেন ও ওগারেভ সাঁ-সিমোঁর মতবাদে আকৃষ্ট হন। পরে গেৎর্সেন লেখেন: 'আমাদের প্রত্যয়ের ভিত্তিতে ছিল 'সাঁ-সিমোঁবাদ' এবং মূলত তাই থেকে যায়।'***** বিশ্ববিদ্যালয়ে গেৎর্সেন ও ওগারেভকে ঘিরে বৈপ্লবিক চক্র গড়ে ওঠে, তাতে ছিলেন ন. ই. সাজোনোভ, আ. ন. সাভিচ, ন. ম. সাতিন, ভ. ভ. পাসেক, ম. প. নোস্কভ, আ. ক. লাখতিন প্রভৃতি। এই পর্বে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির বিবরণে গেৎর্সেন লেখেন: 'ধ্যানধারণাগুলো ছিল ঘোলাটে, আমরা ডিসেম্ব্রিস্ট ও ফরাসি বিপ্লবের প্রচার করতাম, পরে প্রচার করতাম

* গেৎর্সেন আ. ই.। রচনাবলি, খণ্ড ৮, পৃঃ ৬১। উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে: গেৎর্সেন আ. ই.। রচনাবলি। ৩০ খণ্ডে। — মস্কো, ১৯৫৪-১৯৬৪ সংস্করণ থেকে। (লাতিন হরফে দেওয়া উল্লেখ ছাড়া পরবর্তী সমস্ত গ্রন্থ-নির্দেশিকাগুলি রুশ সংস্করণ অনুসারে। — সম্পাঃ)

সাঁ-সিমোঁবাদ এবং ওই বিপ্লবেরই, আমরা সংবিধান ও প্রজাতন্ত্র, রাজনৈতিক গ্রন্থ পাঠ, একটি সংঘে শক্তি কেন্দ্রীভবনের প্রচার করতাম। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রচার করতাম সর্ববিধ বলপ্রয়োগ, সর্ববিধ সরকারি স্বেচ্ছাচারের প্রতি ঘৃণা।'*

বিপ্লবী চক্রে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৮৩৪ সালে ওগারেভ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কিছু সঙ্গীর সঙ্গে গের্ৎসেন গ্রেপ্তার হন। আদালতের রায়ে তিনি নির্বাসিত হন পের্মে, সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয় ভিয়াতকায়, পরে ভ্লাদিমিরে। ভিয়াতকায় গের্ৎসেন কাজ নেন গুবের্নিয়া কাছারিতে। ১৮৩৫ সালের নভেম্বরে তিনি লেখেন যে 'আইনবিদ্যার কিছু অংশ এবং খাস রুস্‌কে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানলাম।'** নিকোলাইয়ের প্রশাসনিক যন্ত্রের ব্যবহারিক জ্ঞানে পরে রুশ পরারাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনবিরোধী মর্মার্থের প্রত্যয়জনক উদ্‌ঘাটনে তাঁর সাহায্য হয়।

১৮৪১ সালে গের্ৎসেন পদত্যাগের দরখাস্ত দেন এবং ১৮৪২ সালে মস্কোয় বাসা পাতেন। এই সময়ে তিনি একসারি উল্লেখযোগ্য দার্শনিক রচনা লেখেন। গের্ৎসেনের এই দিকটার বর্ণনায় লেনিন লেখেন: 'উনিশ শতকের ৪০-এর দশকে ভূমিদাস রাশিয়ায় তিনি এতটাই উ'চুতে উঠতে পারেন যে স্বকালের মহত্তম মনীষীদের মানে পে'ৗছান। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব তিনি আত্মস্থ করেন। তিনি বোঝেন যে সেটা হল 'বিপ্লবের বীজগণিত'। হেগেল থেকেও তিনি এগিয়ে যান ফয়েরবাখ অনুসরণে বস্তুবাদে... গের্ৎসেন পুরোপুরি এসে যান দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে এবং থামেন — ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সামনে।'***

৪০-এর দশকে গের্ৎসেন 'কার দোষ?', 'চোট্টা ছাতার পাখি', 'ডক্টর ক্রুপভ' প্রভৃতি চমৎকার কতকগুলি সাহিত্য সৃষ্টি করেন। শিল্পকে তীক্ষ্ন হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করে তিনি তাঁর চক্ষুশূল স্বৈরতান্ত্রিক-ভূমিদাসব্যবস্থা, তার পাপের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। জার সেন্সরব্যবস্থা তাঁকে খোলাখুলি ও সুসঙ্গত রূপে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে দিচ্ছিল না। স্বদেশের পীড়নের 'মূক ও অলস' এক সাক্ষী হয়ে না থাকতে চেয়ে তিনি দেশের বাইরে চলে যাবেন ঠিক করলেন।

১৮৪৭ সালে গের্ৎসেন প্যারিসে আসেন ও ১৮৪৮ সালের ফরাসি বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেন।

১৮৪৮ সালের আগে পর্যন্ত গের্ৎসেন ভাবতেন পশ্চিম ইউরোপ সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে আগে এবং রাশিয়ার সাহায্যে আসবে। এই পর্বে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র থেকে তিনি ছিলেন বহু দূরে। লেনিন লেখেন যে ১৮৪৮ সালে গের্ৎসেন ছিলেন 'গণতন্ত্রী, বিপ্লবী, সমাজতন্ত্রী। কিন্তু তাঁর 'সমাজতন্ত্র' ছিল ৪৮-বছরের যুগের বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের অসংখ্য বৈচিত্র্য ও রূপভেদের একটি যেগুলি চূড়ান্তরূপে খতম হয় জুনের দিনগুলিতে। মূলত এটা মোটেই সমাজতন্ত্র ছিল না, ছিল অপরূপ একটা বাক্য, সদাশয় স্বপ্ন, যা দিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্র, তেমনি তার প্রভাব থেকে মুক্ত-না-হওয়া প্রলেতারিয়েত নিজেদের **তখনকার** বৈপ্লবিকতাকে ভূষিত করত।'*

১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পরাজয়ে গের্ৎসেনের সমাজতান্ত্রিক দিবাস্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। তিনি ছিলেন প্যারিস শ্রমিকদের জুন অভ্যুত্থানের — প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে প্রথম মহান লড়াইয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি দেখেন কী অশ্রুতপূর্ব নিষ্ঠুরতায় বিজয়ী প্রতিক্রিয়া অভ্যুত্থানী প্রলেতারিয়েতের মামলা চুকোয়। গের্ৎসেন বোঝেন নি যে এটা শ্রমিক শ্রেণীর কেবল সাময়িক পরাজয়। কিছু সময়ের জন্য মানবজাতির সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে যায় তাঁর কাছে। শুরু হয় গের্ৎসেনের আত্মিক অন্তর্দ্বন্দ্ব।

'আমি ক্রমেই পরিষ্কার করে বুঝতে পারলাম যে বিপ্লব শুধু পরাজিত নয়, পরাজিত তাকে **হতেই হত**।

'আমার আবিষ্কার থেকে মাথা ঘুরতে থাকে আমার, চোখের সামনে দেখা দিল অতল গহ্বর, অনুভব করছিলাম পায়ের তল থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।'**

কিন্তু তাঁর পক্ষে দুঃসহ এই সময়েও গের্ৎসেন রুশ জনগণের সৃজনী শক্তিতে বিশ্বাস হারান নি, শুধু তাই নয়, তিনি বলতেন, রাশিয়ায় বিশ্বাসই 'নৈতিক সর্বনাশের সামনে থেকে আমায় বাঁচিয়েছে'। 'রাশিয়া' (১৮৪৯), 'ওই তীর থেকে' (১৮৫০), 'রাশিয়ায় বৈপ্লবিক ভাবনার বিকাশ প্রসঙ্গে'

(১৮৫১), ‘দীক্ষাপ্রাপ্ত সম্পত্তি’ (১৮৫৩), ‘রুশ জনগণ ও সমাজতন্ত্র’ (১৮৫৫) প্রভৃতি একগুচ্ছ রচনায় গের্ৎসেন ‘রুশ কৃষক সমাজতন্ত্রের’ ধারণা বিকশিত করেন, দেখাবার চেষ্টা করেন যে রুশ জনগণ ‘সমস্ত ইউরোপীয় জনগণের চেয়ে নতুন সমাজব্যবস্থার বেশি কাছে’*।

লেনিন লেখেন: ‘গের্ৎসেন ‘সমাজতন্ত্র’ দেখেছেন জমি সমেত কৃষকের মুক্তিতে, গ্রাম-সমাজের ভূমি মালিকানায় এবং ‘জমির অধিকার’ সম্পর্কে কৃষক ধারণায়।’** গের্ৎসেনের মতে, যে কোষ থেকে সমাজতন্ত্র বিকশিত সেটা হবে কৃষকদের গ্রাম-সমাজ: ‘গ্রাম-সমাজ রুশ জনগণকে বাঁচিয়েছে মঙ্গোল বর্বরতা আর বাদশাহী সভ্যতা থেকে, ইউরোপীয় রং চড়ানো জমিদার থেকে এবং জার্মান আমলাতান্ত্রিকতা থেকে। গ্রাম-সমাজের সংগঠন যদিও প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েছে, তাহলেও ক্ষমতার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে থেকেছে; ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিকাশ পর্যন্ত তা নিরাপদে টিকে থেকেছে।

‘এই ঘটনাচক্রটা রাশিয়ার পক্ষে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ।’***

নিজের তত্ত্ব প্রণয়ন প্রসঙ্গে, তার সংরচন ও গভীরতা সাধনের পক্ষে ‘পশ্চিমী সমাজতান্ত্রিক ভাবনার’ বিপুল তাৎপর্যে জোর দিয়েছেন তিনি।

‘রুশ কৃষক সমাজতন্ত্রের’ তত্ত্বটা ছিল ভ্রান্ত। গের্ৎসেনের সমালোচনা করে মার্কস ও এঙ্গেলস দেখান যে গ্রাম-সমাজের অস্তিত্ব এবং সমিতিবদ্ধ হবার জন্য রুশ জনগণের আগ্রহ থাকাটাই সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। সেটা সম্ভব কেবল প্রলেতারীয় বিপ্লবের ফলে। লেনিন এই কথায় জোর দেন যে গের্ৎসেনের মতবাদে ‘সমাজতন্ত্রের **কণিকাও** নেই’****। তবে ‘রুশ সমাজতন্ত্রের’ তাত্ত্বিক ভ্রান্তি দেখানো হলেও এ কথা মনে রাখা উচিত যে রাশিয়ায় যখন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব পেকে উঠছিল, তখন সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র একসঙ্গে মিশে ছিল, প্রলেতারিয়েত সবে জন্ম নিয়েছে, এ তত্ত্ব তখন প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে, কৃষকদের প্রয়াসে তা সাড়া দিয়েছে, সরকারের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে তা প্রবুদ্ধ করেছে ৬০-৭০-এর দশকের বিপ্লবীদের।

১৮৪৯ সালেই গের্ৎসেন বিদেশে স্বাধীন রুশ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন, তবে সেটা সম্ভব হয় কেবল ১৮৫৩ সালে।

গের্ৎসেনের প্রকাশন ক্রিয়াকলাপে খুবই মূল্য দিয়েছিলেন লেনিন। তিনি লেখেন: 'বিদেশে স্বাধীন রুশ সংবাদপত্র গড়েন গের্ৎসেন, সেটা তাঁর একটা বড়ো কীর্তি। 'পোলিয়ার্নায়া জ্ভেজদা' (ধ্রুবতারা) ডিসেম্ব্রিস্টদের ঐতিহ্য তুলে ধরে। 'কলোকোল' (ঘণ্টা) (১৮৫৭-১৮৬৭) অটল হয়ে দাঁড়ায় কৃষক মুক্তির জন্য। চূর্ণ হয়ে যায় দাসোচিত নীরবতা।'* লেনিন মনে করতেন 'কলোকোল' রাশিয়ায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্রের অগ্রদূত।

৬০-এর দশকে গের্ৎসেন চের্নিশেভস্কি ও ওগারেভের সঙ্গে একত্রে 'জেমল্যা ই ভোলিয়া' (ভূমি ও স্বাধীনতা) নামে গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি গঠনে সক্রিয় অংশ নেন, যা একই সময়ে একাধিক জায়গায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করবে।

কথা ছিল বিপ্লবী অফিসাররা সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব নিয়ে তাদের মস্কো ও পিটার্সবুর্গের দিকে চালিত করবে এবং সর্বত্র জনগণকে ডাক দেবে অভ্যুত্থানের জন্য। জনগণের সঙ্গে গুপ্ত সমিতির সদস্যদের যোগাযোগের ওপর গের্ৎসেন প্রভূত গুরুত্ব দেন। 'যতদিন পর্যন্ত আমরা জনগণকে কাদামাটি আর নিজেদের ভাস্কর জ্ঞান করে আমাদের **অপরূপ উচ্চতা** থেকে তাদের নিয়ে মূর্তি গড়ছি... ততদিন জনগণের মধ্যে আমরা একগুঁয়ে নিষ্ক্রিয়তা অথবা ক্ষুব্ধ কণ্টকর বশ্যতা ছাড়া কিছুই দেখব না,' লিখেছেন গের্ৎসেন।** সম্ভবত বিশেষ করে অভ্যুত্থানের প্রশ্ন আলোচনার জন্য ১৮৫৯ সালে ন. গ. চের্নিশেভস্কি লন্ডনে গের্ৎসেনের কাছে যান।*** অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা হয়েছিল প্রথমে ১৮৬১, পরে ১৮৬৩ সালের বসন্তে; কিন্তু জার সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতিতে, দুর্বলীভূত আন্দোলনে এ পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না।

গের্ৎসেনের বন্ধু ও সমধর্মী ওগারেভ তাঁর 'আদর্শ' (১৮৫৯) নামক

রচনার পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন যে গুপ্ত সমিতির লক্ষ্য হল সমগ্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জেমস্তভো সভা আহ্বান করা। এই সভা অবিলম্বে ভূমিদাসপ্রথার উচ্ছেদ করে কৃষকদের জমি দেবে, সমাধিকার চালু করবে, সম্প্রদায়ভেদী পার্থক্য ও আমলাতন্ত্র তুলে দিয়ে জনগণের নির্বাচিতদের দিয়ে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করবে, নতুন আদালত বসাবে। রাশিয়াকে হতে হবে এক কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচিত জেমস্তভো দুমা নিয়ে ফেডারেশন।'*

মৃত্যুর কিছু আগে গের্ৎসেন পশ্চিমের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব পুনর্বিবেচনা করেন। গের্ৎসেনের বিশ্ববীক্ষার বিকাশে এই নতুন পর্যায়টি সবচেয়ে ভালো ফুটেছে 'পুরনো বন্ধুর নিকট', অর্থাৎ বাকুনিনের নিকট পত্রগুলিতে। এতে গের্ৎসেন শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা উপলব্ধির কাছাকাছি এসে যান। তিনি তাতে বলেছেন যে 'সম্পত্তিমালিক ও পুঁজিপতিদের' প্রভুত্ব অসম্ভব হয়ে উঠছে, তার পতন হওয়া উচিত 'মেহনতিদের মেসিডোনীয় ঘনবদ্ধ সারির' নেতৃত্বে জনগণের চাপে। মার্কস ও এঙ্গেলসের গড়া আন্তর্জাতিকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তিনি এবং 'আন্তর্জাতিক মেহনতি কংগ্রেসগুলির' 'গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র' ও 'সাংগঠনিক ধাঁচার' উল্লেখ করেন। লেনিন মন্তব্য করেছেন যে গের্ৎসেন এখানেও 'পুরনো বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বুলির' পুনরাবৃত্তি করছেন, 'যেন সমাজতন্ত্রকে 'সমানভাবে চাকর আর মালিক, কৃষক আর মধ্যবিত্তের কাছে প্রচার' করতে হবে'**। জীবনের শেষ পর্যন্ত গের্ৎসেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, মার্কসবাদের স্তরে উঠতে পারেন নি। পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর স্থায়ী ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল না, আর রাশিয়ায় শিল্প প্রলেতারিয়েত তখন সবে দানা বাঁধছে।

নিজের রচনায় গের্ৎসেন অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন রুশ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। সরোষে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'রাশিয়ায় সম্রাটের ক্ষমতা রোম ও বাইজানটাইনের স্বেচ্ছাচারকে বহু পিছনে ফেলে দিয়েছে'***। পরারাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করার আবশ্যিকতা প্রতিপন্ন করে তিনি দেখান যে 'পরারাজতন্ত্র সবকিছু গ্রাস করতে চেয়ে এবং সবকিছুতে ভয় পেয়ে রাশিয়ার গতি রুদ্ধ করতে থাকে। শকটের চাকায় লাগানো এটা গুরুভার **ব্রেক**, প্রতি পদে এর

চাপ বেড়ে উঠছে, শেষ পর্যন্ত তা গাড়ি থামিয়ে দেবে, তাকে শতধা করবে অথবা নিজেই চূর্ণ হবে।'*

পরারাজতন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাস অনুসরণ করে গেৎসেন দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে মস্কো জারদের স্বেচ্ছাচারের বিকাশ ঘটেছে জনক্ষমতার বিনিময়ে। তাঁর মতে, প্রাচীন রুস্ ছিল শ্রেণীহীন রাষ্ট্র, যেখানে জনজীবনের সর্ব ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট ছিল লোক সমাজের প্রেরণা। 'প্রতিটি শহর নিজের মতো করে লোক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাতে সাধারণ জমায়েত অধিকাংশ ভোটে সম্মুখস্থ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সংখ্যাল্পরা হয় অধিকাংশের সঙ্গে সম্মত হয়েছে, নয় অধীনতা না মেনে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছে; প্রায়ই তারা শহর ছেড়ে গেছে: এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।... নির্বাচিত বিচারকদের নিয়ে গড়া আদালত, যারা মৌখিকভাবে এবং শহরে স্বাধীন জমায়েতগুলির সামনে নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিবেচনা মতে আইন জারি করত, তেমন আদালত থাকায় এবং তদুপরি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী থেকে বঞ্চিত হওয়ায় প্রিন্সদের ক্ষমতা দৃঢ় হতে পারে নি।'** এ ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল, গেৎসেনের মতে, কেন্দ্রীভূতির অভাব, ১৫-১৬ শতকে যা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। রাশিয়ায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠনের ঘটনাধারা বিশ্লেষণ করে গেৎসেন লিখেছেন যে মস্কোর পরারাজতন্ত্রই রাশিয়াকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় ছিল এমন নয়। '১৫ শতকে, এমনকি ১৬ শতকের গোড়াতেও রাশিয়ায় ঘটনাবলির বিকাশ এমন অদৃঢ়তায় চিহ্নিত যে অস্পষ্ট থেকে গেছে দেশে জনজীবন এবং রাজনৈতিক জীবন নির্ধারক দুই নীতির কোনটা জয়লাভ করবে: প্রিন্স নাকি লোক সমাজ, মস্কো নাকি নভগোরোদ।' প্রাচীন নভগোরোদের ব্যবস্থাকে আদর্শায়িত করে তুলেছেন গেৎসেন, মনে করেছেন যে 'নভগোরোদ লোক সমাজের অধিকারকে সর্বদা প্রিন্সের অধিকারের ওপরে স্থান দিয়েছেন'***।

গেৎসেন মনে করতেন, মস্কোর সঙ্গে সংগ্রামে নভগোরোদের জয়লাভ আশা করার মতো হেতু ছিল। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীভবন ঘটতে পারত লোক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ মারফত। ঘটনাচক্র দাঁড়াল

স্বৈরতন্ত্রের অনুকূলে। 'রাশিয়া রক্ষা পেল; তা হয়ে উঠল প্রবল, মহান -- কিন্তু কী মূল্যে?' এটা ভূগোলকের সবচেয়ে অসুখী, সবচেয়ে গোলাম দেশ; রুশ জীবনে মুক্ত যা-কিছু ছিল সব দলিত করে রাশিয়াকে বাঁচাল মস্কো,' লিখেছেন গেৎর্সেন।*

কেন্দ্রীভূত রুশ রাষ্ট্র গঠনের দুটি সম্ভবপর পথ সম্পর্কে গেৎর্সেনের অনুমান ছিল ভুল। ন. ম. পিরুমোভা ঠিকই বলেছেন, গেৎর্সেন 'তাঁর বিশ্ববীক্ষার সীমাবদ্ধতার দরুন রুশ রাজন্যদের ঐক্যবদ্ধ করার অর্থনৈতিক ভিত্তিটা দেখেন নি, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব ও তাদের বৈরিতা তাঁর ধারণায় ছিল না, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উপরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন বোঝেন নি।'**

গেৎর্সেনের রচনায় বেশি জায়গা নিয়েছে স্বৈরতন্ত্রের গড়া রাষ্ট্রযন্ত্রের সমালোচনা। 'অধিকারহীন, রক্ষকহীন, মূক জনগণ, আইন বহির্ভূত তাদের জীবন, তাদের বিপরীতে রয়েছে সংখ্যালঘু, সরকার যাদের নিজের পেছনে পেছনে টানে, উৎসাহ দেয়, উন্নীত করে আভিজাত্যে; এই সংখ্যালঘু অংশ দিয়েই আমলাতন্ত্র গঠিত,'*** — গেৎর্সেনের মতে, এই হল রুশ সাম্রাজ্যের গঠন। সরকারি রাশিয়া 'শুরু হয় সম্রাট থেকে এবং এগোয় সশস্ত্র সিপাহী থেকে সিপাহীতে, রাজপুরুষ থেকে রাজপুরুষে, সাম্রাজ্যের একেবারে গহন কোণের শেষ পুলিসটা অবধি। এই সোপানশ্রেণীর প্রতিটি ধাপ দান্তের bolgi-র মতো (নরক গহ্বর) অর্জন করে আক্রোশের নতুন প্রাবল্য, অভিচার ও নিষ্ঠুরতার নতুন পর্যায়। অপরাধ আর অনাচার, ঘুষখোর, পুলিস, বদমাইস, সর্বদা ক্ষুধার্ত, হৃদয়হীন জার্মান প্রশাসক; সর্বদা মাতাল চোয়াড়ে বিচারক; সর্বদা নচ্ছার অভিজাতদের জীবন্ত পিরামিড এটা: সবই এটা একত্রে লুট আর হরণে জড়িত আর ছয় লক্ষের সঙিনধারী আঙ্গিক যন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'**** আমলাতন্ত্রের নৈতিক স্খলনের একটা ছবি দিয়েছেন গেৎর্সেন। রাশিয়ায় ঘুষখোরি পৌঁছেছে অবিশ্বাস্য আয়তনে। সেই সঙ্গে আমলাতন্ত্রের সম্প্রদায়টি সমগ্রভাবে নিয়মিত পালন করে স্বৈরাচারের নীতি। 'সর্বপ্রকার প্রকাশ্যতার নিষেধে গভীরভাবে অধঃপতিত

রাজপুরুষেরা হল রাশিয়ার সবচেয়ে পদলেহী শ্রেণী; তাদের ভাগ্য পুরোপুরি সরকারি ক্ষমতার হাতে,' বলেছেন গের্ৎসেন।

তিনি মন্তব্য করেছেন, জারতন্ত্রের গড়া প্রশাসনের একেবারেই কোনো শিকড় নেই জনগণের মধ্যে। রাষ্ট্রযন্ত্র কৃষকেদের ওপর চাপায় যতরকমের সম্ভাব্য অন্যায়। সম্রাট তাদের পীড়িত করে সৈন্যভুক্তি ব্যবস্থায়, জমিদাররা চুরি করে তাদের শ্রম, রাজপুরুষেরা — তাদের শেষ রুবলটাও।

পিটারের সংস্কারের সময় থেকে রুশ কৃষক 'সরকারকে আর বোঝে না; পুলিস অফিসার আর বিচারকদের মধ্যে সে দেখেছে শত্রুকে; জমিদারদের মধ্যে সে দেখেছে রূঢ় শক্তি, যা নিয়ে সে কিছুই করতে পারে না।'*

তিনি লিখেছেন: 'কথাটার আক্ষরিক অর্থে কৃষকেরা রয়েছে আইনের বাইরে। আদালত তার পক্ষে দাঁড়াবে না, বিদ্যমান অবস্থাদিতে তার সমস্ত অংশগ্রহণ দুনো ট্যাক্সে সীমাবদ্ধ, যা তাকে পিষ্ট করছে এবং যা সে বহন করছে মেহনত আর রক্ত দিয়ে। সবার কাছে প্রত্যাখ্যাত সে স্বতঃবোধে বুঝেছে যে সমস্ত শাসনব্যবস্থা গঠিত তার উপকারের জন্য নয়, ক্ষতির জন্য এবং সরকারের ও জমিদারদের কাজ হল তার কাছ থেকে আরো বেশি মেহনত, আরো বেশি সৈন্য, আরো বেশি টাকা আদায় করে নেওয়া। এইটে বোঝায় এবং চটপটে নমনীয় বুদ্ধি থাকায় তারা তাদের সর্বত্র এবং সবকিছুতে ঠকিয়ে যাচ্ছে...।'

তিনি আরো বলেছেন: 'রুশ কৃষকের অবস্থা পুরো বুঝতে হলে তাকে দেখা দরকার আদালতে: তার বিধ্বস্ত মুখমণ্ডল, সন্ত্রস্ত, সপ্রশ্ন চাউনি দেখলেই বোঝা যাবে সে হল সমর-পরিষদের সামনে এক যুদ্ধবন্দী, একদল দস্যুর মুখে পড়া পথিক। প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়বে যে বধ্যের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই এইসব দুষমনী, নির্মম, অপরিতৃপ্ত লুঠেরাদের ওপর, যারা তাকে জেরা করছে, ছিঁড়ে খাচ্ছে, লুট করছে। সে জানে যে টাকা থাকলে সে নির্দোষ, না থাকলে দোষী।'**

রাশিয়ায় যে স্বেচ্ছাচার আর বেআইনের রাজত্ব চলছিল তার দৈনিক স্বরূপমোচনে খুবই মন দিতেন গের্ৎসেন। 'অভিযুক্ত!' নামে তিনি 'কলোকোল' পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতেন, যাতে জারক্ষমতা ও জমিদারদের পাশবিকতার ওপর সবিস্তারে আলোকপাত করা হত।

ভূমিদাসপ্রথার বিরুদ্ধে গের্ৎসেন যে সংগ্রাম চালান, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল বিপুল। ৪০-৬০-এর দশকে তাঁর নিজের ও সমভাবীদের ক্রিয়াকলাপের সারসংক্ষেপ করে তিনি লেখেন: 'রাস্তার সবচেয়ে ঢাউস পাথরটা ছিল পৈশাচিক ভূমিদাসপ্রথা...। ভূমিদাসপ্রথার বিরুদ্ধেই চালিত হয় আমাদের সমস্ত আঘাত, সমস্ত প্রয়াস; সমস্ত স্বার্থকে আমরা তা উচ্ছেদের অধীনস্থ করি।'*

স্বাধীন রুশ ছাপাখানা থেকে 'সেণ্ট জর্জ দিবস! সেণ্ট জর্জ দিবস! রুশ অভিজাতদের কাছে' নামে প্রকাশিত প্রথম ইস্তাহারে গের্ৎসেন লেখেন: 'অভিশপ্ত ভূমিদাস অবস্থা যতদিন আমাদের পিষ্ট করছে, যতদিন আমাদের এখানে জঘন্য, কলংকজনক, সর্বৈব অমার্জনীয় কৃষকদের দাসত্ব থাকছে, ততদিন আমাদের কোনো মুক্তি নেই...

'মুক্ত মানুষ হব অথচ পণ্যের মতো কেনা, পশুপালের মতো বেচে দেওয়া ঘরোয়া গোলাম রাখব, তা চলে না।

'মুক্ত মানুষ হব আর চাষিদের পেটাবার, চাকর-বাকরদের কয়েদকুঠরিতে পাঠাবার অধিকার থাকবে, তা চলে না।'

অভিজাতদের সাবধান করে দেন গের্ৎসেন: 'গ্রামাঞ্চল বেসামাল হয়ে উঠছে। কৃষকেরা তাকাচ্ছে গোমড়ামুখে। নফরেরা কথা শুনছে কম। কতরকম খবর শোনা যাচ্ছে। কোথাও সপরিবারে পুড়িয়ে মারা হয়েছে জমিদারকে, কোথাও আরেকজনকে মারা হয়েছে হাতা আর শস্য আছড়ানোর লাঠি খন্তা দিয়ে, খেতে কিষাণীরা গলা টিপে মেরেছে গোমস্তাকে, কোথাও **বাজার-সরকারকে** ডাণ্ডা পিটিয়ে আদায় করা হয়েছে চুপ করে থাকার খত।'**

অভিজাতদের গের্ৎসেন ডাক দিয়েছেন কৃষকদের মুক্তিদানে সাহায্য করার জন্য। 'শেকল খোলার চাবি আপনাদের হাতে। আমাদের মনে হয় বিস্ফোরণের অপেক্ষায় থাকার চেয়ে ছাড় দেওয়াটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ, **বিচক্ষণতা**। গোটা জাহাজটা ডোবাবার চেয়ে কিছু ভার ছুঁড়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ।'***

অভিজাতদের কাছে আবেদন করলেও গের্ৎসেন ভূমিদাসপ্রথা উচ্ছেদের বৈপ্লবিক পন্থাকে বাদ দেন নি। ইস্তাহারে তিনি এই বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন যে, 'পুগাচেভ হাঙ্গামাও ভয়াবহ, কিন্তু খোলাখুলি বলছি, কৃষকদের

মুক্তি যদি অন্যভাবে কেনা না যায়, তাহলে এভাবে কেনাও দুর্মূল্য নয়। ভয়াবহ অপরাধ নিয়ে আসে ভয়াবহ পরিণাম।' অভিজাতদের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন: 'আমরা এখনো বিশ্বাস রাখছি আপনাদের ওপর... সেই জন্য আমরা সরাসরি আমাদের অভাগা ভাইদের বলতে যাচ্ছি না যে তারা নিজেদের শক্তি মেপে দেখুক যেটা তারা জানে না, বলছি না উপায়ের কথা যেটা তারা অনুমান করে না, দেখিয়ে দিচ্ছি না আপনাদের দুর্বলতা যেটা তারা সন্দেহ করে নি, তাদের এ কথা বলতে যাচ্ছি না: 'তাহলে ভাইয়েরা, এবার তোলো কুঠার। সারা জীবন ভূমিদাস হয়ে থাকা, বেগার দেওয়া, বাবুদের বাড়িতে ফাই-ফরমাজ খাটা আমাদের চলবে না; পবিত্র মুক্তির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকো, আমাদের নিয়ে ঢের হয়েছে মালিকের হাসাহাসি, ঢের হয়েছে আমাদের মেয়েদের ধর্মনাশ, ঢের হয়েছে আমাদের বুড়োদের পাঁজরে লাঠি ভাঙা... তাহলে বাছারা, খড় গোঁজো, খড় গোঁজো বাবুর বাড়ি ঘিরে, শেষ বারের মতো গরম হয়ে নিক বাবুরা!'

'এ কথার বদলে আমরা বলছি: আপনাদের হাতে থাকতে থাকতে বড়ো দুর্দশাটা ঠেকান।'*

গেৎর্সেনের উদ্ধৃত কথাগুলো এই সাক্ষ্য দেয় যে তিনি অভিজাত বৈপ্লবিক কর্মসূচির সীমা ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছেন, প্রথম পদক্ষেপ করছেন বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিকতাব দিকে।

১৮৫৫ সালের ২৬ জুলাইয়ে ডিসেম্ব্রিস্টদের মৃত্যুদণ্ডের বার্ষিকীতে গেৎর্সেন প্রকাশ করলেন 'পলিয়ার্নায়া জ্ভেজদা' পত্রিকার প্রথম খণ্ড। তাতে তিনি ছাপান 'সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের নিকট পত্র'। চিঠিতে দেখা যায় যে গেৎর্সেন জারের মোহ তখনো কাটিয়ে ওঠেন নি। জারকে তিনি বলছেন: 'কৃষকদের জমি দিন। সেটা এমনিতেই তাদের জিনিস: রাশিয়া থেকে ভূমিদাসত্বের কলঙ্কিত দাগটা ধুয়ে ফেলুন, আমাদের ভাইদের পিঠে নীল কালশিরাগুলো সারিয়ে তুলুন — মানুষের প্রতি বিদ্বেষের ভয়াবহ চিহ্ন এগুলি।' তবে এ পত্রেও গেৎর্সেন বৈপ্লবিক পথ বাদ দেন নি। 'তাড়াতাড়ি করুন! ভবিষ্যৎ দুষ্কর্ম থেকে কৃষকদের বাঁচান, রক্তপাত থেকে তাদের বাঁচান যা তাদের ঝরাতেই হবে,' লিখেছেন তিনি দ্বিতীয় আলেক্সান্দরকে।**

গণতান্ত্রিকতা থেকে উদারনৈতিকতায় পিছিয়ে আসেন গের্ৎসেন। কিন্তু লেনিন যা দেখিয়েছেন, 'তাহলেও তাঁর মধ্যে গণতন্ত্রীই প্রাধান্য করেছে'। উদারনীতিকরা কৃষকদের মুক্তি মেনে নিত জমি না দিয়ে। কৃষক সমস্যার এরূপ সমাধানে গের্ৎসেনের ছিল ঘোর আপত্তি। 'জমি নিজের হাতে রেখে চাষিদের মুক্তি দেওয়া — জমিদারদের একাংশ তার বেশি কিছু চায় না,' — লেখেন তিনি 'দীক্ষাপূত সম্পত্তি' প্রবন্ধে। 'এরূপ মুক্তি থেকে কী হবে?

'পিটার্সবুর্গের স্বৈরক্ষমতা, আমাদের রাজপুরুষদের, জেমস্তভোর পুলিসদের নিয়ে কল্পনা করুন ইউরোপীয় কৃষি ব্যবস্থা। কল্পনা করুন দুই কোটি প্রলেতারীয় যারা কাজ খুঁজছে জমিদারের জমিতে, এমন দেশে যেখানে কোনো আইনানুগত্য নেই, যেখানে সমস্ত শাসন উৎকোচে বশীভূত ও অভিজাত, যেখানে ব্যক্তিত্ব কিছু নয়, ক্ষমতাই সর্বকিছু।'*

'পলিয়ার্নায়া জ্ভেজদা'র দ্বিতীয় গ্রন্থে নিজের ন্যূনতম কর্মসূচি সূত্রবদ্ধ করে তিনি লেখেন: 'প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের গোটা কর্মসূচি পর্যবসিত হয় প্রকাশ্যতার প্রয়োজনে এবং সমস্ত পতাকা মিলে যায় একটায় — জমি সমেত কৃষকদের মুক্তির পতাকায়।'** সমান সঙ্গতির সঙ্গে জমি সমেত কৃষকদের মুক্তির ভাবনা অনুসৃত হয়েছে 'কলোকোল' পত্রিকাতেও। ১৮৫৭ সালের শেষে জার সরকার যখন কৃষি সংস্কার আয়োজনের পথ নেয়, 'কলোকোল' তখন এ উদ্যোগকে স্বাগত করে এবং দ্বিতীয় আলেক্সান্দরকে অভিহিত করে 'দাসত্ব ধ্বংসকারী' জার বলে***। সেই সঙ্গে ১৮৫৭ সালের ২ ডিসেম্বরের জার ফরমানের ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি এই কথায় বিশেষ জোর দেন যে 'নতুন পর্বের **সরকারি,** অনিবার্য, আবশ্যক সূচনা হওয়া উচিত ভূমিদাস কৃষকদের মুক্তি দিয়ে যাতে কৃষকরা যে জমি চাষ করছে **সেটা দেওয়া হবে পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে নয়, গ্রাম-সমাজের হাতে।**'****

১৮৫৮ সালের সেপ্টেম্বরেই পশ্চিম ইউরোপীয় পাঠকদের দরবারে সংস্কারের আয়োজনে সঙ্গতিহীনতা ও ভীরুতার জন্য দ্বিতীয় আলেক্সান্দরকে সমালোচনা করছেন গের্ৎসেন। তিনি লেখেন যে খুবই অনির্দিষ্টভাবে হলেও জার ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মন্ত্রী প্রথমে ভূমি ব্যবহারের কথা বলেছিলেন যা কৃষকদের দিতে হবে, গৃহ ও খামার-কুঠির

কথা বলেছিলেন যা ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিতে হবে। এখন কিন্তু 'খামার-কুঠি' কথাটা দেখা দিচ্ছে কম আর ক্রমশ তার জায়গা নিচ্ছে 'কুঁড়ে', 'মুরগি-ঘর' বা ওই ধরনের সব কথা।

অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মন্ত্রীর সার্কুলারগুলিতে 'কৃষকদের মুক্তির বদলে দেখা দিচ্ছে তাদের জীবনের 'পরিস্থিতি উন্নয়ন' কথাটা। 'অভিজাতরা... যে জমি কৃষকেরা চষে তা তাদের দিতে চাচ্ছে না, নিষ্ক্রিয়ভাবে তারা প্রতিরোধ করছে। সরকার নতি স্বীকার করছে, যেখানে বলপ্রয়োগ করা দরকার সেখানে সরকার উদারনীতিক আর তাই দ্রুত এগুচ্ছে পুরোপুরি **ব্যর্থতার** দিকে', দেশের পরিস্থিতির এই মূল্যায়ন করেছিলেন গের্ৎসেন। এই অবস্থায় কৃষক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে পরিষ্কার সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি। তিনি লিখেছেন: 'জমি না পেলে কৃষকের মুক্তি দরকার নেই। এবং আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে জমি সে পাবেই। সুদৃঢ় হবার জন্য আমরা তাকে প্রবুদ্ধ করছি।'*

'কলোকোল' ক্রমেই দৃঢ়ভাবে কৃষকদের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়াতে থাকে। তা দাবি করে 'খামার-কুঠির জমি শুধু নয়, কৃষকদের ব্যবহৃত সমস্ত খামার জমির ক্ষতিপূরণে ক্রয়',** জমিদারের 'গ্রাম-সমাজের কর্তা' হবার অধিকারে আপত্তি করে,*** কৃষকদের জন্য উৎক্রমণমূলক 'জরুরি বাধ্যতামূলক' সময়সীমা ধার্যের বিরোধিতা করে****। তবে গের্ৎসেন ও ওগারেভ ছিলেন চের্নিশেভস্কির চেয়ে কম সঙ্গতিশীল। যেমন, বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকদের জমি বিলি কার্যত অসম্ভব বলে তাঁরা মনে করতেন এবং আলোচনা করেছেন কেবল ক্ষতিপূরণের পরিমাণের প্রশ্ন নিয়ে। প. আ. জাইওনচ্কোভস্কি ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে তাঁদের দাবি বহুদিক দিয়ে 'নির্ধারিত হয়েছে সেই সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে যাতে, তাঁদের মতে, জমিদাররা স্বেচ্ছায় রাজি হতে পারে।'*****

রাশিয়ায় শ্রেণী সংগ্রামের বৃদ্ধি, চের্নিশেভস্কি, দব্রোলিউবভ, সের্নো-সলোভিয়েভিচের পক্ষ থেকে গের্ৎসেনের ভুলগুলির সমালোচনার ফলে

গেৎর্সেন 'ওপরতলার' নিকট উদারনৈতিক আবেদন চূড়ান্তরূপে বর্জন করেন এবং 'পুরনো, দুর্ভাগ্যজনক এই ভাবনা যে জার সত্যকার মুক্তি দিতে ইচ্ছুক, শুধু কেউ যেন তাঁকে বাধা দিচ্ছে, যেক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে কেবল অন্যরাই কেউ জারকে বাধা দিচ্ছে না, নিজেই উনি নিজেকে বাধা দিচ্ছেন, কেননা নিজেই উনি সত্যকার মুক্তি দিতে চান না' — এ ভাবনার তীব্র নিন্দা করেছেন।*

রাশিয়ায় আসন্ন বিপ্লবকে অভিনন্দন জানান গেৎর্সেন। 'দানব জাগছে' প্রবন্ধে তিনি রুশ জনগণের উদ্দেশে লিখেছেন: 'সুপ্রভাত তোমায় — সময় হয়েছে, হয়েছে! তুমি ঘুমিয়েছ মহাবীরের মতো, এবার মহাবীর হয়ে জেগে ওঠো। সতেজে টান হয়ে দাঁড়াও, তাজা প্রভাতী বাতাসে নিশ্বাস নাও, হাঁচো — পেঁচা, দাঁড়কাক, রক্তচোষাদের, পুতিয়াতিন, মুরাভিয়েভ, ইগ্নাতিয়েভ আর অন্যান্য বাদুড়দে এই গোটা ঝাঁকটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য; **তুমি** জাগছ, এবার **ওদের** মরার সময়।'**

জুন দিনগুলোর পর গেৎর্সেনের অবিচল মনোযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্র ও আইনের সমস্যা। 'এখন আদালতের কাছে মানুষের এই দাবি করার সময় হয়েছে: প্রজাতন্ত্র, আইনপ্রণয়ন, প্রতিনিধিমূলকতা, নাগরিক এবং অপরের ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক বলতে যা বোঝায় তেমন সবকিছু বোধ' — লিখেছেন তিনি 'ও পার থেকে' গ্রন্থে।*** যে সিদ্ধান্ত তিনি টেনেছেন, দেখা যাচ্ছে তা খুবই দৃঢ়প্রত্যয়ী: 'আমাদের কালের বৈপ্লবিক ভাবনা ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না; পরস্পরের প্রতি তাদের মনোভাব তেমন, যেমন জাপান প্রসঙ্গে ব্রিটিশ আইনকানুন অথবা প্রাচীন গ্রীস প্রসঙ্গে ব্রান্ডেনবুর্গের আইন।'****

বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাট এবং বুর্জোয়া আইনপ্রণয়নের সমালোচনা গেৎর্সেন চালিয়েছেন পুঁজিবাদের প্রতিপক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার পক্ষপাতী হিশেবে। সাধারণ অর্থনীতির দিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বুর্জোয়া সমাজে উত্তরণ যে তর্কাতীত একটা প্রগতি, সেটা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন।***** কিন্তু মানবজাতি এতেই থেকে যেতে পারে না। তিনি

লিখেছেন: 'আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাপারটা যেভাবে চলেছিল তা আর চলতে পারে না। পংজির একান্ত রাজত্ব এবং সম্পত্তির শর্তহীন অধিকারের অবসান এসে গেছে যেভাবে একদা এসেছিল সামন্ততান্ত্রিক ও আভিজাতিক রাজত্বের অবসান। ১৭৮৯ সালের আগে যেমন মধ্যযুগীয় জগতের শুকিয়ে মরা শুরু হয়েছিল মধ্য সম্প্রদায়ের অন্যায় সমন্বয়ের চেতনা থেকে, তেমনি বর্তমানেও অর্থনৈতিক ওলটপালট শুরু হয়েছে মেহনতিদের প্রতি সামাজিক অন্যায়ের চেতনা দিয়ে। যেমন তখন অভিজাতদের একগংয়েমি আর অধঃপতন সাহায্য করেছে নিজেদেরই ধ্বংসপ্রাপ্তিতে, তেমনি বর্তমানেও একগংয়ে ও অধঃপতিত বুর্জোয়া নিজেই নিজেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সমাধিতে।'* গের্ৎসেন প্রত্যয়জনকতার সঙ্গে দেখান যে বুর্জোয়া ব্যবস্থা হল অর্থনৈতিক শক্তি, শ্রম আর ঐশ্বর্যের আপতিক বণ্টনের ওপর স্থাপিত একটা দাসত্ব। পংজিবাদ সর্বসাধারণের কল্যাণের সঙ্গে খাপ খায় না। 'যাতে সম্পত্তি বাড়ে সঠিকভাবে তার জন্য অধিবাসীদের নয়-দশমাংশ পেট ভরে খেতে পায় না,' লিখেছেন গের্ৎসেন।** 'একদিকে মেহনত, অন্যদিকে পংজি, একদিকে কাজ, অন্যদিকে যন্ত্র, একদিকে ক্ষুধা, অন্যদিকে বেঅনেট,' — এই বলে পংজিবাদী সমাজের বর্ণনা করেছেন গের্ৎসেন।***

পংজিবাদের প্রধান রোগ হল মানবজাতির অধিকাংশের নিঃস্বতা, যা হল সামাজিক জীবনের সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে বড়ো প্রশ্ন। সরোষে প্রশ্ন করেছেন গের্ৎসেন: 'ক্ষুধার্ত, শীতার্ত, ছিন্নবেশ জনগণের পাশে জীবনের সমস্ত দান ও আশীর্বাদ ভোগ করতে ধনীদের কে দেয়?'**** 'এক গ্লাস জ'লো মদের জন্যে ট্র্যাজেডি' কাহিনীতে তিনি দেখিয়েছেন সাধারণত পংজিবাদী সমাজে আর বিশেষ করে ইংলণ্ডে গরিবদের অধিকারহীনতার ভয়াবহ ছবি। 'সর্বত্র এবং বিশেষ করে ইংলণ্ডে **নিঃস্ব** কথাটার মানে আপনারা জানেন কি... এ কথাটায় নিহিত আছে সবকিছু: মধ্যযুগীয় বহিষ্কৃতি আর নাগরিক মৃত্যু... আইন, বিচারক... সর্ববিধ আরক্ষার অভাব, সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চনা... এমনকি পড়শীর কাছে সাহায্য চাইবার অধিকার থেকেও...'।*****

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সত্যকার মর্মার্থ বোঝার একেবারে কাছাকাছি এসে

যান গেৎর্সেন। তিনি দেখান যে অমানবিক, অন্যায় সমাজব্যবস্থা টিকে থাকছে, কারণ বুর্জোয়া স্বহস্তে পুঞ্জীভূত করেছে নৈতিক ও বৈষয়িক সম্পদ, দখল করেছে গির্জা আর সরকার, যন্ত্র আর বিদ্যালয়, সৈন্যবাহিনীকে আজ্ঞাধীন করেছে নিজেদের। পুঁজিবাদী দেশের সরকার হল বুর্জোয়ার 'গোমস্তা' আর রাষ্ট্র হল 'রাজনৈতিক জোচ্চোর আর শেয়ার বাজারী দালালদের একটা অনামা সমিতি'।*

১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময় প্রলেতারিয়েত যখন নিজেদের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে যায় তখন পুঁজিবাদী দাসত্ব সংরক্ষণ ও সংহতির জন্য রাষ্ট্র যে রক্ত-ঝরানো, সন্ত্রাসের ভূমিকা নেয় তাকে ধিক্কার দিয়েছেন গেৎর্সেন। জনগণকে দলনের নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতায় বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও আইন এমনকি মুষ্ট্যাঘাতী আইনের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও ছাড়িয়ে গেছে। 'ক্ষিপ্ত দোকানদার' সভার তুলনায় মেটেরনিক আর বেনকেনডর্ফ তো 'নিরীহ শিশু, ভালো ছেলে', গেৎর্সেনের মতে। এই 'ক্ষিপ্ত দোকানদাররা', অর্থাৎ জাতীয় রক্ষী বাহিনীরূপী বুর্জোয়া মুখে ক্ষিপ্ত ও ভোঁতা আক্রোশ ফুটিয়ে জনগণের হানা থেকে রক্ষা করেছে নিজেদের দোকান, ভয় দেখিয়েছে বন্দুকের বেঅনেট আর কুঁদো দিয়ে। হত্যাকাণ্ডে বয়ে গেছে রক্তের নদী, প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণ পতাকায় যে রক্ত শুকোয় নি। জুন দিনগুলোয় হত্যা হয়ে দাঁড়ায় বুর্জোয়ার কাছে বাধ্যতামূলক, 'যে মানুষ প্রলেতারিয়েতের রক্তে হাত ভেজায় নি, কূপমণ্ডূকদের কাছে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্দেহজনক'**। বিনা বিচারে বুর্জোয়ারা গুলি করেছে শ্রমিকদের, প্রলেতারিয়েতের ওপর বিজয়ে উদ্দাম উল্লাস করেছে। পুঁজির অধিকার, সম্পত্তির অলংঘনীয়তা রক্ষার জন্য এক লক্ষ লোকের সৈন্যবাহিনী 'প্রথম হুকুমেই ঘোড়া টিপতে' তৈরি ছিল, লিখেছেন গেৎর্সেন।

পুঁজিবাদী দেশে জনগণ আইনের স্রষ্টা এই মিথ্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে গেৎর্সেন দেখান যে সত্যকার আইনদাতা হল বুর্জোয়া, তারাই রাজনৈতিক অধিকারভোগী একমাত্র সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে থেকেই বাছা হয় আইনপ্রণেতাদের, রক্ষক পার্টি হিশেবে সরকারি সঙ্গতির ওপর, সৈন্যবাহিনী আর পুলিসের ওপর নির্ভর করে এই সম্প্রদায়ই সমস্ত সম্পদের অধিকারী। তিনি লেখেন, রাশিয়ায় ভূমিদাসভিত্তিক নিকোলায়ী আইন সংহিতা যদি

হয়ে থাকে স্বৈরতন্ত্রের স্বার্থে প্রজাদের বিরুদ্ধে, তাহলে বুর্জোয়া 'নেপোলিয়নী আইন সংহিতার চরিত্রও ঠিক একই,' যদিও শেষোক্তটা শুরু হচ্ছে অসহ্য মিথ্যা দিয়ে: ফরাসি জনগণের নামের ব্যঙ্গাত্মক অপব্যবহার করে এবং 'স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব আর সমতার' কথায়।*

বুর্জোয়া গণতন্ত্র সর্বজনীন সমতা ঘোষণা করে কেবল মুখের কথায়, কিন্তু কোনোরকম গ্যারাণ্টি দিয়ে তা সুরক্ষিত করে না, এই ভণ্ডামি আর মিথ্যাচারের মুখোস খুলে তিনি লিখেছেন: 'এ গণতন্ত্র সম্পত্তিতে প্রলেতারিয়েতের অধিকার মানে তার জন্য কোনো সঙ্গতি না দিয়ে, আদালতের কাছে অপরাধীদের সমতা ঘোষণা করে আর নির্দোষদের যে যেমন পারে ব্যবস্থা করে নিক এই ফতোয়া দেয়।' তিনি উল্লেখ করেছেন: 'ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিদের রাষ্ট্র রূপ তাদের অভ্যন্তরীণ অর্থে স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব — কোনোটার সঙ্গেই খাপ খায় না। এসব ধারণার যেকোনো রূপায়ণই হবে সাম্প্রতিক ইউরোপীয় জীবনের নাকচ, তার মৃত্যু'**।

গের্ৎসেন বিশেষ মন দিয়েছেন বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট প্রথার স্বরূপ মোচনে। পার্লামেণ্টী ক্রিয়াকলাপের জনবিরোধী চরিত্র তিনি তুলে ধরেন, যা পুরোপুরি বুর্জোয়াদের হাতে।

ঘুষ, হুমকি এবং নির্বাচকদের ওপর চাপ দেবার অন্যান্য উপায়ে বুর্জোয়ারা পার্লামেণ্টে তাদের প্রয়োজনীয় আসন নিশ্চিত করে, জনগণের সত্যকার প্রতিনিধি সেখানে প্রায়ই পেঁছিয় না। পুঁজিবাদী দেশে ভোটাধিকার হল জনপ্রতারণার একটা উপায়, 'সর্বজনীন ভোটাধিকার... খিস্টধর্ম প্রচারিত সমতার মতোই একটা দৃষ্টিবিভ্রম'। গের্ৎসেন দেখিয়েছেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী বুর্জোয়ারা পার্লামেণ্টকে ব্যবহার করে নিজেদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম থেকে মেহনতিদের বিচ্যুত করার বাগাড়ম্বরী উপায়, কখনো-বা জনগণকে দমনের সংস্থা হিশেবে। প্রথম ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট হল 'সামাজিক প্রয়োজনকে কথা আর নিঃশেষ বিতর্কে গাঁজিয়ে তোলার একটা চতুর উপায়' আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের কাজ শ্রমিকদের গুলি করা জাতীয় রক্ষীদের আশীর্বাদ করে কালিগুলা আর বুর্বনের মতো লোকেদের বুকে জড়িয়ে ধরা।

৪০-এর দশকের শেষ আর ৫০-এর দশকের গোড়ায় গের্ৎসেনের ভাবনা-

চিন্তায় একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেয় মানবিক সহবসতির রূপের প্রশ্ন। তার সমাধান তিনি খুঁজেছেন ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের আরো সাধারণ একটা সমস্যায়। 'রাষ্ট্র আর ব্যক্তি, ক্ষমতা আর স্বাধীনতা, সাম্যবাদ আর স্বার্থপরতা (কথাটার ব্যাপক অর্থে) — এই হল মহান সংগ্রামের, মহান বৈপ্লবিক মহাগাথার হারাকিউলিয়ান স্তম্ভ',* বলেছেন তিনি।

ব্যক্তিসত্তাকে 'সমাজের, জনগণের, মানবজাতির, ভাবকল্পের' অধীনস্থ করার, 'ব্যক্তির সমস্ত মৌলিকতাকে সর্বজনীন ব্যক্তিত্বহীন, তার কাছ থেকে স্বাধীন একটা ক্ষেত্রে' সরিয়ে আনার দৃঢ় বিরোধিতা করেছেন গেৎর্সেন।** ব্যক্তিসত্তা ও সমাজের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের পথ খুঁজতে গিয়ে তিনি 'সামাজিক প্রজাতন্ত্রের' আদর্শ উপস্থিত করেছেন।

মানবিক সহবসতি সংগঠনের দুটি রূপের কথা লিখেছেন গেৎর্সেন — রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, তবে কথাটার আদি লাতিন অর্থ থেকে তিনি, স্পষ্টতই, প্রজাতন্ত্রকে ধরে নিয়েছেন সহবসতির এমন সংগঠন বলে যেখানে জনগণের স্বার্থ সত্যই কার্যকর হচ্ছে।

তিনি লিখেছেন: 'রাজতন্ত্রে জনগণকে চালানো হয়, প্রজাতন্ত্রে জনগণ নিজেদের কাজ চালায়। রাজতন্ত্র হল সন্তানদের ওপর পিতা, চাকর-বাকরদের ওপর মনিব, পালিতদের ওপর অভিভাবকের দেখাশুনার টাইপ। প্রজাতন্ত্র হল স্বাধীন কর্মশালা সমবায়, সাধারণ কাজ আর একই রূপ অংশ গ্রহণে ভ্রাতৃবৃন্দের টাইপ।'***

রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে তফাত করেছেন গেৎর্সেন আর সামাজিককেই মনে করেছেন সত্যকার প্রজাতন্ত্র। তিনি লিখেছেন: 'রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্রগুলির অভিজ্ঞতায় পরিষ্কার দেখা গেছে যে সেগুলি ছিল কেবল নামে প্রজাতন্ত্র, কেবল কথা, desideratum (কাম্য — **সম্পাঃ**)। সেগুলি ছিল কেবল জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি; সুতরাং তার মূর্তিমান রূপ নয়।'****

এইভাবে আরিস্টটল থেকে শাসনের বাহ্যিক রূপের যে শ্রেণীভেদ চলে এসেছে, গেৎর্সেন দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রে তিনি নতুন সারার্থ যোগ করেছেন। গেৎর্সেন রাষ্ট্র শাসনের দুটি রূপের

কথা তোলেন নি, বলেছেন রাষ্ট্র (রাজতন্ত্র) এবং সমাজের অরাষ্ট্রীয় সংগঠনের (প্রজাতন্ত্র) মধ্যে পার্থক্যের কথা।

রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের একটা সুসঙ্গত প্রতিতুলনা করে গেৎসেন লিখছেন যে 'রাজতন্ত্রকে অবশ্য-অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে কর্তৃত্বের পবিত্র অলঙ্ঘনীয়তার ওপর'। পক্ষান্তরে, 'কর্তৃত্বের বিলোপই হল প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত। তার প্রথম শর্ত হল স্বাধীন ও স্বপ্রকৃতিস্থ মানুষেরা; কর্তৃত্ব হত্যা করে বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতাকে।'*

দ্বিতীয় পার্থক্য, গেৎসেনের মতে, এই যে রাজতন্ত্র দ্বৈতপন্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'জনগণের সঙ্গে সরকারের মিলে যাওয়া চলবে না, মিলতে পারে না।' পক্ষান্তরে, 'প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রেরণা দ্বৈতপন্থা নয়, সমুহতা, সর্বব্যাপ্তি; তাতে আত্মিক আর পার্থিব, উচ্চ আর নীচ কিছু নেই।'** তিনি লিখেছেন, প্রজাতন্ত্রের 'প্রয়োজন নেই সরকার হিশেবে নিজের প্রতিনিধিত্বের...। নিজের আত্মক্ষমতাকে নির্বাচিতদের কাছে তুলে দেওয়ার ভাবনাটা রাজতান্ত্রিক ও মিথ্যা ভাবনা। স্বাধীন মানুষ তার শ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই আত্মক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, নিজের ভোটের দাস হতে পারে না। প্রতিনিধিমূলকতাও রাজতন্ত্র, তবে ভণ্ড। প্রজাতন্ত্রে থাকে আস্থা-ভাজন, প্রতিনিধি, তাদের প্রয়োজন দূরত্ব, কর্মোপলক্ষ ইত্যাদি নিছক বৈষয়িক কারণে। কিন্তু তাদের যোগফল সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, তারা তাদের প্রেরকদের ইচ্ছা পূরণ করে, তারা জনগণের উর্ধ্বে নয়, স্বাধীন লোকেদের মাথার ওপরে কিছু নেই; নেই এমনকি অশ্মীভূত কোনো অনুশাসনও...

'প্রজাতন্ত্রে শাসন হল ভলোস্ত শাসন, জনগণের কাছারি, সামাজিক ব্যাপারের দপ্তর, জনগণের ইচ্ছার রেজেস্ট্রি, পুলিসি শৃঙ্খলা, কার্যনির্বাহ...।'***

গেৎসেনের মতে, তৃতীয় পার্থক্য হল এই যে 'শক্তিশালী কেন্দ্রীভূতি ছাড়া রাজতন্ত্র থাকতে পারে না'। পক্ষান্তরে, 'কেন্দ্রীভূতির আদৌ কোনো প্রয়োজন প্রজাতন্ত্রের নেই, প্রজাতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত সাধারণ উপকার, সাধারণ বিকাশ, স্বগোত্রীয়তা, অধিকার, রক্তের ওপর এবং এই ভিত্তি যদি তার না থাকে, তাহলে কৃত্রিম ঐক্য, অস্বাভাবিক কেন্দ্রীভূতির কোনো

প্রয়োজন নেই। আপাতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ অংশগুলি খসে পড়তে, আরো আপন, অন্য কোনো মেলে যোগ দিতে অথবা স্বধর্মী হয়ে থাকতে পারে।'*

রাজনৈতিক, অর্থাৎ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে তিনি দেখেছেন একটা উপরিভাগের ব্যাপার বলে, যা প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ অর্থ মেটায় না, তার বিপরীতে তিনি উপস্থিত করেছেন অভ্যন্তরীণ, সত্যকার প্রজাতন্ত্রকে, 'যাকে বলা হয় সামাজিক'। 'প্রজাতন্ত্রের আছে আদর্শ, প্রবণতা, যতক্ষণ তা জন আত্মক্ষমতার **প্রতিনিধিত্বে** সীমাবদ্ধ থাকছে, ততক্ষণ তা বাস্তব নয়। উত্তম পরিস্থিতিতে তা হতে পারে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের চেয়ে মুক্ত, কিন্তু যতক্ষণ তা বিদ্যমান ঐতিহাসিক সমাজব্যবস্থাটার ভিত্তিটাকে অপরিবর্তনীয় বলে গ্রহণ করে থাকছে, ততক্ষণ তা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। আর যে মুহূর্তে তা সে ভিত্তিগুলো ডিঙিয়ে যাবে, তখনই তা হয়ে উঠবে সামাজিক,' — এই কথায় জোর দিয়েছেন গের্ৎসেন।

রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করলেও গের্ৎসেন সেই সঙ্গে রাজতন্ত্রের তুলনায় তার সুবিধা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'রাজতন্ত্র থেকে তার এই একটা সুবিধা যে গতির, পরিবর্তনের, সুতরাং আশারও উপাদান তাতে নিহিত। রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্র নেহাৎ একটু বেশি ভদ্র; তাতে ক্ষমতা অত্যাচারী থেকে গেলেও তা বঞ্চিত হয় গোপন অভিষেক থেকে, বঞ্চিত হয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রমত্ত চরিত্র, রাজ মহিমা থেকে, যেগুলি মানবিক শৌর্যকে ভোঁতা করে দেয়, বিচারবুদ্ধিকে ভোঁতা করে দেয়।'**

রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার না হলেও একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিশেবে গের্ৎসেন তাকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির অঙ্গীভূত করেছেন। রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্র তাঁর কাছে জনমুক্তির পথে একটা জরুরি পদক্ষেপ, সামাজিক প্রজাতন্ত্রের প্রয়োজনীয় অগ্রদূত।

সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্রের অতিমূল্যায়নের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন গের্ৎসেন, এ প্রজাতন্ত্রের মুখোশ খোলার, তাতে জনগণের বিশ্বাস ধূলিসাৎ করার ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'আমাদের... জেনে রাখতে হবে যে 'প্রজাতন্ত্র' কথাটা এমনিতে অসাধারণ অনির্দিষ্ট ও নমনীয়; 'প্রজাতন্ত্র' বললে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতার অস্বীকৃতি আর সামাজিক

ব্যাপারে জনগণের কিছু-একটা অংশ গ্রহণের স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই বলি না।'*

গেৎসেনের মতে, 'সামাজিক প্রজাতন্ত্র' হল রাষ্ট্রহীন সমাজ, তার নামকরণ প্রসঙ্গে একাধিক ক্ষেত্রে তিনি 'নৈরাজ্য' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'আবার প্যারিসে' পত্রগুচ্ছের (১৮৪৮ সালের ২৮ অগাস্ট — ১৮ সেপ্টেম্বর) তৃতীয় পত্রের আদি সংস্করণে তিনি লিখেছেন: 'যেমন প্রকৃতিতে তেমনি প্রজাতন্ত্রে সমস্ত আত্মা আর সমস্ত দেহ, সবাই স্বাধীন আর সবাই সম্পর্কবদ্ধ, সবাই নিজের মতন আর সবাই সম্মিলিত, নৈরাজ্য মানে বিশৃংখলা নয়, ক্ষমতাহীনতা, self-government (স্বশাসন — সম্পাঃ), সরকারের স্পর্ধিত হুকুমদার হাতের জায়গায় আসে প্রয়োজনীয় নীতি স্বীকারের স্পষ্ট চেতনা, আইনকানুন দেখা দেয় উপস্থিত কাল, জাতিসত্তা, ঘটনাচক্রের জীবন্ত পরিস্থিতি থেকে, তা শুধু চিরস্থায়ী নয় তাই নয়, অবিরাম তা পরিবর্তনীয়, বর্জনীয়।'**

এ কথা বলা দরকার যে 'নৈরাজ্য,' 'ক্ষমতাহীনতা' বলতে গেৎসেন মোটেই সমাজতান্ত্রিক সমাজের জীবনে সর্ববিধ ক্ষমতা, সর্ববিধ কর্তৃত্বের বিলোপ বোঝেন নি। সর্বাগ্রে তিনি বিরোধিতা করেছেন সেই ক্ষমতার যা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, যাকে তিনি স্বৈতপন্থা বলেছেন, তিনি তার বিরোধী। আমাদের মতে, ঠিক এইভাবেই তিনি প্রশ্নটা রেখেছেন ট. কার্লাইলের নিকট ১৮৫৫ সালের ১৪ এপ্রিলের পত্রে। তাতে তিনি লিখেছেন: 'নৈরাজ্য', 'বাধ্যতার গুণ' — এ সবই সুনির্দিষ্টতা দাবি করে, অস্পষ্টতা, অনির্দিষ্টতা খুবই বিপজ্জনক। 'নৈরাজ্য' বলতে যদি বোঝায় 'বিশৃংখলা', 'স্বেচ্ছাচার', 'পারস্পরিক দায়িত্বের অবসান', 'বিচারবুদ্ধির সঙ্গে অসামঞ্জস্য', তাহলে সমাজতন্ত্র তার সঙ্গে লড়ে রাজতন্ত্রের চেয়েও বেশি দৃঢ়ভাবে।'***

গেৎসেনের মতে, সামাজিক প্রজাতন্ত্রের ধারণাটা স্লাভ জনগণের কাছে বিশেষ রকমের আপন। তিনি লিখেছেন: 'স্লাভ জনগণ রাষ্ট্রও ভালোবাসে না, কেন্দ্রীভূতিও ভালোবাসে না। বিচ্ছিন্ন লোক সমাজে থাকতে তারা পছন্দ করে, সর্বপ্রকার সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে তাদের তারা বাঁচাতে

চায়। সিপাহীবাজিকে তারা ঘৃণা করে, পুলিসকে তারা ঘৃণা করে। স্লাভদের কাছে সম্ভবত **ফেডারেশন** হবে বেশি জাতীয় রূপ।'*

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে গের্ৎসেনের ধারণা সরাসরি ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর দানা বাঁধতে থাকে প্রুধোঁর লক্ষণীয় প্রভাবে। ১৮৪৯ সালের ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর মস্কো বন্ধুদের নিকট পত্রে তিনি প্রুধোঁকে বলেছেন 'ফ্রান্সে বৈপ্লবিক মূলনীতির সত্যকার শিরোমণি'**। তবে 'সামাজিক প্রজাতন্ত্রের' চরিত্রের প্রশ্নটা গের্ৎসেন বিচার করেছেন একেবারে স্বাধীনভাবে। এটা তাৎপর্যসূচক যে গের্ৎসেনের ওপর প্রুধোঁর প্রভাব বাড়িয়ে দেখতে উৎসুক ফরাসি ঐতিহাসিক র. লাবরি পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হন যে গের্ৎসেনের 'সামাজিক প্রজাতন্ত্রের' ভাবনাটা পুরোপুরি মৌলিক।***

প্রুধোঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে গের্ৎসেনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটা এদিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে রুশ মনীষী প্রুধোঁর সংস্কারবাদী প্রকল্পগুলি সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে, সমাজতন্ত্রের পথ পাততে হবে সামাজিক বিপ্লব ও বৈপ্লবিক একনায়কত্বের সাহায্যে। যেমন, তিনি লেখেন যে ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রলম্বন হওয়া উচিত ছিল 'ব্লাঙ্কির প্রজাতন্ত্র, অর্থাৎ মুখের কথায় নয়, সত্যসত্যই প্রজাতন্ত্র... রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্রে যাবার উৎক্রমণ অবস্থা হিশেবে বৈপ্লবিক একনায়কত্ব; suffrage universel (সর্বজনীন ভোটাধিকার — **সম্পাঃ**), কেবল স্বৈরাচারী সভার নির্বাচনে বিদঘুটে ও করুণ প্রয়োগে নয়, সমস্ত প্রশাসনেই; **শক্তিশালী** সরকার যা গুলি আর শেকল দিয়ে বোঝায় তার অধীনতা থেকে মানুষের, কমিউনের, ডিপার্টমেন্টের মুক্তি।'**** বিপ্লবের বিরোধীদের ক্ষেত্রে সঙ্গতিহীনতা ও অদৃঢ়চিত্ততার জন্য সাময়িক সরকারকে অভিযুক্ত করেছেন গের্ৎসেন, প্রাগ্‌বিপ্লব রাজপুরুষদের ঝেঁটিয়ে দূর করে নি বলে ভর্ৎসনা করেছেন।*****

বৈপ্লবিক শক্তির কর্মের মূল্যায়নে গের্ৎসেন 'পুলিসী-ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ' বর্জন করে লেখেন: 'গোটা জনগণের জন্য বৈধতা বাধ্যতামূলক হতে পারে না; জনগণ যখন উত্থিত হয়, তখন সে নির্দিষ্ট মুহূর্তটির

ন্যায় ও আইনানুগত্যের জীবন্ত উৎসকে বহন করে নিজের মধ্যে, আইন সংহিতার ধারা মেনে সে চলে না, নতুন আইন সৃষ্টি করে।... এরূপ মুহূর্তে জনগণ নিজেদের স্বৈরক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সেই চেতনা অনুসারে কাজ করে।'*

বৈপ্লবিক একনায়কত্ব সম্পর্কে গেৎর্সেন যা বলেছেন তা থেকে এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে তিনি পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে যাবার উৎক্রমণ পর্বের আবশ্যকতা আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর কাছে নতুন সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের পূর্বশর্ত ছিল উৎপাদনী সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়, লোকেদের চেতনায় পরিবর্তন। ১৮৪৯ সালে তিনি লেখেন: 'আসন্ন বিপ্লবকে শুরু হতে হবে কেবল সম্পত্তি আর নাগরিক ব্যবস্থার চিরন্তন প্রশ্ন থেকে নয়, মানুষের নৈতিকতা থেকে, প্রত্যেকের বুকের মধ্যে তাকে ধ্বংস করতে হবে রাজতান্ত্রিক ও খ্রিস্টীয় নীতিকে; লোকেদের নিজেদের ভেতরকার সমস্ত সম্পর্ক মিথ্যা, সব আসছে ক্ষমতার নীতি থেকে, সবই দাবি করে আত্মবলি, সবই প্রতিষ্ঠিত কল্পিত সদাচার আর কর্তব্যের ওপর।... রাজনৈতিক বিপ্লবের অবসান আর নতুন বিশ্বধ্যানের উদয় — এই প্রচার করতে হবে আমাদের।'**

বোঝা যাচ্ছে, 'নতুন বিশ্বধ্যানের উদয়' ঘটতে হবে সামাজিক বিপ্লবের আগে। এই কারণে, গেৎর্সেনের মতে, বৈপ্লবিক একনায়কত্বের পর্বটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে খুবই সংক্ষিপ্ত, বৈপ্লবিক একনায়কত্বকে সাধন করতে হবে কেবল প্রতিবিপ্লবী অভিযান দমনের বিশুদ্ধ রাজনৈতিক কর্তব্য। এই সঙ্গে আরো একটা ব্যাপারের কথাও উল্লেখ করা দরকার। সাময়িক বৈপ্লবিক একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা গেৎর্সেনের কাছে দেখা দিয়েছে সামাজিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জনগণ তখনো তৈরি হয়ে ওঠে নি বলে। জ. ভ. স্মিরনভা সঠিকভাবেই বলেছেন: 'এরূপ একনায়কত্ব তাঁর কাছে বিপ্লবীদের, সমাজতন্ত্রের, 'সামাজিক' প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতীদের সংগঠন, নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতার রূপ নয়।'***

গেৎর্সেনের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর স্পষ্টতই নির্দিষ্ট একটা প্রভাব ফেলেন বাকুনিনও। তবে ৬০-এর দশকের মাঝামাঝিতেই যেমন বৈপ্লবিক সংগ্রামের

রণকৌশলের প্রশ্নে, তেমনি রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক প্রশ্নেও তাঁদের মধ্যে বেশ মতভেদ লক্ষিত হয়। এ মতভেদের সাক্ষ্য হতে পারে ১৮৬৬ সালের জুলাইয়ে গের্ৎসেনের কাছে লেখা বাকুনিনের পত্র, যাতে তিনি প্রশ্ন করেছেন: 'নাকি তুমি রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্রী, আমাদের যুগপ্রসূত সবচেয়ে জঘন্য ও বিপজ্জনক মিথ্যার সঙ্গে: সরকারি গণতান্ত্রিকতার সঙ্গে, লাল আমলাতান্ত্রিকতার সঙ্গে মিটমাট করে নিতে প্রস্তুত?'* 'পুরনো বন্ধুর নিকট' চিঠিগুলিতে গের্ৎসেন বাকুনিনের সঙ্গে চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তাতে রাষ্ট্রের তত্ত্বের প্রশ্নে গের্ৎসেন রাষ্ট্রকে দেখেছেন ক্ষমতা সংগঠনের ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা রূপ হিশেবে। তিনি লিখেছেন: 'রাষ্ট্র একটা রূপ যার মধ্য দিয়ে চলে বেশ বড়ো পরিসরে সর্ববিধ মানবিক সহবসতি। অবস্থাচক্র অনুসারে তা ক্রমাগত বদলায় এবং প্রয়োজনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়।... রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট নিজস্ব কোনো অন্তর্বস্তু নেই। প্রতিক্রিয়া আর বিপ্লব — যার দিকে শক্তি, একই ভাবে তার সেবা করে; এটা হল সাধারণ অক্ষের কাছে চাকার মিল, তাদের এখানে বা সেখানে নিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক — কেননা গতির ঐক্য দেওয়া হয়েছে, কেননা তা একটা কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত।'** লাসালের ভাবনায় সায় ছিল গের্ৎসেনের, যিনি 'রাষ্ট্র শক্তি' ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন 'সমাজব্যবস্থা' প্রবর্তনের জন্য।

'পুরনো বন্ধুর নিকট' চিঠিগুলিতে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ পর্বের প্রয়োজনীয়তার ভাবনা পরিষ্কার অনুসৃত হয়েছে আর রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে এই উৎক্রমণ নিশ্চিত করার মতো সক্রিয় শক্তির ভূমিকা। গের্ৎসেন লিখেছেন: 'সত্যি, কোন জনগণের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্ব খসিয়ে নেওয়া যাবে অনাবশ্যক একটা ব্যান্ডেজের মতো, তেমন সব শিরা-উপশিরা আর অভ্যন্তর না উদ্‌ঘাটিত করে, যা **এবার** ভয়াবহ বিপদ ঘটিয়ে পরে নিজেই খসে পড়বে?'

আগের মতোই গের্ৎসেন এই ভাবনা নিয়েই এগিয়েছেন যে সমাজতন্ত্রের আগে থাকা চাই ব্যক্তির নৈতিক পুনঃশিক্ষা, কিন্তু এবার তিনি সমস্যাটাকে জড়িত করেছেন রাষ্ট্র নাকচের সঙ্গে। চিঠিগুলিতে তিনি প্রশ্ন করেছেন: 'কী মানে হয় রাষ্ট্র নাকচের, যখন তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রধান শর্ত হল অধিকাংশের সাবালকত্ব।' গের্ৎসেন এও উল্লেখ করেছেন যে ফ্রান্স,

প্রাশিয়া প্রভৃতি অন্যান্য যে জনগোষ্ঠী প্রচণ্ডভাবে রাষ্ট্রে আঁকড়ে থাকছে তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় বিনা সর্বনাশে কোনো একটা জাতিও রাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। এইসব বিচারের কেন্দ্রীয় থিসিস তিনি সূত্রবদ্ধ করেছেন অতি সংক্ষেপে: 'রাষ্ট্র একটা **অস্থায়ী** রূপ, এ থেকে আসে না যে রূপটা ইতিমধ্যেই **অতিক্রান্ত**...।'*

রুশ মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে গের্ৎসেনের আছে একটা প্রমুখ ভূমিকা। 'গের্ৎসেনের স্মৃতিতে' নামক প্রবন্ধে লেনিন লিখেছেন: 'গের্ৎসেনকে শ্রদ্ধা করে প্রলেতারিয়েত তাঁর দৃষ্টান্তে শিখছে বৈপ্লবিক তত্ত্বের মহা তাৎপর্য; — বুঝতে শিখছে যে বিপ্লবের নিঃস্বার্থ আনুগত্য এবং জনগণের নিকট বৈপ্লবিক প্রচার কখনো বৃথা যায় না এমনকি যখন বপন ও ফসলের মধ্যে থাকে পুরো কয়েক দশকের ব্যবধান; — শিখছে রুশ ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবে বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দিষ্ট ভূমিকা কী।'**



তৃতীয় অধ্যায়

মিখাইল বাকুনিন

রুশ এবং আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনে নৈরাজ্যবাদের ভাবপ্রচারকদের মধ্যে মিখাইল বাকুনিনের স্থান নিঃসন্দেহেই সর্বাগ্রগণ্য। সর্ববিধ পীড়নের প্রতি তাঁর অকপট ও দৃপ্ত বিদ্বেষ, বিপ্লবের বিজয়ের জন্য আত্মবলির অবিচলতায় বহু বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোকের সহানুভূতি লাভ করেছেন তিনি, শ্রমিকেরাও তার অন্তর্গত। সেই সঙ্গে মুক্তির মূর্ত-নির্দিষ্ট পথ সম্পর্কে ঘোলাটে এবং সর্বাগ্রে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি তাঁকে ঠেলে দিয়েছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শীয় প্রতিপক্ষদের শিবিরে।

গত শতক যাবৎ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যস্থ

বিভিন্ন সংকীর্ণতাবাদী, সুবিধাবাদী, শোধনবাদী গ্রুপেরা থেকে থেকেই জয়গান গেয়েছে বাকুনিনের। কমিউনিস্টবিরোধী বুর্জোয়া প্রচারও সাহায্য করেছে তাতে, যা প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের আসল অভিসন্ধি প্রায় আড়াল করছে সাধারণভাবেই রাজনৈতিক, শ্রেণী একনায়কত্বের ধারণা বর্জনে।

রাষ্ট্রের শক্তির সঙ্গে একচেটিয়া কোম্পানিগুলির শক্তি যোগ করে সাম্প্রতিক পুঁজিবাদ গত শতকের পুঁজিবাদের তুলনায় ব্যক্তি ও রাষ্ট্র, স্বাধীনতা প্রবৃত্তি ও বলপ্রয়োগের মধ্যে অনেক বেশি সংঘাতমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে, যা আমাদের কালে নৈরাজ্যবাদী মনোবৃত্তি প্রসারের আরো একটা কারণ। গত দশকে বাকুনিন ধারা সমেত নৈরাজ্যবাদী ভাবনা একটা অনুকূল জমি পেয়েছে পশ্চিমের বাম-র‍্যাডিকেল যুবজনের মধ্যে, যারা 'ব্যাপক পরিভোগের সমাজে' ব্যক্তির আত্মিক ও রাজনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে।

বিচিত্র মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ বাকুনিনের (১৮১৪-১৮৭৬) জীবন। প্রাচীন অভিজাত বংশোদ্ভূত ত্ভেরের এক জমিদারের পুত্র তিনি, লালিত হন ধর্ম ও সিংহাসনের প্রতি আনুগত্যের প্রেরণায়। প্রাথমিক শিক্ষা বাকুনিন লাভ করেন গোলন্দাজ বাহিনীর বিদ্যালয়ে। সামরিক বৃত্তি তাঁর জন্য নয়, অচিরেই এটা অনুভব করে ২১ বছর বয়সে দৃঢ়চিত্তে তাতে ইস্তফা দিয়ে বাসা পাতেন মস্কোয়, সেখানে তিনি বেলিনস্কি, স্তানকেভিচ, গ্রানোভস্কি, পরে গের্ৎসেনের সান্নিধ্যে আসেন। জীবনীকাররা যা বলেছেন, সুনিয়মিত দার্শনিক শিক্ষার্জন তাঁর হয়ে ওঠে নি। কাণ্ট অধ্যয়ন শুরু করেন বাকুনিন, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে না গিয়ে তিনি ফিখ্‌টের দর্শনে আকৃষ্ট হন, অবশেষে দ্বারস্থ হন হেগেলের। 'বাস্তবতার বিজ্ঞতা' বিষয়ে হেগেলের সুবিখ্যাত ভাবনায় তিনি উচ্ছ্বসিত হন এবং সেটাকে গ্রহণ করেন চূড়ান্ত রক্ষণশীলতার অবস্থান থেকে, যাতে রাশিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে বরবাদ করাকে 'বুদ্ধির অর্থহীন অরাজকতা' বলে ধিক্কার দেওয়া হয়, বিপ্লবকে অভিশাপ দেওয়া হয় এই আত্মিক অধঃপতনের ফল বলে। গের্ৎসেন আর ওগারেভের আর্থিক সাহায্যের দৌলতে ১৮৪০ সালে বাকুনিন দীর্ঘ দিনের জন্য রাশিয়া ত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি যান বার্লিনে, সেখানে তিনি দর্শন, ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি রক্ষণশীল হেগেলবাদের অবস্থান থেকে তার বামপন্থী ধারায় চলে যান,

অবশ্য নবীন হেগেলবাদীদের প্রভাব ব্যতিরেকে নয়, এখানেই রূপ নেয় বিপ্লবী গণতন্ত্রী হিশেবে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

তখন থেকে তিনি সংগ্রাম করতে থাকেন 'বিপ্লব নীতির প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে', বিদ্যমানের 'নির্মম বরবাদের' জন্য এবং মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের নীতি নেওয়া ফরাসি বিপ্লবকে তার যোগ্য মর্যাদা দেন। সেই সঙ্গে নবীন হেগেলপন্থীদের কারো কারো নৈকট্য, তাদের চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচয় (বীর এবং সমালোচকের মতো চিন্তাশীল ব্যক্তির পূজা) যা জনসাধারণের বিপরীতাশ্রয়ী, তাতে খুবই প্রভাবিত হন বাকুনিন। তাঁর বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ যত সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে, ততই কাজের, ব্যবহারিক সংগ্রামের নামে তত্ত্ব ও দার্শনিক নির্মীতির প্রতি তাঁর অবজ্ঞা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ন্যায়, মুক্তি ও বিপ্লবের সামাজিক প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ঝাপসা ধারণায় তুষ্ট থাকলেও বাকুনিন ভাবাদর্শীয় আলোচনা, রাজনৈতিক আন্দোলন ও বৈপ্লবিক ঘূর্ণাবর্তে নির্ভয়ে ঝাঁপ দেন।

ইউটোপীয় কমিউনিজমের নামকরা তাত্ত্বিক ভিলহেলম ভেইটলিঙ্গের সঙ্গে পরিচয়ের পর বাকুনিন দস্যু ও নানা ধরনের শ্রেণীচ্যুত লোকেদের বৈপ্লবিক ব্রতে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং 'পুরুষালী দুনিয়ার' সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকেও আসন্ন বিপ্লবের চালিকা শক্তি বলে মেনে নিতে থাকেন।

রুশ এবং সুইস পুলিসের প্ররোচনামূলক তাড়নায় বাকুনিন ১৮৪৪ সালে সুইজারল্যান্ড (সেখানে তিনি প্রায় ১ বছর ছিলেন) থেকে বেলজিয়ামে আসেন এবং তারপর প্যারিসে (রাশিয়ায় ফিরতে অস্বীকারের পর রুশ সরকারের দাবিতে তাঁকে রুশ নাগরিকত্ব ও অভিজাত প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত করে সাইবেরিয়ায় কয়েদখাটুনিতে দণ্ডিত করা হয়)। প্যারিসে বাকুনিন সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, লুই ব্লাঁ ও কাবের অনুগামীদের আন্দোলনের তত্ত্ব ও ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করতে থাকেন, ঘনিষ্ঠতা হয় প্রুধোঁর সঙ্গে। রাত জাগা আর তর্কবিতর্কের মধ্যে বাকুনিন প্রুধোঁর পরিচয় ঘটান হেগেলের দর্শনের সঙ্গে আর প্রুধোঁ তাঁকে দীক্ষিত করেন নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণায়।

প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে পরিচয় হয় বাকুনিনের। 'বিশ্ব ধ্বংসের' ভবিষ্যৎ 'দানব' বাকুনিন তখনো নবীন, মার্কসের চোখে তিনি ছিলেন 'ভাবপ্রবণ ভাববাদী'। এ সাক্ষাৎকারের কথা বাকুনিন পরে স্মরণ করেছেন: 'অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে আমার তখন কোনো ধারণাই ছিল না এবং আমার সমাজতন্ত্র ছিল নিছক সাহজিক। আমার চেয়ে ছোটো হলেও উনি তখনই নিরীশ্বরবাদী,

বস্তুবাদী পণ্ডিত এবং সচেতন সমাজতন্ত্রী... বেশ ঘন ঘনই আমাদের দেখা হত, কেননা ওঁর জ্ঞান আর প্রলেতারীয় সাধনার প্রতি আবেগদৃপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ নিষ্ঠার জন্য আমি তাঁকে সম্মান করতাম।'*

৪০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাকুনিন স্লাভ আন্দোলনের জগতে ডুব দেন, যেটা তাঁর ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক বিকাশের বিশ বৎসরাধিক ব্যাপী সর্বস্লাভীয়, নতুন একটা পর্ব। এই বছরগুলিতে বাকুনিন আবির্ভূত হন এক বিপ্লবী রূপে, যিনি স্লাভ জনগণ, বিশেষ করে সমস্ত স্লাভ কৃষকদের মুক্তির জন্য, অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য এবং রাশিয়ায় স্বৈরতান্ত্রিক-ভূমিদাসব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য, সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর স্লাভ জাতিদের ফেডারেশন গড়ার জন্য সংগ্রামে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করছেন।

বাকুনিনের ভাষ্যে সর্বস্লাভবাদ পুষ্ট হয়েছে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতে স্লাভ জনগোষ্ঠীর একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ব্রতের আশায়, এই দিক থেকে স্লাভোফিলবাদের সঙ্গে তার একটা ধারাবাহিকতা ছিল। বাকুনিনের অবদান হল এই ধারণাগুলিতে একটা বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক ও সর্বইউরোপীয় চরিত্র অর্পণ। বিপ্লবের বিজয় এবং মুক্তি সাধনার সাফল্যের আশাকে বাকুনিন সংশ্লিষ্ট করেছেন পূর্বের সঙ্গে। তিনি মনে করেছিলেন, প্যারিসে নয়, লণ্ডনে নয়, মস্কোতেই সর্বাধিক শক্তি অর্জন করবে বিপ্লব। তিনি লিখেছেন: 'মস্কোতে চূর্ণ হবে বর্তমানে রুশ রাজদণ্ডের অধীনে ঐক্যবদ্ধ দক্ষিণী এবং সমস্ত স্লাভ জনগণের দাসত্ব আর সেই সঙ্গে সমস্ত ইউরোপীয় দাসত্বও, নিজেরই আবর্জনা ও ধ্বংসস্তূপের তলে তা চিরকালের মতো সমাধিস্থ হবে; রক্তের সমুদ্র ও অগ্নিশিখা থেকে মস্কোয় উদিত হবে বিপ্লবের অপরূপ নক্ষত্রমণ্ডলী এবং সমগ্র মুক্তিপ্রাপ্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য হবে পথের দিশারী তারকা।'** ন. ইউ. কর্লাপিনস্কি ও ভ. আ. ত্ভার্দোভস্কায়া সঠিকভাবেই যা বলেছেন, বাকুনিন 'স্লাভ জনগণের মুক্তির কাজটাকে সর্বইউরোপীয় গণতান্ত্রিক কর্তব্য থেকে, প্রলেতারীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করেন, এবং তার 'পরিণাম হয় এই যে ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার পক্ষে

দক্ষিণী স্লাভদের আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব হয়'।*

ইউরোপীয় মহাদেশে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর্বে বাকুনিন ঘটনাবলির একেবারে অন্তঃস্থলে গিয়ে দাঁড়ান। প্রকৃতিগতভাবেই কর্মের মানুষ হওয়ায় ফরাসি বিপ্লবের দিনগুলিতে, বোহেমিয়া ও ড্রেসডেনে (১৮৪৯) অভ্যুত্থানের সময় সত্যকার বৈপ্লবিক উল্লাস বোধ করেন তিনি। বাকুনিনের উদ্দাম বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে আতংকের সঞ্চার হয় স্থানীয় শাসকমহলে। তাঁর সম্পর্কে কসিদিয়ের বলতেন: 'কী মানুষ! কী মানুষ! বিপ্লবের প্রথম দিনে স্রেফ একটা রত্ন, আর পরের দিন তাকে গুলি করে মারা প্রয়োজন।' মন্ত্রী ফ্লকোঁ বলতেন যে 'ফ্রান্সে যদি থাকত তিনশ' বাকুনিন, তবে তা শাসন করা অসম্ভব হয়ে পড়ত।'**

ড্রেসডেন অভ্যুত্থানের পরাজয়ের পর বাকুনিন ধৃত হন, কিছু কাল পরে তাঁকে তুলে দেওয়া হয় রুশ সরকারের হাতে, পিটার-পল দুর্গে তিনি বন্দী থাকেন। এখানে তিনি এমন একটা কাজ করেন যাতে বিপ্লবী হিশেবে তিনি ভয়ানক হেয় হয়ে যান। কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবে তিনি 'স্বীকারোক্তি' বা 'আত্মিক পিতা' প্রথম নিকোলাইয়ের কাছে বিপথগামী পুত্রের অনুশোচনা লিখতে রাজি হন। এ আচরণের মূল্যায়নে বহুবিধ মতের মধ্যে বেশি প্রত্যয়জনক হল সেইসব গবেষকদের অবস্থান যাঁরা মনে করেন 'স্বীকারোক্তি' তার লেখকের বৈপ্লবিক চেতনার প্রগাঢ় সংকটের সাক্ষ্য, বৈপ্লবিক নৈতিকতার দিক থেকে এ আচরণ অনুমোদনীয় হতে পারে না।

১৮৫৭ সালে বাকুনিনকে পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায় বসবাসের জন্য, চার বছর পরে সেখান থেকে তিনি পালাতে পারেন এবং জাপান ও আমেরিকা হয়ে ফেরেন পশ্চিম ইউরোপে। এখানে তিনি ফের প্রচণ্ড রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আক্ষরিক অর্থেই ইউরোপের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ চষে বেড়ান -- অংশ নেন পোল্যাণ্ডের ১৮৬৩ সালের অভ্যুত্থানে, ইতালিতে গঠন করেন সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবীদের গুপ্ত সংঘ, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের সময় লিয়োঁতে অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করেন। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড ও

ইংলণ্ড, রাশিয়া ও বলকান রাষ্ট্রগুলিতে, স্পেন ও ইতালিতে নিজের অনুগামীদের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করেন (অবশ্য সর্বদা সাফল্যের সঙ্গে নয়)।

সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে পালাবার পরেকার প্রথম বছরগুলিতে বাকুনিনের জীবন ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের স্মৃতিচারণে গেৎর্সেন লিখেছেন: 'প্রচার, আন্দোলন... বলতে-কি বাগাড়ম্বরের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে, ষড়যন্ত্র, আলাপ-আলোচনা, সম্পর্ক স্থাপন এবং তাতে বিপুল গুরুত্ব অর্পণের অবিরাম প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে বাকুনিনের মধ্যে আরো দেখা দিতে থাকে কর্ম সম্পাদনে প্রথম অগ্রসর হওয়ায়, মৃত্যু বরণে, অকুতোভয়ে সমস্ত পরিণাম স্বীকারে প্রস্তুতি। বীরোপম এই মানুষটি ইতিহাসে কার্যকর বলে গণ্য হয় নি। মাঝে মাঝে সে তার শক্তিক্ষয় করেছে অনর্থক, খাঁচার সিংহ যেভাবে সেখান থেকে বেরতে পারবে ভেবে অনবরত খামকা পায়চারি করে। কিন্তু নিজের উক্তি পালনে ভীত অথবা নিজের সাধারণ তত্ত্ব থেকে পলায়নপর কোনো বক্তৃতাবাজ সে নয়...।' স্লাভ মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণের পর্বে বাকুনিনের ভাবানুগামী পরিবেষ্টাদের একটা চিত্রবিচিত্র ছবি গেৎর্সেন দিয়েছেন দরদের সঙ্গে, কিন্তু বাঁকা সুরে: 'সামাজিক ভাবনা বিগর্হিত গণতন্ত্রী, তবে অফিসারি ধাঁচে; সমাজতন্ত্রী — ক্যাথলিক, নৈরাজ্যবাদী — অভিজাত আর স্রেফ সৈনিক, যারা লড়তে চায় যেখানে খুশি, উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকায়... সবচেয়ে সুবিধের হল পোল্যাণ্ডে।'*

১৮৬৪ সাল থেকে বাকুনিন ১ম আন্তর্জাতিকে বিভেদপন্থী ব্যাপক গোপন ক্রিয়াকলাপ চালাতে থাকেন, যার উদ্দেশ্য ছিল তাকে একটা পেটি-বুর্জোয়া চরিত্রের সংকীর্ণতাবাদী, টিপিকাল ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনে পরিণত করা। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব গভীরভাবে আত্মস্থ করা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ভাবাদর্শীয় নেতৃত্বের জন্য মার্কসবাদীদের সংগ্রামের স্থূল ও বাগাড়ম্বরী মূল্যায়ন করে বাকুনিন আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা ও তার স্বীকৃত ভাবাদর্শীয় নেতা মার্কসকে অযৌক্তিক আক্রমণ করেন। ১ম আন্তর্জাতিকে নৈরাজ্যবাদের ভাবাদর্শ ও কর্মধারার বিরুদ্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের সংগ্রাম শেষ হয় মার্কসবাদের পরিপূর্ণ বিজয়ে। ১৮৭২ সালের হেগ কংগ্রেসে বাকুনিন ও তাঁর অনুগামীরা আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন, এ সিদ্ধান্তের কারণ হিশেবে ভণ্ডামি, মিথ্যা কুৎসা,

কারচুপির আড়ালে তাঁদের অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপের প্রত্যয়জনক প্রমাণ দেওয়া হয়।*

নিজের গুরুত্বপূর্ণ রচনা — 'বেত্রধারী জার্মান সাম্রাজ্য ও সামাজিক বিপ্লব', 'রাষ্ট্রপাট ও নৈরাজ্য,' 'ঈশ্বর ও রাষ্ট্র' বাকুনিন লেখেন সুইজারল্যান্ডে, জীবনের শেষ বছরগুলিতে। নিজের রাজনৈতিক জীবনের নিরানন্দ পরিণতি তাঁর বহু হতাশা ও তিক্ততার কারণ হয়েছিল। তবে তিনি আত্মসমর্থনের চেষ্টা করেছিলেন এই অজুহাতে যে 'জনপুঞ্জের জাড্যই' এর জন্য সমূহ দোষী, তাঁর 'বৈপ্লবিক চিন্তা, ভরসা ও আবেগ' তা জয় করতে পারে নি।

নৈরাজ্যবাদী হিশেবে বাকুনিনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, তবে তার মূলটা ইতিহাসের অনেক গভীরে। ১৯০১ সালে 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র' নামক থিসিসগুলিতে লেনিন উল্লেখ করেন যে নৈরাজ্যবাদ তার অস্তিত্বকাল যাবৎ 'শোষণের সাধারণ বুলি ছাড়া আর কিছুই দেয় নি'। এ বুলিগুলি ২ হাজারেরও বেশি বছর ধরে চালু আছে, কিন্তু শোষণের কারণ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সৃজনী শক্তি হিশেবে শ্রেণী সংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে-যাওয়া সমাজ-বিকাশের প্রক্রিয়ার বোধ নৈরাজ্যবাদের প্রচারকদের ছিল না। লেনিন বলেন, নৈরাজ্যবাদের ভিত্তি হল 'উলটিয়ে ধরা বুর্জোয়া **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ**',** যা ক্ষমতা এবং অধিকাংশের নিকট অল্পাংশের অধীনতাকে অস্বীকার করে, ক্ষুদে মালিকানা রক্ষার পক্ষ নেয়।

অধিকাংশ গবেষক মনে করেন যে শিল্প-বিপ্লবের কালে নৈরাজ্যবাদের ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্রখ্যাত ইংরেজ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী উইলিয়ম গডুইন।*** তবে বাকুনিনের রাজনৈতিক তত্ত্ব ও নৈরাজ্যবাদী মতবাদের ওপর সবচেয়ে লক্ষণীয় প্রভাব ফেলেছেন মূলত সেইসব মনীষী, যাঁদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি মেলামেশা ছিল, অথবা বিশেষ করে যাঁদের রচনার পরিচয়

নেন তিনি, যেমন — ম. স্টির্নার, প্রুধোঁ, ভ. ভেইটলিঙ্গ। বাকুনিনের জীবন ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে প্রখ্যাত সোভিয়েত গবেষক ইউ. স্তেকলভ উল্লেখ করেছেন যে ১৮৪৮ সালের ঘটনাবলি, বিশেষ করে জুনের দিনগুলিতে প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার রক্তাক্ত সন্ত্রাস (কমিউনিস্ট ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে) নৈরাজ্যবাদী ভাবনার বিকাশে নতুন প্রেরণা জোগায়। তিনি মনে করেন ১৮৪৮ সালের প্রাবন্ধিকদের কিছু কিছু ভাবনা বাকুনিনকেও প্রভাবিত করে।*

১৮৪৫ সালে লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত হয় মাক্স স্টির্নার (কাসপার শ্মিড্‌টের ছদ্ম নাম, ১৮০৬-১৮৫৬) গ্রন্থ 'একক ও তার সম্পত্তি'। তাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থপরতার ওকালতি হিশেবে নৈরাজ্যবাদের বিস্তারিত রাজনৈতিক দর্শন পেশ করা হয়েছিল। 'কারো কাছে, কোনো কিছুর কাছে কোনো আইন, কোনো নিয়ম বা কর্তব্য নেই। কেবল স্বাধীন স্বার্থপরের স্বাধীন ইচ্ছা — ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যা সমাধানে এই সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন স্টির্নার।'** তিনি বলেছেন: 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকতে পারে কেবল রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তির স্বাধীনতার অর্থে।'*** সঙ্গতি সহকারে ঈশ্বর, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অস্বীকার করে স্টির্নার সেই সঙ্গে সর্ববিধ ব্যবহারশাস্ত্রী ও নৈতিক মানকেও বরবাদ করেছেন। স্টির্নারের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনায় মার্কস যুক্তি সহকারে উল্লেখ করেছেন যে বাস্তবতা যা বিষয়ী থেকে স্বাধীন, 'একক'এর চারণ সেভাবে তাকে দেখেন না, পক্ষান্তরে বলেন যে বাস্তবতা হল 'আমার ইচ্ছা', 'আমার ধারণা'। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্টির্নার হলেন 'ক্ষুদে, শিল্পের স্বাধীনতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, নৈতিকভাবে বিক্ষুব্ধ' কারুশিল্পীদের প্রতিনিধি। তিনি 'পেটি বুর্জোয়ার তুচ্ছতম মানসিকতায় একটা উচ্চমার্গীয় ভাবাদর্শীয় অভিব্যক্তি দেন।'****

ব্যক্তির পরম স্বাধীনতা বিষয়ে স্টির্নারের সমাজবিরোধী ভাবনায় বাকুনিনের সায় ছিল, তবে তাঁর চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যীয় ব্যাখ্যা থেকে, ব্যক্তিকে সমাজের একান্ত বিপরীতে দাঁড় করানো থেকে তিনি সরে আসেন।

বাকুনিনবাদকে বরং বলা যায় 'নৈরাজ্যবাদী যৌথবাদ', স্টির্নারপন্থা থেকে এইখানেই তাঁর বিশেষ পার্থক্য।*

পিয়ের জোসেফ প্রুধোঁর (১৮০৯-১৮৬৫) সামাজিক-রাজনৈতিক মতবাদও নৈরাজ্যবাদী ভাবাদর্শের বিকাশে একটা সীমাচিহ্ন, তারও প্রভাব পড়েছে বাকুনিনের ওপর। প্রুধোঁবাদ ছিল মার্কসবাদের অত্যন্ত প্রবল এক প্রতিপক্ষ, প্যারিস কমিউন অবধি ফরাসি প্রলেতারিয়েত ও পেটি বুর্জোয়ার ওপর তার লক্ষণীয় প্রভাব বজায় ছিল। তত্ত্বে খণ্ডিত এবং কার্যক্ষেত্রে কোণঠাসা হলেও আজও তা খানিকটা আগ্রহ সঞ্চার করে।

জন্মসূত্রে প্রুধোঁ কৃষক সম্প্রদায়ের লোক, বনিয়াদী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষালাভ তাঁর ঘটে নি; পেটি-বুর্জোয়া পরিবেশ থেকে তিনি যেসব শ্রেণীগত কুসংস্কার ও প্রাক্‌প্রত্যয় বহন করে আনেন তাতে উচিতমতো পরিপূর্ণতায় সমাজের বৈজ্ঞানিক বোধে উপনীত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। প্রুধোঁর সামাজিক মতবাদ 'শাশ্বত ন্যায়ের' রূপায়ণ স্বরূপ পারস্পরিকতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেটা স্বাভাবিক বিধির তত্ত্ব অনুসারে মানুষের প্রকৃতিগত। নৈরাজ্যবাদের ফরাসি প্রচারক লিখেছেন: 'ন্যায় হল সমাজ চালনায় কেন্দ্রীয় তারকা, সেই অক্ষ যার ওপর সমস্ত রাজনৈতিক জগৎ, সমস্ত চুক্তির নীতি ও নিয়ম ঘূর্ণ্যমান।'** প্রুধোঁ আশা করেছিলেন, পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি না বদলিয়ে, মূল্যের নিয়মে একটা 'ন্যায়পরায়ণ' রূপদান করে পুঁজিবাদকে তার খারাপ দিকগুলি থেকে পরিশুদ্ধ করা যায়।

প্রুধোঁর ক্ষেত্রে সামাজিক ইউটোপিয়াবাদ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে। মানুষের ওপর প্রভু বা সার্বভৌমের অনস্তিত্ব হিশেবে, অরাজকতায় মানুষ কর্তৃক স্বাধীনতা লাভ হিশেবে*** নৈরাজ্য মিলেছে অন্য দুটি আদর্শের সঙ্গে — ন্যায় ও সমতা। সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত, তাদের ওপর অত্যাচার, তা বিলুপ্ত করা উচিত। নৈরাজ্যে ধরে নেওয়া হয় রাষ্ট্রের উচ্ছেদ। যেখানে সবাই থাকে পারস্পরিক, চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে, ন্যায় ও সমতা বিদ্যমান, সেখানে নাগরিক ও

কমিউনদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। লোকেদের চালনার বদলে প্রয়োজন বস্তুর চালনা, সাঁ-সিমোঁর এই ভাবনাটা এই প্রসঙ্গে ধার নিয়ে মতবাদের সাধারণ জমিনে বুনে দেওয়া হয়েছে। প্রুধোঁর নৈরাজ্যবাদ তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হল এই যে ক্ষমতাহীনতার পথকে জড়িত করা হয়েছে সংগ্রাম ও বিপ্লবের সঙ্গে নয়, বরং শান্তিপূর্ণ সংস্কারপন্থী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে।*

রাষ্ট্রের শ্রেণী প্রকৃতি উদ্ঘাটনে অসমর্থ হওয়ায় প্রুধোঁ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মিথ্যা ও ভণ্ডামি ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। সাধারণভাবে রাষ্ট্রে এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূতির নীতিতে তিনি দেখেছেন 'পুঁজির সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যের' প্রধান অভিশাপ এবং কারণ।** তাঁর মতে, গণতন্ত্র হল পরারাজতন্ত্রের কেবল একটা নতুন রূপ, যা 'মাঝারিত্বের প্যাট্রিসিয়াট' (আভিজাত্য) গড়ছে এবং রাষ্ট্রপাটের ধারণাটাকে অন্তহীন প্রসারিত করছে।

বাকুনিনের চোখে প্রুধোঁর প্রতিষ্ঠা ছিল প্রভূত, তবে পরম নয়। তিনি লিখেছেন: 'বাস্তবের মাটিতে দাঁড়াবার সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও প্রুধোঁ থেকে গেছেন ভাববাদী ও আধিবিদ্যক।'*** প্রুধোঁ আর বাকুনিনের ভবিষ্যৎ সমাজের মডেল পুরোপুরি মেলে না — প্রথম জন জোর দিয়েছেন ক্ষুদে ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখার ওপর, দ্বিতীয় জন — যৌথ ব্যবস্থায় উত্তরণে। বাকুনিনের ওপর প্রুধোঁর বিশেষ প্রভাব ফেডারেলতন্ত্রের ধারণায়। তাঁদের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বহু দিক থেকে এসেছে তাঁদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাধারণ পরিস্থিতি ও পরিসর থেকে, সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কয়েকটি তাত্ত্বিক বক্তব্যের প্রতি ভিন্ন মনোভাবের জন্যও।

রাষ্ট্র, রাজনীতি ও আইন সম্পর্কে বাকুনিনের ধারণার মৌলিকত্ব তথা নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্র উদ্ঘাটন করা সম্ভব কেবল তাঁর সমস্ত রচনা, চিঠিপত্র তথা প্রচার বক্তৃতাদির বিশদ পরিচয় লাভের পর। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা সীমিত থাকব উদয়কালে এবং পরবর্তী

ব্যাখ্যায় বাকুনিনের প্রধান রাজনৈতিক ধারণাগুলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়।

বাকুনিনের মতে, রাষ্ট্র হল চূড়ান্ত সংকোচন, সর্বসাধারণের স্বার্থ বা কল্যাণের নামে প্রত্যেকের স্বাধীনতা নাকচ। যেখানে রাষ্ট্রের শুরু সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অবসান, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সেখানে রাষ্ট্রের অবসান।* সামাজিক চুক্তির পক্ষপাতীদের কথায় আপত্তি করে তিনি বলেন, স্বাধীনতা অবিভাজ্য, তার একটা অংশমাত্র কাটা গেলেও তা গোটাগুটি মারা পড়ে। কেননা, সামান্য হলেও স্বাধীনতার যে অংশটা সীমিত হচ্ছে, সেটাই হল 'স্বাধীনতার মর্মার্থ, সেটাই সবকিছু'। নিজের অবস্থান ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি তাঁর প্রিয় পদ্ধতি — আধিবিদ্যক তুলনার আশ্রয় নেন। 'স্বাভাবিক, আবশ্যক, অদম্য আকর্ষণ শক্তিতে আমার স্বাধীনতা তক্ষুনি ঠিক সেই অংশেই পুঞ্জীভূত হয়, যেটা আপনি কাটছেন, তা সেটা যত ছোটোই হোক। এটা সেই নীলশ্মশ্রু রাজার মহিষীর ব্যাপার, যার হাতে ছিল প্রাসাদের সর্বত্র প্রবেশের, সবকিছু দেখার, ছোঁয়ার পরিপূর্ণ অবাধ স্বাধীনতা, শুধু ছোট একটি কক্ষ ছাড়া যা খোলা নিষিদ্ধ ছিল তার ভয়াবহ স্বামীর সর্বশক্তিমান ইচ্ছায়, অন্যথায় মৃত্যুদণ্ড। আর প্রাসাদের সমস্ত অপরূপতা বর্জন করে তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হল ওই বিশ্রী ছোটো কক্ষটায়; সেটা সে খুললে এবং খুলে ঠিকই করেছিল, কেননা এটা তার স্বাধীনতার আবশ্যক অভিব্যক্তি; ওদিকে সেখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল এই স্বাধীনতারই সাংঘাতিক লঙ্ঘন। এটা আদম ও ইভের পতনেরও ব্যাপার: স্রেফ প্রভুর ইচ্ছে ছাড়া জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ নিষেধের অন্য কোনো কারণ ছিল না, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এটা ভয়াবহ এক স্বেচ্ছাচার, আমাদের আদিপুরুষেরা সে কথা শুনলে সমগ্র মানবজাতি অতি হীন দাসত্বে পড়ে থাকত। পক্ষান্তরে, তাদের অবাধ্যতাই আমাদের মুক্ত করেছে ও বাঁচিয়েছে। অতিকথার ধরনে বললে মানবিক স্বাধীনতার এটাই প্রথম কর্ম।'**

বাকুনিন বলেছেন, রাষ্ট্রের প্রকৃতির মূল নিহিত বাধ্যকরণে, বলাত্মক ক্রিয়ায়, প্রত্যয় উদ্রেকে নয়। রাষ্ট্র হল ক্ষমতা, 'শক্তির আত্মজাহির ও ঔদ্ধত্য'। সর্বদা হুকুম করায় যে ভালোটা তার কখনো কখনো করতে ইচ্ছা হয়, তাতে তার মূল্য হ্রাস পায়, কেননা আদেশে স্বাধীনতা মারা পড়ে। মানবিক

স্বাধীনতা, নৈতিকতা আর যোগ্যতা ঠিক এইখানে যে লোকে ভালো কাজ করে 'এইজন্য নয় যে সে আদিষ্ট, এইজন্য যে সেটায় সে সচেতন, সেটা সে করতে চায় ও করতে ভালোবাসে।'*

ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকে রাষ্ট্র একটা অভিশাপ, কিন্তু 'ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় অভিশাপ', অতীতে ততটাই প্রয়োজনীয়, যতটা আজ বা কাল প্রয়োজনীয় হবে তার পরিপূর্ণ উচ্ছেদ, যতটাই প্রয়োজনীয় ছিল আদিম পশুত্ব এবং 'লোকেদের ঈশ্বরতাত্ত্বিক শূন্যবন্ধন'। রাষ্ট্র — সমাজের একটা সাময়িক রূপ, গির্জার মতো, যার কাছে সে 'ছোটো ভাই'।

মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও শ্রেণীগত দিক লক্ষ না করে রাষ্ট্রের মর্মার্থকে কেবল বাধ্যকরণে পর্যবসিত করায় বাকুনিনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে অতি বিভিন্ন রাষ্ট্ররূপ ও রাষ্ট্রের সামাজিক ঐতিহাসিক টাইপকে কিছু একটা ঐক্যে মেলানো, যেমন, ইংকাদের রাষ্ট্র আর আধুনিক ফ্রান্স, প্রাচীন পারসিক স্বেচ্ছাতন্ত্র আর উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, প্রাচীন কালের প্রজাতন্ত্র আর 'রুশ জারের এশীয় স্বৈরতন্ত্র'।

বাকুনিনের সংজ্ঞায়, গণতন্ত্রী হল অভিজাততন্ত্রের, যেকোনো বিশেষ সুবিধার, যেকোনো একচেটিয়ার, তথা রাজনৈতিক একাধিপত্যের বিরোধী, কেননা গণতন্ত্র কথাটার অর্থ জনগণের মাধ্যমে জনগণের জন্য জনশাসন ছাড়া আর কিছু নয়।

সেই সঙ্গে, তাঁর মতে, 'গণতন্ত্র' কথাটা পর্যাপ্ত নয়, কেননা তা দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে ও হচ্ছে। 'আমেরিকায় আমরা কি এ শতকের গোড়া থেকে দেখি নি যে দক্ষিণের আবাদ মালিক, দাসমালিকদের এবং উত্তরের রাষ্ট্রগুলিতে তাদের সমস্ত অনুগামীদের গণতন্ত্রী বলা হচ্ছে? আর আধুনিক সিজারবাদ... ইউরোপে যাকে বলা হয় মানবিকতা তেমন সবকিছুর ওপর যা অমন ভয়ংকর বিপদ টেনে আনছে, তাও কি গণতান্ত্রিকতার নাম নেয় নি? এমনকি মস্কো ও সেন্ট-পিটার্সবুর্গের সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষণের অপেক্ষা না রাখা এই রাষ্ট্রটা, সমস্ত কেন্দ্রীভূত সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক শক্তির এই আদর্শটা কি সম্প্রতি গণতন্ত্রের নামেই পোল্যান্ড দমন করে নি?' এ থেকে বাকুনিন সিদ্ধান্ত টেনেছেন: 'স্পষ্টতই স্বাধীনতা বিনা গণতন্ত্র আমাদের পতাকা হতে পারে না, কিন্তু

স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে গণতন্ত্র তা প্রজাতন্ত্র ছাড়া আর কি?'*

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রবণতা ও দানা বেঁধে ওঠা রাজনৈতিক রূপগুলি নিরীক্ষণ করে বাকুনিন যুক্তি সহকারেই প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি নিয়ে অন্ধ ভক্তির বিরুদ্ধে সাবধান করে দিয়েছেন, কিন্তু গিয়ে পড়েছেন অন্য একটা চূড়ান্তপনায় — স্বায়ত্তশাসন ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূতির মধ্যে তীব্র ও আপোসহীন বৈপরীত্যে, শেষেরটার মধ্যে দেখেছেন মহান ফরাসি বিপ্লবের পরাজয়ের প্রায় একমাত্র কারণ। তিনি বলেছেন 'নিছক নেতিবাচক মূল্য' ছাড়া প্রজাতন্ত্রের অন্য কোনো মূল্য নেই — তা সূচিত করে রাজতন্ত্রের ধ্বংস, উচ্ছেদ। বৃহৎ, রণসজ্জিত, আমলাতান্ত্রিক, রাজনৈতিক দিক থেকে কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্রকে নাকি অবশ্য-অবশ্যই হতে হবে বিদেশী রাজনীতিতে আগ্রাসক, অভ্যন্তরে — দমনমূলক, অন্যথায় তা নিজের প্রজাদের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে নাকি অক্ষম।** এ প্রশ্নে বাকুনিন স্পষ্টতই দেখেন নি বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের রাজতান্ত্রিক অধঃপতনের প্রধান অপরাধীদের — বুর্জোয়া ও তার রাজনৈতিক সহযোগীদের, যারা শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পক্ষে দাঁড়ায়।

বাকুনিন মনে করেছেন যে, সমস্ত নাগরিকের স্বাধীন ভোটের ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও হতে পারে তাদের স্বাধীনতার নাকচ। সেটা প্রতিপাদনের জন্য যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা খুবই মনে করিয়ে দেবে তকভিল ও জ. স. মিলের মতো বুর্জোয়া উদারনীতিকদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক সাম্য নীতির সমালোচনা। বাকুনিনের ধারণা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে পারে খুবই স্বেচ্ছাচারী, এমনকি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেয়েও বেশি স্বেচ্ছাচারী, যখন তা 'সাধারণ ইচ্ছার' আড়াল নিয়ে 'নিজের যৌথ প্রতাপের সমস্ত চাপ দিয়ে' নিজের প্রত্যেকটি সদস্যের ইচ্ছা ও স্বাধীন আন্দোলন দমন করতে শুরু করে। স্বাধীনতা কখনো ক্ষমতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে থাকে না, তাই, বাকুনিনের মতে, ক্ষমতাপন্ন সবকিছুকে, বাধ্যকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সবকিছুকে বিনাশর্তে অগ্রাহ্য করতে হবে। সমস্ত রাষ্ট্রই তার অস্তিত্বের পরিস্থিতি ও লক্ষ্যের দিক থেকে মানবিক ন্যায়, স্বাধীনতা ও নৈতিকতার একেবারে বিপরীত প্রান্তে। আর এ ব্যাপারে অর্ধবর্বর নিখিল রুশ সাম্রাজ্য

আর ইউরোপের সবচেয়ে সুসভ্য রাষ্ট্রের মধ্যে বড়োরকমের কোনো তফাৎ নেই।

এই হল সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা, সমস্ত সরকারের নির্বন্ধ, যা অনিবার্যই জনগণকে অধীনস্থ করার জন্য চেষ্টিত। 'দশ বার করে নিজেকে লোকায়ত বললেও এবং অতিগণতান্ত্রিক রূপে অলংকৃত হলেও' জনগণের কাছে, মেহনতিদের কাছে প্রতিটি রাষ্ট্র সর্বদাই হবে কারাগার। এ কথা মনে রাখা উচিত যে রাষ্ট্রপাট নাকচের বাকুনিনী প্রেরণা বহু দিক থেকে পুষ্টিলাভ করেছে তাঁর সমকালীন বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে সত্যই যে বিরোধ ও বৈর ছিল তা থেকে। উনি যে সমসাময়িক সমাজের বৈর দেখেছিলেন বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বিরোধে, সেটা মার্কসীয় তত্ত্বের বিনা প্রভাবে নয়, যদিও এই বৈর পরিষ্কার করে নেবার জন্য যথোচিত সঙ্গতিপরায়ণতা দেখান নি, সেটাকে তিনি প্রধানত নিষ্কাশিত করেছেন রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্র থেকে। এ বৈরের অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত, সর্বাগ্রে উৎপাদনের উপায়ের ওপর পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা এবং সে প্রসঙ্গে শ্রেণী সংগ্রাম বাকুনিনের মতবাদে কিছু পরিমাণ সুস্পষ্ট রেখায় ফোটে নি, যদিও শ্রেণীভেদ যথেষ্ট বিকশিত রূপে দেখা যাচ্ছিল।

'নাগরিক আর দাস — এ বৈর বিদ্যমান প্রাচীন জগতে ও নতুন ধরনের দাসমালিক রাষ্ট্রে। নাগরিক আর দাস, অর্থাৎ কাজ করতে বাধ্য কর্মীরা, আইনে না হলেও কার্যক্ষেত্রে দাস — এই হল আধুনিক দুনিয়ার বৈর। এবং প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি যেমন ধ্বংস পেয়েছে দাসপ্রথার জন্য, বর্তমান রাষ্ট্রগুলিও ধ্বংস পাবে প্রলেতারিয়েতের জন্য।' বর্তমান সমাজে অন্তর্বর্তী যে ধাপগুলি একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা থেকে অন্যটায় উত্তরণকে অস্পষ্ট করে তোলে, তা সত্ত্বেও শ্রেণী পার্থক্য অতি সুনির্দিষ্ট: বাকুনিন বংশগত আভিজাত্য থেকে আর্থিক আভিজাত্য, পেটি বুর্জোয়া থেকে বড়ো বুর্জোয়া এবং কলকারখানা ও শহরের প্রলেতারিয়েত থেকে পেটি বুর্জোয়ার পার্থক্য করেছেন। শেষত, নিজের হাতে জমি চাষ করা কৃষক-মালিক থেকে বৃহৎ ভূস্বামীদের এবং সাধারণ গ্রামীণ প্রলেতারিয়ান থেকে তাদের সবাইকে একসঙ্গে পৃথক বলে দেখিয়েছেন। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্যগুলিকে তিনি সরাসরি বিপরীত দুই বর্গে জড়ো করেছেন: 'রাজনৈতিক শ্রেণীগুলি' (যা গড়ে উঠেছে ভূমিস্বত্ব, পুঁজি অথবা কেবল বুর্জোয়া শিক্ষার দিক থেকে সুবিধাভোগী লোকেদের নিয়ে) এবং 'শ্রমিক শ্রেণীগুলি' (যেমন পুঁজি তেমনি জমির ভাগে প্রতারিত এবং সর্বপ্রকার

শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত)। 'এ দুই শ্রেণী যে অতল গহ্বর দ্বারা বিচ্ছিন্ন, তা অস্বীকার করতে হলে হয় কুতার্কিক নয় অন্ধ হতে হয়।'*

রাষ্ট্রের বিদ্যমান তত্ত্বগুলির প্রতি সমালোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাকুনিন এই ঘটনায় মনোনিবেশ করেছেন যে ওগুলি সবই (স্বভাবতই নৈরাজ্যের মতবাদ ছাড়া) আসছে **সর্বোচ্চ ক্ষমতার** নীতি থেকে, যা, তাঁর মতে, আসতে পারে কেবল এই 'ঈশ্বরতাত্ত্বিক, আধিবিদ্যক ও রাজনৈতিক ধারণা' থেকে যে জনগণ স্বশাসনে অক্ষম। 'যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা তৎরূপেই জনগণের কাছে স্বীকৃত ও শ্রদ্ধেয়, তার উৎস হতে পারে কেবল তিনটি: শক্তি, ধর্ম আর সর্বোচ্চ বিচারবুদ্ধির ক্রিয়াকলাপ।'**

কোনো এক ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কল্যাণে ঐশ্বরিক আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে, বাকুনিনের মতে, ক্ষমতা থাকতে হবে, প্রথমত সাধুসন্তদের হাতে, দ্বিতীয়ত সাধুসন্তদের আশিসপ্রাপ্ত ঐহিক ক্ষমতাধরদের কাছে। কিন্তু সামাজিক চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ক্ষমতা থাকা উচিত কার হাতে? এ তত্ত্বে (যেমন আগেরটিতে) ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রয়োজনীয় নীতি অনুসরণ ও আইনকানুন পালনের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের ওপরে দণ্ডায়মান সতর্ক, পরিচালক এবং প্রয়োজন হলে দণ্ডদাতা একটা ক্ষমতা। বাকুনিন প্রশ্ন করেছেন, কাকে হতে হবে আইনের প্রহরী ও নির্বাহক, প্রত্যেকের কু চিন্তাবেগের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সামাজিক শৃঙ্খলার রক্ষক? কেননা স্বীকার করা হয়েছে যে এক-একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য যে পরিমাণে প্রয়োজন সে পরিমাণে চালাতে ও নিজেকে সংযত রাখতে অক্ষম, কারণ, তাঁর মতে, প্রত্যেকের স্বাধীনতার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে খারাপের দিকে।

এ কাজটা নাকি চালাবে নাগরিকদের ভেতর যারা সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সদাচারী, যারা অন্যদের চেয়ে ভালো বোঝে সমাজের সাধারণ স্বার্থ এবং প্রত্যেকের নিজ স্বার্থকে তার অধীন করার আবশ্যকতা— এমন জবাবে বাকুনিন তুষ্ট নন। সেরূপ ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস হতে না হলে তাকে সর্ব কালে পেতে হবে নির্দিষ্ট সংখ্যক তেমন সদাচারী আর সেই সঙ্গে বুদ্ধিমান লোক, কারণ তারা যদি হয় সদাচার ছাড়া কেবল বুদ্ধিমান তাহলে সামাজিক কাজকে তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে লাগাতে

পারবে, আর তারা যদি হয় সদাচারী, কিন্তু বুদ্ধিমান না হয়, তাহলে তাদের সুবিবেক থাকা সত্ত্বেও অনিবার্যই সামাজিক কাজকে পণ্ড করবে।*

রাষ্ট্র উদ্ভবের 'চুক্তি তত্ত্বের' এই আদর্শ চিত্র খণ্ডনের জন্য বাকুনিন নিম্নোক্ত যুক্তি দিয়েছেন। প্রথমত, শাসক মহলে সাধারণত প্রাধান্য করে বুদ্ধিমান ও সদাচারীরা নয়, মাঝারিরা, সেখানে 'ধূসর রঙের প্রাধান্য' আর তার স্থান প্রায়ই নেয় কালো আর লাল রঙ, অর্থাৎ 'বিজয়ী বেনিয়া দল আর রক্ত ঝরা বলপ্রয়োগ'। সুযৌক্তিক (বা 'স্বাধীন') রাষ্ট্রের তত্ত্ব যদি এই বক্তব্যে সঠিক হত যে সর্ববিধ রাজনৈতিক সমাজের সংরক্ষণ ও অস্তিত্ব নির্ভর করে 'যেমন বুদ্ধি তেমনি সদাচারে অসাধারণ সব লোকেদের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার' ওপর, তাহলে বর্তমানে বিদ্যমান সমাজগুলির মধ্যে একটাও নেই, যাকে, বাকুনিনের মতে, অনেক আগেই ধ্বংস পেতে হত না।

আর ক্ষমতা হাতে থাকলে লোকের ওপর যে 'বিশেষ ধরনের ব্যভিচারী প্রভাব' পড়ে, দ্বিতীয় আপত্তিটা তা থেকে উদিত দুরূহতার সঙ্গে জড়িত। 'ক্ষমতায় ভূষিত সমস্ত লোকেই অনিবার্যই যে অসাধারণ প্রলোভনে পড়ে, ঠিক অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদেরই যে আত্মশ্লাঘা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা, অসম্ভব লোলুপতা দিন রাত ঘিরে থাকে, আর বুদ্ধি, এমনকি সদাচারও যা থেকে বাঁচায় না, কেননা স্বতন্ত্র ব্যক্তির সদাচার ভেঙে পড়তে পারে. তার কথা যদি মনে রাখি, তাহলে — নিজের ভাবনাকে শাণিত করেছেন বাকুনিন — আমাদের এ কথা বলার পূর্ণ অধিকার আছে যে সমস্ত সমাজ টিকে থাকছে কেবল অলৌকিকের কল্যাণে।'**

যে 'স্বাধীন রাষ্ট্রের' যাত্রাবিন্দু সামাজিক চুক্তি তার 'অলীক কাহিনী' বাঁচিয়ে রাখতে হলে ধরে নিতে হয় যে, বাকুনিন বলছেন, সবচেয়ে যোগ্য ও সক্ষম লোকেদের হাতে সর্বোচ্চ শাসন অর্পণ করার মতো সর্বদা প্রয়োজনীয় সুবুদ্ধি, ন্যায়বোধ আর তীক্ষ্ন দৃষ্টি আছে অধিকাংশ নাগরিকের। কিন্তু তাঁর আপত্তি এই যে জনগণকে শুধু অকস্মাৎ নয়, সর্বদা, তাদের সমস্ত নির্বাচনে, তাদের সমগ্র অস্তিত্ব কালে এই তীক্ষ্ন দৃষ্টি, এই ন্যায়বোধ ও সুবুদ্ধি প্রকাশ করতে হলে প্রয়োজন জনগণ সমগ্রভাবে নিজেরাই যেন 'নৈতিক বিকাশ ও সংস্কৃতির সেই পর্যায়ে পেৌঁছে যায়, যখন

সরকার আর 'রাষ্ট্র' একেবারে নিষ্প্রয়োজন'। এরূপ জনগণ নিজেদের আকর্ষণকে পুরো স্বাধীনতা দিয়ে দিন কাটাতে শুরু করবে। ন্যায় এবং সামাজিক প্রগতি এক্ষেত্রে আপনা হতেই দেখা দেবে জনজীবনের মধ্য থেকেই এবং 'রাষ্ট্র বিধাতা, সমাজের অভিভাবক, পালক ও চালক হওয়া থেকে বিরত হয়ে, সর্ববিধ শাস্তিদায়ক ক্ষমতা বর্জন করে খসে পড়বে পূর্বো নির্দেশিত অধীনতার ভূমিকায়, পরিণত হবে আর কিছু নয়, ঠিক একটা সাধারণ কারবারী ব্যুরোতে, এক ধরনের হিসাব দপ্তরে, যার কাজ সমাজের সেবা।'*

এই ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন, অথবা বাকুনিন যা নির্দিষ্ট করে বলেছেন, এই ধরনের 'সামাজিক জীবনের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক শক্তির দুর্বলীকরণ' হবে সমাজের একটা মহা উপকার, কিন্তু কোনোক্রমেই তা 'রাষ্ট্রের অনুরাগীদের' (বাকুনিন ভুল করে সমাজতন্ত্রীদেরও তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন) তুষ্ট করবে না। 'নৈরাজ্যবাদের নবী' লিখেছেন: 'নিজেদের তারা প্রজাতন্ত্রী, গণতন্ত্রী, এমনকি সমাজতন্ত্রীও বলুক, সর্বদাই তাদের প্রয়োজন শাসিত জনগণ যেন থাকে ন্যূনাধিক অজ্ঞ, নগণ্য, অপদার্থ, অথবা সঠিক করে বলতে হলে জনগণ যেন থেকে যায় কমবেশি **বদমাশ**।'** এইভাবে বিতর্ক ও অতিবৈপ্লবিকতার উত্তেজনায় বাকুনিন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের হীন কুৎসাতেও ক্ষান্ত হন নি।

নেতাদের, রাজনৈতিক পরিচালকদের নির্বাচন করার সাধারণ ঘটনাটা থেকে বাকুনিন তাঁর প্রকৃতিগত নির্দ্বিধায় এমনসব সুদূরপ্রসারী 'বৈজ্ঞানিক' সিদ্ধান্ত টেনেছেন যা প্রাথমিক সূত্র থেকে আদৌ আসে না। যেমন, এই ধরনের যুক্তির একটি দৃষ্টান্ত, যা তার ভাসা-ভাসা ও কষ্টকল্পিত উপস্থাপনে বাকুনিন ও তাঁর নৈরাজ্যবাদী মন্ত্রবাণীকে মোটেই সেরা বলে তুলে ধরবে না: 'স্বশাসনে নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করে জনপুঞ্জ আমায় নেতা নির্বাচন করল। এতে করে তারা খোলাখুলি স্বীকার করল আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজেদের আপেক্ষিক নগণ্যতা। এই গোটা যে ভিড়টার মধ্যে কেবল দুই তিন জন লোক আছে যাদের আমি নিজের সমান বলে মানতে পারি, সেখানে একা আমি সামাজিক ব্যাপার চালাতে সক্ষম। আমার প্রয়োজন আছে জনগণের কাছে, আমার কাজ ছাড়া তাদের চলে না, ওদিকে আমি নিজেরটা চালিয়ে নিতে পারি। তাই, নিজের মঙ্গলের জন্য জনগণকে আমার

বাধ্য হতে হবে আর কৃপা করে তাদের চালাতে রাজি হয়ে আমি সুখ গড়ে দিচ্ছি। ...এইভাবেই ক্ষমতা এবং আদেশ করার অভ্যাস এমনকি সবচেয়ে আলোকপ্রাপ্ত ও সদাচারী লোকের পক্ষেও হয়ে ওঠে বুদ্ধিমার্গীয় ও নৈতিক ভ্রষ্টতার উৎস।'*

যেকোনো ক্ষমতা, বিশেষ করে একনায়কত্ব মানুষকে নষ্ট করে, গত শতকের ৭০-এর দশকের বহু বিপ্লবীরই এ থিসিসে সায় ছিল। এ থিসিসের দৃঢ় বিরোধিতা করেন প. ন. ত্কাচেভ (১৮৪৪-১৮৮৫)। ইতিহাসের নজির দিয়ে তিনি দেখান যে রবেসপিয়ার, দাঁতন, ক্রমওয়েল ও ওয়াশিংটন ক্ষমতার বোঝায় বদলে যান নি, তাঁদের নৈতিক আদর্শ ও প্রয়াস, এমনকি ঘরোয়া অভ্যাসও একই থেকে গিয়েছিল। ত্কাচেভ জিজ্ঞেস করেছেন: 'অবশেষে সম্রাটের রক্তিম ভূষণ কি ব্যভিচারী করল নেপোলিয়ন আর সিজারদের? আগে, যখন তাঁরা সৎ লোক ছিলেন, তখন কি তাঁরা কিছু একটা নৈতিক শৌর্য দেখিয়েছেন, কিছু একটা সমুন্নত ভাবনা, কিছু একটা মহৎ প্রয়াসে বিশিষ্ট হয়েছিলেন?'**

রাষ্ট্র ও ক্ষমতা হল অভিশাপ, তা প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হতে পারে কেবল অপরাধের মাধ্যমে — এই হল বাকুনিনের রাজনৈতিক ভাবধারার প্রধান নীতি। এ নীতি প্রতিপাদনের জন্য তিনি আবেদন করেন ম্যাকিয়াভেলির প্রতিষ্ঠার কাছে, তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার কাছেও। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তিনি এক-একটা ভাবনা ও ঘটনাকে যথেষ্ট উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটা ঘটছে তার কারণ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সমালোচনায় বাকুনিন তাঁর মূলত পেটি-বুর্জোয়া অবস্থান ত্যাগ করেন নি, যা অন্যায় ও দাসত্বাশ্রয়ী রাজনৈতিক বাস্তবতার স্রেফ নাকচেই পর্যবসিত, ঘোলাটেভাবে, উপযুক্ত তাত্ত্বিক প্রতিপাদন ছাড়াই তিনি চেষ্টা করেছেন রাষ্ট্রহীন অবস্থায় সমাজের কল্পনা করতে।

একই অবস্থান থেকে বাকুনিন এই থিসিস প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে শোষণ করা আর শাসন করার অর্থ একই। 'যাকে বলা হয় রাজনীতি, শোষণ আর শাসন হল তার পরস্পর থেকে অবিচ্ছেদ্য দুই অভিব্যক্তি, এক্ষেত্রে

প্রথমটি জোগায় শাসনের উপায় এবং তার প্রয়োজনীয় ভিত্তি তথা সর্ববিধ শাসনে উদ্দেশ্য এনে দেয়, শাসন আবার তার দিক থেকে শোষণের সুযোগ গ্যারান্টিকৃত ও বৈধ করে।' এই উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে 'বেত্রধারী জার্মান সাম্রাজ্য ও সামাজিক বিপ্লব' বই থেকে,* যাতে আছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব এবং রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কসবাদী মতবাদের সঙ্গে সরাসরি বিতর্ক।

মার্কসবাদ এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের প্রতি বাকুনিনের মনোভাব ছিল স্ববিরোধে ভরা। যেমন, উপরি-কাঠামোর ব্যাপারগুলির ওপর সমাজজীবনের বৈষয়িক পরিস্থিতির নির্ধারক প্রভাব বিষয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সুবিদিত বক্তব্যটি তিনি নেন ইতিবাচক মনোভাবে। তিনি লিখেছেন: 'কমিউনিস্টরা... বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ পুরোপুরি মেনে দাবি করে যে ঘটনা থেকে ভাবের জন্ম এবং ভাব সর্বদাই হল অর্থনৈতিক ঘটনার কেবল আদর্শায়িত প্রতিফলন, এইসব ঘটনার সাধারণ সমষ্টির মধ্যে অর্থনৈতিক ঘটনা হল সত্যকার বনিয়াদ। অন্য সমস্ত ঘটনা — বুদ্ধিমার্গীয় ও নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক — তা থেকে কেবল অবশ্য প্রয়োজনে নিঃসৃত।'**

কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌল প্রতিপাদনে এমনকি আংশিক সম্মতি থাকলেও বাকুনিন তার সঙ্গে এতগুলি কুণ্ঠা যোগ করেছেন যে সে সম্মতি নাকচ হয়ে যায়। যেমন, মার্কসীয় মতবাদের অদ্বৈতবাদের (monism) বিরোধিতা করে তিনি সমাজ বিকাশের করণিকাগুলির নানাত্ববাদী (pluralistic) উপলব্ধিতে জোর দেন। মার্কসবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি স্থূল বুর্জোয়া সমালোচকদের ধারায় তার বিকৃতি ঘটান। 'মার্কস বলছেন, সর্ববিধ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সর্বদাই তার অর্থনৈতিক অবস্থার ফল ও সঠিক অভিব্যক্তি: প্রথমটাকে বদলাতে হলে শুধু শেষেরটাকে বদলানো দরকার। মার্কসের মতে, এর মধ্যেই ঐতিহাসিক বিবর্তনের সমস্ত রহস্য নিহিত। ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান, যেমন, অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর রাজনৈতিক, আইনী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মৌলিক প্রভাব তিনি মোটেই হিসেবে রাখেন না।'*** বনিয়াদের ওপর উপরি-কাঠামোর পাল্টা প্রভাব যে মার্কসবাদ স্বীকার করে বাকুনিন এখানে স্পষ্টতই সেই ব্যাপারটা

উপেক্ষা করেন। বাকুনিনের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ যোগফল এই সাক্ষ্য দেয় যে তিনি ইতিহাসের ভাববাদী বোধের গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি, গ. ভ. প্লেখানভের মোক্ষম মন্তব্য অনুসারে, বস্তুবাদী মতবাদের সাহায্যে তিনি কেবল 'কুতার্কিক বনেছেন'। ই. ব. জিলবেরমান যা বলেছেন, ইতিহাসকে বাকুনিন বুঝেছেন স্বাধীনতার দিকে মানবজাতির অপরিবর্তনীয় জয়যাত্রা বলে, কিন্তু তাঁর কাছে ইতিহাসের এই কল্পনাতীত গতি সাধিত হচ্ছে তার অবজেকটিভ নিয়মবদ্ধতা ছাড়াই।*

রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণ নেতিবাচক মনোভাব বাকুনিন প্রসারিত করেছেন আইনেও। বাকুনিন বলেছেন, সমস্ত আইনই বাইরে থেকে চাপানো, তাই তা স্বৈরাচারী নির্দেশ। রাজনৈতিক আইনপ্রণয়ন স্বাধীনতার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং স্বাভাবিক বিধির বিরোধী। আইন-প্রতিষ্ঠান ও তার ক্রিয়াকলাপ গোষ্ঠীতন্ত্রের উদ্ভবে সহায়তা করে। রাজনৈতিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র — এ দুটি বোধ পরস্পরকে খন্ডন করে। বাকুনিন ঘোষণা করেছেন: 'মোট কথা, আমরা বিশেষ সুবিধামূলক, ফরমানি, সরকারি এবং ব্যবহারশাস্ত্রীয় — সমস্ত আইনপ্রণয়নকেই অস্বীকার করি, অস্বীকার করি সর্ববিধ কর্তৃত্ব ও প্রভাবকে, তা সেগুলি সর্বজনীন ভোটের আশীর্বাদ পেলেও, কেননা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এ সবকিছুই করা হয় প্রভুত্বকারী অল্পসংখ্যক শোষকদের উপকারার্থে এবং বিপুল অধিকাংশের স্বার্থের বিরুদ্ধে, যারা অধীনস্থ ঠিক এই অর্থেই আমরা নৈরাজ্যবাদী।'**

রাজনীতির ভাষায় আইনের অর্থ বলপ্রয়োগে সংঘটিত ব্যাপারের পবিত্রকরণ মাত্র, তাই আইনের মর্মার্থ হল সর্বাগ্রে 'চাপিয়ে দেওয়া শক্তির আধিপত্য' ও বিজয়।*** তাঁর সমকালীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সরকারি রাজনৈতিক আইনের বিপরীতে কী দাঁড় করাচ্ছেন বাকুনিন? এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থান ছিল ঝাপসা আর অপরিচ্ছন্ন। তিনি লড়েছেন সর্বাগ্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যেকোনো সংকোচনের বিরুদ্ধে এবং তাকে বলেছেন যুক্তিবাদী, স্বাভাবিক অথবা স্রেফ মানবিক বিধি। 'ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক অথবা ব্যবহার-শাস্ত্রীয় আইন আর যৌক্তিক বা স্রেফ মানবিক বিধির মধ্যে পরিষ্কার

পার্থক্য টানা আবশ্যক। প্রথমটা আজ অবধি দুনিয়াকে চালাচ্ছে, তাকে বাধ্য করছে রক্তঝরানো অন্যায় আর পীড়ন মেনে নিতে। আর দ্বিতীয় বিধিটা হবে আমাদের মুক্তির হাতিয়ার।'*

শোষক সমাজে আইনপ্রবর্তনের নৈরাজ্যবাদী সমালোচনায় ঠিকই দেখানো হয়েছে যে তা নির্ভর করে বাধ্যকরণ শক্তির ওপর, ধর্মের আশীর্বাদে তা পূত, তাছাড়া ভাড়াটে প্রাবন্ধিকদের পক্ষ থেকে এক ধরনের সমর্থনও তা লাভ করে। সেই সঙ্গে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও আইন প্রসঙ্গে নিজেদের অস্বীকৃতিটা নৈরাজ্যবাদ প্রসারিত করে ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও আইনের ক্ষেত্রেও, যার রূপরেখা সূত হয়েছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বে। নৈরাজ্যবাদী প্রেরণায় সমাজ পুনর্গঠনের খানিকটা সুসংবদ্ধ ও অখণ্ড কোনো কর্মসূচি না থাকার ফল হয়েছে এই যে এক-একটা রাজনৈতিক বক্তব্য বা আন্দোলনের বাস্তব রাজনৈতিক-আইনী দাবির সঙ্গে সংঘাতে নৈরাজ্যবাদ মুক্তি, সমতা আর ভ্রাতৃত্বের সাধারণ বুলি ছাড়া অন্য কিছুই পেশ করতে পারে নি। যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইউরোপে ১৮৪৮ সালের জাতীয় মুক্তি সাধক বুর্জোয়াধর্মী অভিযানের জোয়ার, তেমনি পোল্যান্ডে ১৮৬৩ সালের অভ্যুত্থানের সময় তীব্র হয়ে উঠেছিল জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার বলতে কী বোঝায় সেই প্রশ্ন। এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিতে নিজের ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপে বাকুনিনের অবদান সুবিদিত। সেই সঙ্গে খুবই চোখে ঠেকে প্রতিটি জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকারকে 'তাদের নিজস্ব সহজপ্রবৃত্তি, চাহিদা ও ইচ্ছা অনুসারে' আত্মনির্ধারণ হিশেবে তাঁর ব্যাখ্যার তাত্ত্বিক অসঙ্গতি। সেই পরিস্থিতিতে আত্মনির্ধারণের ব্যাখ্যায় জাতীয় মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ওপর জোর দেওয়ার** অর্থ ছিল জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ বুর্জোয়া রাজনৈতিক ভাবা-দর্শের মন্দ দিকগুলি গ্রহণ করা, কার্যক্ষেত্রে যা পেঁছয় সে ভাবাদর্শে এবং জনগণের সাধারণ আন্দোলনে গণতান্ত্রিক ও বুর্জোয়াসুলভ সীমাবদ্ধ উপাদানের মিশ্রণ।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রে স্বাধীনতা হল সীমাবদ্ধ, বাহ্যিক, একেবারে মাপাজোখা, রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এ স্বাধীনতা আর কিছু নয়, শুধু 'সর্বদা নির্লজ্জ মিহ্যা, সর্বজনীন দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত কেবল সংখ্যাল্পের বিশেষ সুবিধা'

('প্যারিস কমিউন ও রাষ্ট্রপাটের বোধ' গ্রন্থে)। সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতার সম্পর্ককে বাকুনিন প্রকাশ করেছেন এই সূত্রে: 'সমাজতন্ত্র বিনা স্বাধীনতা হল বিশেষ সুবিধা, অন্যায্যতা; আর স্বাধীনতা বিনা সমাজতন্ত্র হল দাসত্ব, পাশবিকতা।'*

পোলীয় গবেষক হান্না তেমকিনোভা ঠিকই বলেছেন যে তাঁর স্ববিরোধী ভাবাদর্শীয় বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে বাকুনিনের স্বাধীনতা-বোধ একই অর্থ ধরে না। 'পরম স্বাধীনতাকে' বাকুনিন তাঁর তরুণ বয়সে ব্যাখ্যা করেছেন রোমান্তিকতা, এমনকি 'গোষ্ঠীর' নিকট ব্যক্তির অধীনতার অর্থেই। পরে নৈতির ভাবনায় মেতে উঠে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন ব্যক্তি প্রসঙ্গে 'বাইরের' (ব্যক্তি-ঊর্ধ্ব) সর্ববিধ মূলনীতি—ঈশ্বর, রাষ্ট্র, স্বদেশ, ইতিহাসের নিয়মগুলি, সাধারণভাবে লোকেদের মধ্যে সর্ববিধ আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক, ফলে তাঁর স্বাধীনতা পরিণত হয়েছে একটা বদ্ধমূল ধারণায়, ইউটোপিয়ায়। ক্ষমতা ও রাষ্ট্র, ঈশ্বর ও ধর্ম, ইতিহাসের নিয়ম সম্পর্কে বোধে, খোদ রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাকুনিন দেখেছেন একটা বিমূর্ত পরাক্রান্ত শক্তিকে, যা ব্যক্তিজীবনের ওপর আধিপত্য করছে, হরণ করছে তার স্বাধীনতা, এমনকি, যাতে তিনি জেরা দিয়েছেন, তার মানবিক মর্যাদাও। এ সমস্যার কোনো সদর্থক সমাধান তিনি অবশ্য দেন নি, দিতে পারতেনও না, কিন্তু তেমকিনোভা যা বলেছেন, 'এক্ষেত্রে তাঁর নাটকীয় ও অক্লান্ত অন্বেষণে স্বাধীনতা সমস্যার অন্তর্নিহিত কতকগুলি দিক ও বাস্তব বিরোধাত্মক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।'**

ধর্মীয় চেতনার যে সমালোচনা বাকুনিন করেছেন তা বস্তুবাদী দৃষ্টি প্রতিষ্ঠায় একটা উল্লেখযোগ্য অবদান। ১৯০৬ সালে রুশ ভাষায় প্রকাশিত তাঁর 'ঈশ্বর ও রাষ্ট্র' নামক চমৎকার গ্রন্থটিকে প্রচণ্ড আক্রমণ সইতে হয় জার রাশিয়ার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মহলের পক্ষ থেকে।

ধর্মের সমালোচনায় বাকুনিন নির্ভর করেছিলেন ১৮ শতকের জ্ঞানপ্রচারকদের অতি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ওপর। তাঁর মৌলিকতা হল এ সমালোচনার টিপিক্যাল যুক্তিগুলি সহ ধর্ম ছাড়াও তাকে তিনি প্রয়োগ করেছেন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, তথা 'বিজ্ঞান-রাজের' ধারণা আর 'বিজ্ঞান দেবীর' পূজার প্রসঙ্গেও। 'যেখানে ঈশ্বর, সেখানে রাষ্ট্র' — এই সূত্রটিতে রাষ্ট্র ও

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্পত্তিবানদের ক্ষমতাকে ধর্ম কর্তৃক পবিত্রকরণ বিষয়ে তাঁর সমগ্র সমালোচনা গ্রথিত; রাষ্ট্রজীবনের ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও পূজাচার গোছের কতকগুলি গুণ টেনে আনা হয়, তথাকথিত 'রাষ্ট্রীয় ঔচিত্য', 'রাষ্ট্রীয় বিবেচনাকে' (raison d'etat) এক ধরনের রাজনৈতিক পূজাবেদীতে পরিণত করা হয় যেখানে অতি রক্তমাখা নরবলি সমেত যেকোনো নৈবেদ্য দিতে হবে — এই থিসিসে আছে স্বরূপমোচনের চরিত্র।*

বুর্জোয়া বিজ্ঞান ও তার পুরোহিতদের ওপর বাকুনিনের আক্রমণ অনেক দিক থেকে সঠিক, কিন্তু সে আক্রমণে শ্রমিক বুদ্ধিজীবীদের ওপর অবিশ্বাসও প্রকাশ পেয়েছে প্রায়ই, যাদের তিনি মাঝে মাঝে 'শ্রমিক আভিজাত্য' বলে অন্যায় করেছেন, যাদের নাকি টুকরো-টাকরা ভাসা-ভাসা জ্ঞান আঁকড়ে ধরে বুলি কপচানির ঝোঁক পেয়ে বসে এবং বদ্ধপরিকর ক্রিয়ায় তারা অক্ষম হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, নিজেদের মননশক্তির কারণে গতর-খাটা ও অল্পশিক্ষিত শ্রমিক জনগণের মধ্য থেকে তারা আলাদা হয়ে পড়ে, এ জনগণকে শ্রমিক বুদ্ধিজীবীরা দেখতে শুরু করে যেন ওপর থেকে নিচের দিকে এবং বিনা অবজ্ঞায় নয়। রাশিয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নটা দেখা হয়েছে খানিকটা অন্যরকম করে -- বাকুনিন ও তাঁর সমভাবীদের মতে, জনগণ ভালোই জানে কী তাদের দরকার, তাই জনগণকে 'শেখানো নয়, বিদ্রোহে প্ররোচিত করা' প্রয়োজন। 'নৈরাজ্যবাদী-সামাজিক উচ্ছেদের নামে' অভ্যুত্থানের জন্য জনগণ কেবল 'যৌথ স্তেপান রাজিনের' (১৭ শতকে রুশ কৃষক অভ্যুত্থানের নায়ক — অনুঃ) অপেক্ষায় আছে।**

রাষ্ট্র এবং 'সাধারণভাবেই ক্ষমতার' প্রতি বাকুনিনের নেতিবাচক মনোভাব, ইতিহাসের চালিকা শক্তি সম্পর্কে তাঁর ঘোলাটে ধারণা সবচেয়ে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের তত্ত্বে। এ তত্ত্বের প্রধান কথাটা বলা যায় এইরকম: সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক আন্দোলন জনসাধারণকে বিদ্রোহাত্মক হাঙ্গামা থেকে সরিয়ে দেয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের সঙ্গে তাদের মিল হয়ে যায়; রাজনৈতিক সংগ্রাম যদি তার অন্তিম লক্ষ্য — প্রলেতারিয়েতের মুক্তি অবিলম্বে না অর্জন করতে পারে, তাহলে তার প্রয়োজন নেই, আর লক্ষ্যের দিকে আন্দোলনের অন্তর্বর্তী পর্যায়গুলি

অপরিহার্য ও আবশ্যক নয় (বিশেষ করে, রাশিয়া, বলকান, স্পেন ইত্যাদিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কারের পর্যায়); অবিলম্বে প্রয়োজন রাষ্ট্র ও তার সমস্ত প্রতিষ্ঠানাদির পুরোপুরি উচ্ছেদ এবং অরাজক, কর্তৃপক্ষবিরোধী ব্যবস্থার প্রবর্তন ('কল্পিত জনশাসন' হিশেবে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বাতিল); স্বাধীন প্রলেতারীয় পার্টি ও কেন্দ্রীভূত নানা ধরনের শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজন নাকচ করা হচ্ছে গুপ্ত, সংকীর্ণ, কঠোরভাবে কেন্দ্রীভূত ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের অনুকূলে, যা নাকি 'সামাজিক উচ্ছেদ' সম্পন্ন করবে — ঘটাবে রাষ্ট্রের বিলোপ, কর্তৃত্বের অবসান, 'শ্রেণী ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামাজিক সাম্য'।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করার কথা ভাবা হয়েছে উত্তরাধিকার স্বত্ব বাতিল এবং শিল্প ও কৃষি সমিতিগুলির হাতে সম্পত্তি তুলে দেওয়ার মাধ্যমে; রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীভূতি তথা রাষ্ট্রপাট এমনিতেই ব্যক্তি, সমিতি, কমিউন, অঞ্চল, প্রদেশ ও একই মানবিক সীমায় জাতির স্বাধীন ফেডারেশনের বিপরীত।

প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্বের আবশ্যিকতায় সন্দিহান বাকুনিন তাতে যান্ত্রিকভাবে আরোপ করেছেন প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাটের নেতিবাচক দিকগুলি, এবং প্রকাশ করেছেন ঠিক সেই ধরনের আধিবিদ্যক চিন্তন, যার প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা করেছিলেন তিনি নিজেই। বাকুনিন লিখেছেন: 'বৈপ্লবিক একনায়কত্ব আর রাষ্ট্রপাটের মধ্যে পার্থক্য কেবল তাদের বাহ্যিক পরিবেশে। মূলত তারা প্রথমের কল্পিত মূর্খতা আর দ্বিতীয়ের কল্পিত বিজ্ঞতার নামে অধিকাংশের ওপর অল্পাংশের সেই একই শাসন। তাই উভয়ই একই রকম প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা দুই-ই শাসক অল্পাংশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ সুবিধা এবং জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব চিরস্থায়ী করার অপরিবর্তনীয় প্রত্যক্ষ ফল।'* 'রাষ্ট্র নামক বহুযুগের কারাগারকে চূর্ণ না করে' অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে প্রলেতারিয়েতের মুক্তি সম্ভব নয় বলে মনে করেন বাকুনিন।** 'শাসক সম্প্রদায়ে উন্নীত প্রলেতারিয়েত মানে কী? সমগ্র প্রলেতারিয়েত শাসনের শীর্ষে থাকবে বুঝি?' জিজ্ঞাসা করেছেন নৈরাজ্যবাদের তত্ত্বকার এবং পেশ

করেছেন তথাকথিত তর্কাতীত থিসিস: 'রাষ্ট্র যদি থাকে, তাহলে থাকবে শাসিত, থাকবে দাসত্ব'।*

নৈরাজ্যবাদের ('রাষ্ট্রবিরোধী সমাজতন্ত্রের') মতবাদ বাকুনিন উপস্থিত করেন 'সামাজিক বিপ্লব ছাড়া অন্য কোনো উপায় যা রাখে নি, তেমন সর্ববিধ বুর্জোয়া রাজনীতি, সমস্ত সরকার থেকে পরিপূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের' নিদর্শন হিশেবে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যে তত্ত্বকে তিনি বলেছেন 'রাষ্ট্রীয় কমিউনিস্ট আর বৈজ্ঞানিক কর্তৃত্বের বিপরীত তত্ত্ব' তার প্রতিনিধিদের তিনি নরমপন্থী সংস্কারবাদীদের সঙ্গে এক করে দেখেছেন, যারা নাকি ইচ্ছে করে 'রাজনৈতিক রণকৌশলের অছিলায় সরকার এবং নানাবিধ বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে নিরন্তর সমঝোতায় আসছে'। এই ক্ষেত্রে মার্কসের তত্ত্বকে অন্যায় করে ধরা হয়েছে লাসালের রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মসূচির কাছাকাছি — এই দুটি ধারণাকেই তিনি ফেলেছেন তথাকথিত 'বুলিবাগীশ বিপ্লবীদের' কোঠায়।** বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের প্রতি বাকুনিনের মনোভাব তাঁর রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব, সাবজেকটিভিজম ও বৈজ্ঞানিক অসিদ্ধির প্রোজ্জ্বল প্রমাণ, যা নৈরাজ্যবাদ প্রকাশ করেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মহান মতবাদের সঙ্গে তার বিতর্কে।

যেমন সামাজিক বিকাশের তত্ত্ব, তেমনি রাজনীতির তত্ত্বের ক্ষেত্রেও বাকুনিন পরিষ্কার নিহিলিস্ট (নস্যাৎবাদী) মনোভাব নিয়েছেন রাষ্ট্রপাট ও সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মার্কস যে বিপুল কাজ করে গেছেন তার প্রতি। মার্কসের সে কীর্তি সম্পর্কে লেনিন লিখেছেন: 'ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিতে এতদিন পর্যন্ত যে বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচার চলছিল, তা বদলে গেল আশ্চর্যরকম একটা অখণ্ড ও সুসমঞ্জস তত্ত্বে, যা দেখাল কিভাবে উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধির ফলে একটা সামাজিক জীবনের একটা ব্যবস্থা বিকশিত হয় অন্য একটা উন্নততর ব্যবস্থায় — দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভূমিদাসপ্রথা থেকে বেড়ে ওঠে পুঁজিবাদ।'***

সমাজ এবং রাষ্ট্র বিদ্যায় নাকি থাকে কেবল 'মিথ্যা আর সর্বনাশা বিমূর্তন', তার তীক্ষ্ন বিপরীতে বাকুনিন স্থাপন করেছেন প্রকৃতিবিদ্যা: 'ঈশ্বরতত্ত্ব, রাজনীতি ও আইনের তুলনায় দৃষ্টবাদী বিজ্ঞানের বিপুল

সুবিধা এইখানে যে এইসব বিদ্যা মিথ্যা ও সর্বনাশা যেসব নিষ্কাষণের প্রস্তাব করে তার বদলে এই বিজ্ঞান নির্ভর করে সত্যকার বিমূর্তনের ওপর যা ব্যাপার-স্যাপারের সাধারণ প্রকৃতি ও যুক্তি, তাদের বিকাশের সাধারণ নিয়ম ও সত্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করে।'*

বাকুনিন সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক চরিত্র অস্বীকার করেছেন এই যুক্তিতে যে 'সত্যকার সমাজতন্ত্র' নাকি জনগণের স্বতঃপ্রবৃত্তিতে নিহিত। সচেতন আদর্শ রচনা করে কেবল সমস্ত জনগণের বাইরে অবস্থিত শিক্ষিত অল্পাংশ, যেক্ষেত্রে স্বতঃপ্রবৃত্তিমূলক আদর্শ হল সমগ্র জনগণের প্রকৃতিগত অন্তর্নিহিত। সুতরাং, কেবল এইসব 'স্বতঃপ্রবৃত্তিমূলক আদর্শকে' সত্যই জনগণের বলে স্বীকার করা যেতে পারে। এই থেকেই এসেছে তাঁর সুবিদিত বক্তব্য যে রুশ কৃষক হল 'স্বতঃপ্রবৃত্তি বশেই কমিউনিস্ট'। বাকুনিনের মতে, আধুনিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল 'প্রাণশক্তির অভাব', তার একমাত্র কাজ হল 'জীবনের ওপর আলোকপাত', কিন্তু 'তাকে চালনা নয়'। নিজের নৈরাজ্যবাদী ইউটোপিয়ায় বাকুনিন প্রায়ই সন্দিহান হয়েছেন, এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্বতন্ত্রের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে আর 'বিজ্ঞান ও পণ্ডিতদের অত্যাচার' থেকে অজ্ঞ ও পদদলিত জনগণের স্বার্থরক্ষার দাবি করেছেন। আ. ই. গের্ৎসেন তাঁর প্রখ্যাত 'পুরনো বন্ধুর নিকট চিঠিগুলি'তে 'বিজ্ঞানের হেরোস্ট্রাটস' — বাকুনিনকে তাঁর বিজ্ঞানের বিরুদ্ধতার বিদঘুটেমি ব্যাখ্যা করে উল্লেখ করেছেন যে 'বৈজ্ঞানিক বিদ্যা ছাড়া ফলিত বিদ্যাও থাকবে না।... বই বন্ধ করে, বিজ্ঞানকে ফেলে দিয়ে ধ্বংসের কী-একটা অর্থহীন লড়াইয়ে নামার জন্য উদ্দাম আহ্বান অতি ক্ষিপ্ত ও অতি অনিষ্টকর গলাবাজির কোঠায় পড়ে। তার পেছনে পেছনেই আসে বলগা-ছাড়া বন্য রিপু।'**

ইউটোপিয়ার গণ্ডি থেকে বাকুনিন বেরিয়ে আসতে পারেন নি, তাঁর রাষ্ট্র নাকচের ধারণা বৈপ্লবিক ছিল না, এবং কার্যক্ষেত্রে তাকে রূপায়িত করার গতিপথে তা হয়ে উঠতে পারত কেবল প্রতিক্রিয়াশীল।

১ম আন্তর্জাতিকের সমান্তরালে গঠিত বাকুনিনের 'অ্যালায়েন্স'-এর রাজনৈতিক লাইনে তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিরোধ বিশেষ স্পষ্ট করে ফুটেছে। গোপন এই সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের বলত আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃবৃন্দ,

---

বাকুনিন ও তাঁর ভক্তদের অভিসন্ধি অনুসারে, সংগঠনটির কাজ ছিল প্রলেতারীয় শ্রমিক পার্টির স্থলে অ্যালায়েন্সের 'অদৃশ্য একনায়কত্ব' স্থাপন করা। বেপরোয়া গণ আন্দোলনের বিপুল ভূমিকা মুখে স্বীকার করলেও বাকুনিন আসলে মনে করতেন জনগণ কেবল স্বতঃস্ফূর্ত, সহজপ্রবৃত্তিমূলক উৎসারে সক্ষম, তাই পেশাদার বিপ্লবীদের গোপন সংগঠনের পক্ষ থেকে জন আন্দোলনের একনায়কী পরিচালনাকে ন্যায়সঙ্গত গণ্য করতেন।

১ম আন্তর্জাতিকের রুশ বিভাগের অন্যতম নেতা ও সক্রিয় অংশী গ. লোপাতিন বাকুনিনপন্থী প্রতারকদের এমন ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন, 'যাঁরা প্রকাশ্যে সাধারণ পরিষদের কেন্দ্রিকতা, স্বেচ্ছাচার, অধিনায়কীয়ানা, আত্মক্ষমতার বিরুদ্ধে বজ্রনাদ করেছেন আর অপ্রকাশ্যে **ষড়যন্ত্র** করেছেন সরকারের বিরুদ্ধে নয়, নিজেদেরই স্বধর্মী কমরেডদের বিরুদ্ধে, গঠন করেছেন **গোপন** লীগ (l'alliance) যার লক্ষ্য ছিল গোপনে, আন্তর্জাতিকের ব্যাপক সাধারণ সদস্যের অজ্ঞাতে তার কাজকর্ম চালানো।'*

ষড়যন্ত্র ও মেকি-বিপ্লবী হুকুমদারি আচরণের উপাদান চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে স. নেচায়েভ গঠিত 'জন হিংসা' সংগঠনে এবং কুখ্যাত 'প্রশ্নোত্তরে বিপ্লবীর' শিক্ষায়। শেষোক্তটি, নেচায়েভের নিকট বাকুনিনের সম্প্রতি প্রকাশিত পত্র থেকে যা দেখা যাচ্ছে**, এমনকি নেচায়েভের অন্ধস্তুতিধন্য বাকুনিনের কাছেও মনে হয়েছিল 'আব্রেকদের*** প্রশ্নোত্তর'। ব্যাপারটা হল এই যে লক্ষ্যের দিক থেকে যা গণতান্ত্রিক ও মুক্তিকামী তেমন আন্দোলনে নিয়ে আসা হয়েছিল জেসুয়িট নীতি ও আচরণের পদ্ধতি: বিনা বাক্যে একনায়কী নেতৃত্বের ইচ্ছা পালন, মিথ্যা এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি, সেই সঙ্গে জনগণ ও এক-একজন নাগরিককে স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপকরণে পরিণতি। এ পত্রে বাকুনিন নেচায়েভের সঙ্গে তাঁর 'সত্যকার রাজনৈতিক সম্পর্ক' ছিন্ন করেন, তবে প্রস্তাব করেন নিছক

ব্যবহারিক যোগাযোগের, দাবি করেন যে জনগণ এবং তার 'সেনাপতিমণ্ডলী', অর্থাৎ ওই নেচায়েভপন্থী ও বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে কেবল 'নৈতিক' সম্পর্ক রাখবেন। যে মতভেদ দেখা দিল এবং 'প্রশ্নোত্তর' রচনায় সম্ভবত বাকুনিনের সত্যিই কোনো অংশ না থাকলেও* ভাবাদর্শীয় অনুপ্রেরক ও সহকর্মী হিশেবে নেচায়েভের হঠকারিতার জন্য তাঁরও দায়িত্ব আছে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের পুরো একগুচ্ছ রচনায় সমালোচিত হয়েছে বাকুনিনের রাজনৈতিক আদর্শ।** এ সমালোচনার প্রধান কথা ছিল শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের ভূমিকা, সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের তাৎপর্য এবং এইসবের সঙ্গে জড়িত নানান দিক নিয়ে নৈরাজ্যবাদী ধারণার অসিদ্ধি প্রমাণ।

এ কথাটাও স্মরণে রাখা উচিত, যে-নৈরাজ্যবাদী সংগঠনের জন্য বাকুনিন অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, তার মূল উপাদানগুলির মনোযোগী বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে সেগুলিতে 'কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রের' সমস্ত লক্ষণই ধরা পড়ে। বাকুনিন যদিও সর্বত্র 'রাষ্ট্র' কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, পছন্দ করেছেন (যেমন, অ্যালায়েন্সের নিয়মাবলিতে) 'নিচু থেকে ওপরের দিকে গঠিত বৈপ্লবিক কমিউন', তাহলেও একাধিক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সংগঠনের নাম দিয়েছেন 'নতুন বৈপ্লবিক রাষ্ট্র'। বাকুনিনের মতে, এটির গঠন নিচু থেকে ওপরের দিকে 'বৈপ্লবিক প্রতিনিধিত্বের' মাধ্যমে এবং সমস্ত অভ্যুত্থানী স্বার্থ তা ধারণ করবে: এই বৈপ্লবিক প্রতিনিধিত্ব জাতীয় পার্থক্য ও পুরনো রাজনৈতিক সীমারেখা স্বীকার করে না, তার প্রধান কর্তব্য হবে সাধারণ সেবাকর্মের ব্যবস্থাপনা, জনগণের ওপর শাসন নয়। এ সংগঠনের থাকবে দুটি ধাপ — কমিউন পরিষদ (নিচে) এবং ফেডারেল পার্লামেণ্ট (ওপরে)।

তবে মার্কস ও এঙ্গেলস যুক্তিসহকারে যা বলেছেন, 'কিছু-একটা সম্পাদন' করতে হলে কমিউন পরিষদ ও পার্লামেণ্টকে (কোনো না কোনো কমিটির মাধ্যমে) কোনো একটা ক্ষমতায় ভূষিত করতে হবে আর তাকে নির্ভর করতে হবে সামাজিক বাধ্যকরণের শক্তির ওপর। 'যেমন কমিউন পরিষদ তেমনি এই পার্লামেণ্টকে এক বা একাধিক **কমিটির** হাতে **কর্মনির্বাহী ক্ষমতা** তুলে দিতে হবে, কেবল এই একটা ঘটনার দরুনই শেষোক্তরা অর্জন করবে একটা কর্তৃত্বমূলক চরিত্র, যা সংগ্রাম প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত বর্ধিত হওয়ার কথা। এইভাবে 'কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রের' সমস্ত উপাদান ক্রমশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। এই যন্ত্রটাকে যে আমরা 'নিচু থেকে ওপরের দিকে গঠিত বৈপ্লবিক কমিউন' বলছি তার বিশেষ গুরুত্ব নেই। আখ্যায় ব্যাপারটা বদলায় না। নিচু থেকে ওপরের দিকে সংগঠন রয়েছে সমস্ত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেই, আর অনুজ্ঞামূলক জন-মঞ্জুরির কথা জানা ছিল সেই মধ্যযুগেই।'* মার্কস ও এঙ্গেলস এক্ষেত্রে মূর্ত-নির্দিষ্ট মালমশলা দিয়ে দেখিয়েছেন বিপ্লবের নৈরাজ্যবাদী পরিকল্পনা কার্যত রূপায়িত করার পর্বে 'অবিলম্বে রাষ্ট্র বিলোপের তূর্যনিনাদ' কী মূল্য ধরে।**

নৈরাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক চেতনা যে বুর্জোয়াবিরোধী ও শোষণবিরোধী কতকগুলি দিক থেকে বর্জিত নয়, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু সে চেতনায় কদাচ প্রতিফলিত হয় নি শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগীদের সত্যকার প্রয়োজন। মার্কস মন্তব্য করেছেন: 'সমাজতান্ত্রিক সংকীর্ণতাবাদের বিকাশ আর সত্যকার শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ সর্বদাই পরস্পরের বিপরীতমুখী'।'*** রাষ্ট্রের প্রশ্নে শ্রেণী অবস্থান যখন ঝাপসা করে তোলা হচ্ছে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদী পলিসিতে, বিশেষ করে সেই পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলনের ওপর নৈরাজ্যবাদী প্রভাবের ক্ষতিকরতায় জোর দিয়ে লেনিন বলেন যে, 'নৈরাজ্যবাদ প্রায়ই হল শ্রমিক

আন্দোলনের সুবিধাবাদী পাপের একপ্রকার শাস্তি'*।

বাকুনিন এবং নৈরাজ্যবাদের অন্যান্য তাত্ত্বিকদের ভাবাদর্শীয় উত্তরাধিকারে গত শতক ধরে খানিকটা আগ্রহ দেখা গেছে নানান স্তর ও পার্টির মধ্যে, প্রধানত যাদের উদ্ভব ও রাজনৈতিক ঝোঁক পেটি-বুর্জোয়া, কিন্তু সমগ্রভাবে নৈরাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায় নি। বাকুনিনপন্থীরা কিছুকালের জন্য স্পেন, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড ও অন্য কয়েকটি দেশে শ্রমিক ও মুক্তি আন্দোলনে নিজেদের প্রভাব বজায় রেখেছিল। রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যালিস্টদের বাধ্য করে কমিউনিস্টদের কাছাকাছি আসতে ও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে, যদিও বেশি দিনের জন্য নয়। ফেডারেল জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপানে আমাদের যুগে ৬০-এর দশকের যুব 'হাঙ্গামা' ও অভিযানের পর্বে বাকুনিন তথা প্রুধোঁর নৈরাজ্যবাদে আগ্রহের খানিকটা পুনরুজ্জীবন ঘটেছে যুবক ও বাম-র‍্যাডিকেল বুদ্ধিজীবীদের মহলে।

প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক পর্বের রাষ্ট্র ও রাজনীতির যে সমালোচনা বাকুনিন করেছিলেন তা থেকে আধুনিক বাম-র‍্যাডিকেলরা যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন রাষ্ট্রপাট এবং একচেটিয়া বুর্জোয়ার রাজনীতির স্বরূপ মোচনের — তার রাজনৈতিক জোচ্চুরি, দুর্নীতি, অনুন্নত আর স্বল্পবিকশিত দেশকে নির্লজ্জভাবে লুণ্ঠন ও শোষণ, অপর দেশে সামরিক হস্তক্ষেপকে ধিক্কার দেওয়ার জন্য। ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল, তখন খ্যাতনামা আমেরিকান ভাষাবিদ ও বাম-র‍্যাডিকেল রাজনৈতিক কর্মী ন. চোমস্কি তাঁর যুদ্ধবিরোধী বিবৃতি সংকলনের সাধারণ নাম দিয়েছিলেন 'রাষ্ট্রের যুক্তি'**। নামটা নেওয়া হয়েছে বাকুনিনের 'দেশপ্রেম বিষয়ক পত্রাদি'র শিরোলিপি থেকে, যাতে বলা হয়েছে: '...এমন কোনো বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা, মাহাত্ম্যহনন, শপথভঙ্গ, প্রতারণা, হীন রফা, নির্দ্বিধায় চুরি, নির্লজ্জ লুট আর জঘন্য বেইমানি নেই যা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা করে নি, প্রতি বছর করে যাচ্ছে না কেবল 'রাষ্ট্রের যুক্তি' এই স্থিতিস্থাপক, অতি সুবিধাজনক আর সেই সঙ্গে অতি ভয়াবহ কথাটা ছাড়া যার অন্য কোনো কৈফিয়ৎ নেই।'***

যুদ্ধোত্তর কালে ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের

গতিপথে নয়া-নৈরাজ্যবাদী ও বাম-র‍্যাডিকেল ভাবনার কিছুটা উৎসার দেখা গেছে। আফ্রিকায় ফ. ফানন এবং লাতিন আমেরিকায় র. দেব্রের মতো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভাবাদর্শীরা জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলিতে প্রলেতারিয়েত ও সংগঠিত রাজনৈতিক সংগ্রামের ভূমিকা ছোটো করে দেখার দিকে ঝুঁকেছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ভাবাদর্শী ও রাজনীতিকেরা তা কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন 'তৃতীয় দুনিয়ার' দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনকে তার স্বাভাবিক সহযোগী — সমাজতান্ত্রিক দেশ, শ্রমিক শ্রেণী ও বিকশিত পুঁজিবাদী দেশগুলির গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে।*

সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু কিছু পেটি-বুর্জোয়া মহলে বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদের প্রতি যে বর্ধিত মনোযোগ দেখা গেছে, তা বেড়ে উঠছে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিপরীতে নৈরাজ্যবাদকে খাড়া করার বাসনায়। 'বর্তমানে কেউ কেউ বাকুনিনকে দেখাবার চেষ্টা করছেন স্বীকৃতিবঞ্চিত প্রতিভা বলে, কেউ কেউ প্রমাণ করতে চান যে নৈরাজ্যবাদ, যার অন্যতম 'পয়গম্বর' হলেন বাকুনিন, তা নাকি অসীম একটা পরিপ্রেক্ষিত খুলে দিয়েছে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবসান ঘটাতে চেষ্টিত জনগণের সামনে,' লিখেছেন জাক দুক্লো ফ্রান্সে ১৯৬৮ সালের মে-জুলাই ঘটনাবলির কথা মনে রেখে। 'আসলে বাকুনিনের ভাবধারা বর্তমানের বাস্তবতা থেকে একেবারে সুদূর, প্রসঙ্গত যেমন সুদূর তা ছিল অতীত যুগের বাস্তবতা থেকেও।'**

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু কিছু সাম্প্রতিক টেকনোক্রাটিক ব্যাখ্যার সূত্র আসছে বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদী ইউটোপিয়া আর তাঁর বিজ্ঞান ও 'বিজ্ঞানরাজত্ব' নাকচ থেকে। 'রাষ্ট্রপাট ও নৈরাজ্য' নামক রচনায় বাকুনিন দাবি করেছেন, মার্কসবাদীরা যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে কথা বলে, তাতে নাকি ধরে নেওয়া হয় এমন একটা 'কল্পিত জনরাষ্ট্র' সৃষ্টি যাতে নাকি থাকবে 'সত্যিকার বা কল্পিত বিজ্ঞানীদের নতুন এবং খুবই অল্পসংখ্যক একটা অভিজাত সম্প্রদায় দ্বারা

জনগণের উপর খুবই স্বেচ্ছাচারী শাসন। জনগণ অবিজ্ঞানী, তার মানে শাসনের মাথাব্যথা থেকে সে হবে পুরোপুরি মুক্ত, পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হবে শাসিতদের পালে।' 'নৈরাজ্যবাদের প্রতিভার' মাথায় ঢোকে নি যে ভবিষ্যৎ শ্রেণীহীন সমাজেরও প্রয়োজন বিজ্ঞানের সুকৃতি ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হিসাবে রেখে পরিচালনা, বোঝেন নি যে প্রধান কথাটা হল, নতুন সামাজিক সম্পর্কের জন্য শ্রেণী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বিজয় জনগণের উদ্যোগ ছাড়া, রাষ্ট্রের ব্যাপারে, তথা রাষ্ট্র পরিচালনায় মেহনতিদের সকলকেই টেনে আনা ছাড়া অকল্পনীয়।

সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রে বিজ্ঞানী বা কল্পিত বিজ্ঞানীদের আভিজাত্য বিষয়ে বাকুনিনের মতবাদের আরো বিকাশ ও কিছুটা ইতর-বিশেষ ঘটেছে পোলীয় শোধনবাদী মাখাইস্কির তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী প্রলেতারিয়েতের' ধারণায়, পার্টিদ্রোহী ল. ত্রৎস্কির কিছু কিছু ভাবনায়, তথা ম. জিলাসের 'নতুন শাসক শ্রেণী' গ্রন্থে (১৯৫৪)। বর্তমান কমিউনিস্টবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল সোভিয়েতবিদরা সাগ্রহেই বিশেষ আমলাতান্ত্রিক ও টেকনোক্রাট উচ্চকোটির উপাখ্যান অবলম্বন করে থাকে, যারা নাকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আধিপত্য করছে।'*

নৈরাজ্যবাদ ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা নিয়ে তথাকথিত একটা থিসিস অধুনা বুর্জোয়া সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লেনিনবাদ ও বলশেভিকবাদের উদ্ভব বাকুনিন-নেচায়েভ থেকে এমন একটা থিসিস দেখা দিয়েছিল মেনশেভিক ও বলশেভিকবাদের কিছু বুর্জোয়া-উদারনৈতিক রুশ সমালোচকদের পক্ষ থেকে। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে সাম্প্রতিক ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের গতিপথে এই অপভাষ্যটা লুফে নেয় আকাদেমিক গবেষক থেকে পীত সাংবাদিক পর্যন্ত সমস্ত রঙের কমিউনিস্টবিরোধীরা।** মার্কসবাদের ইতিহাস বিকৃত করা এই থিসিসের

সমর্থনে শ্রেণী ও অন্যান্য দিক থেকে যত বিভিন্ন যুক্তিই আসুক, সমাজতন্ত্রবিরোধিতার একটা ব্যাপারে সবাই একমত, যথা: মার্কসবাদ ও নৈরাজ্যবাদের অভিন্নতা, উভয়ের মধ্যেই নাকি আছে 'পরিত্রাতা আবির্ভাবের প্রেরণা', প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব উদ্যম ও বৈপ্লবিক উদ্যোগে অবিশ্বাস, ইত্যাদি। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক, বুর্জোয়া সাহিত্যে বাকুনিনের অন্যতম বিশদ জীবনীকার ই. কার হেগেলীয় পদ্ধতি এবং সামাজিক বিরোধ সমাধানের তৎসংশ্লিষ্ট বৈপ্লবিক মনোভাবের একান্ত ভক্ত হিশেবে মার্কস ও বাকুনিনকে এক কোঠায় ফেলেছেন। এ কথায় তিনি সঠিক জোর দিয়েছেন যে হেগেলের ভাবনা অবলম্বনে বাকুনিন থেকে গেছেন হেগেলপন্থী-ভাববাদী আর মার্কস হেগেলপন্থী-বস্তুবাদী, তাহলেও বুর্জোয়া গবেষক এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মার্কস নাকি নিঃসন্দেহে বাকুনিনের 'ধ্বংসের আবেগে' সায় দিয়েছিলেন।* মার্কসের উপর বাকুনিনের প্রভাব বিষয়ে ব. খজেলিটসের (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়) উক্তিটা স্পষ্টতই স্বকপোলকল্পিত, কোনোরকম যুক্তির ধার ধারে না। এর সপক্ষে তাঁর বক্তব্য শুধু একটা: বিচ্ছেদের পরও মার্কস বাকুনিন সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন, মন দিয়ে পড়েছিলেন তাঁর 'রাষ্ট্রপাট ও নৈরাজ্য'। এই ঘটনাটির উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, 'আমাদের স্বীকার করতে হবে যে বাকুনিনের ভাবধারা মার্কসের ওপর সুগভীর ও দীর্ঘ প্রভাব ফেলেছিল।'** ভাবধারার ইতিহাসে প্রায়ই যা ঘটে থাকে, কালের হাওয়ার সঙ্গে যখন তার পারস্পরিক সম্পর্ক খোঁজা হয়, তখন বহু ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা তার ভিত্তিতে আন্দাজী অনুমান অতীতের অসাধু ভাষ্যকারের হাতে হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সুবিধাজনক হাতিয়ার। এ ক্ষেত্রে তথ্যকে খেলানো হয়েছে মার্কসবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য।

নিজের রাজনৈতিক ধারণায় বাকুনিন ইউটোপিয়ার সীমা থেকে, অপ্রাপ্যের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি।

নৈরাজ্যবাদী ধারণার দুর্মরতার কারণ সম্পর্কে জাক-দ্যুক্লো লিখেছেন: 'হতাশার মুহূর্তে লোকে যেসব কারণে ধর্মে সান্ত্বনা খুঁজতে যায়, সেই কারণেই সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের কালে ইউটোপীয় ধারণার প্রসার ঘটে, এবং সেটা ঘটে ততই অনায়াসে যতই কোনো কোনো লোকের কাছে তার রূপায়ণ মোটেই কঠিন বলে বোধ হয় না।'*

যেমন নৈরাজ্যবাদের তাত্ত্বিক, তেমনি আত্মোৎসর্গী বিপ্লবী হিশেবে বাকুনিনের ভাগ্য একেবারে দুটি ভিন্ন দিক থেকে শিক্ষাপ্রদ। যে রাজনৈতিক কর্তব্য তিনি উপস্থিত করেছেন মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার সঙ্গতি না থাকায় বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদী ধ্যানধারণা পরিণত হয়েছে অসম্ভাব্য এক মোহে, রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব রাজনৈতিক সমস্যার সামনে যা অসহায়। সেই সঙ্গে আবার বিপ্লবী বাকুনিনের স্মৃতি এমন এক ব্যক্তির স্মৃতি হিশেবে বন্দনীয় যিনি নিজের বোধ ও সামর্থ্য অনুসারে রাশিয়ায় জার স্বৈরতন্ত্র এবং পশ্চিম ইউরোপে পুঁজির সর্বশক্তিমত্তার বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে লড়েছেন।



চতুর্থ অধ্যায়

নিকোলাই চের্নিশেভস্কি

নিকোলাই চের্নিশেভস্কির জন্ম ১৮২৮ সালে। ১৮৪৬ সালে তিনি পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ফ্রান্স এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের ঘটনাবলি তিনি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন, পরিচিত হন পেত্রশেভস্কি চক্রের সদস্য আ. ভ. খানিকভের সঙ্গে, শ. ফুরিয়ের রচনা পাঠ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় যখন শেষ করছেন তখন তিনি প্রত্যয়োত্তীর্ণ বিপ্লবী। 'রাশিয়া সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা: আসন্ন বিপ্লবের অদম্য প্রতীক্ষা, তার পিপাসা,'— ১৮৫০ সালের জানুয়ারিতে তিনি লেখেন

ডায়েরিতে।*

১৮৫৫ সালের মে মাসে তিনি সমর্থন করেন তাঁর এম. এ. থিসিস: 'বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পের নান্দনিক সম্পর্ক'। ১৮৫৬ সালে 'সভ্রেমেন্নিক' ('সমকালীন') পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। সেন্সরের বাধা সত্ত্বেও চের্নিশেভস্কির নেতৃত্বে পত্রিকাটি পরিণত হয় রাশিয়ায় জায়মান বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের মুখপত্রে।

জার সরকার যে কৃষক সংস্কারের আয়োজন করছিল, ১৮৫৯ সাল থেকে তার আসল সীমা যত উদ্ঘাটিত হতে থাকে, ততই চের্নিশেভস্কি সম্ভাব্য কৃষক বিপ্লবের জন্য পাঠকদের প্রস্তুত করতে থাকেন ও তা পরিচালনার জন্য ডাক দেন রূপকের ভাষায়।

চের্নিশেভস্কির ক্রিয়াকলাপে 'ভূমি ও স্বাধীনতা' নামে একটি বৈপ্লবিক সংগঠনের ভাবাদর্শীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। তিনি নিজেও সংগঠনটি গড়ায় সরাসরি অংশ নেন।

১৮৬২ সালে চের্নিশেভস্কি গ্রেপ্তার হন। বৈপ্লবিক ঘোষণাপত্র লেখার অভিযোগে ১৮৬৪ সালে তিনি সাত বছর কয়েদ-খাটুনিতে দণ্ডিত হন। মেয়াদ ফুরলে তাঁকে আটক রাখা হয় ভিলিউইস্কে, ১৮৮৩ সালে 'বসবাসের' জন্য পাঠানো হয় আস্ত্রাখানে, তারপর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে সারাতভে। ১৮৮৯ সালে মৃত্যু হয় চের্নিশেভস্কির।

চের্নিশেভস্কির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক কর্মসূচি অবিরাম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে।

'সভ্রেমেন্নিক' পত্রিকায় কাজের প্রথম বছরগুলিতে তিনি বহুক্ষেত্রে ভূমিদাসপ্রথার বিরোধী উদারনীতিকদের সমর্থন করেন। জারের অনুশাসনগুলির প্রকাশ, আসন্ন কৃষক সংস্কার নিয়ে খবরের কাগজে যে আলোচনা শুরু হয় তাতে দেশের পরিস্থিতি আমূল বদলে যায়। ই. ক. পাস্তিন ঠিকই বলেছেন: 'রাশিয়ায় দেখা দিচ্ছে সামাজিক প্রেরণা, যার তাৎপর্য নির্ধারিত হচ্ছিল শুধু অন্তিম নয়, আশু লক্ষ্য দিয়েও, শুধু সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নয়, সরাসরি রাজনৈতিক কর্তব্যের উপলব্ধি

দিয়েও।'* নতুন পরিস্থিতিতে চের্নিশেভস্কি পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে কৃষক প্রশ্নে একটা একক সর্বজাতীয় স্বার্থের কথাই উঠতে পারে না, সোজাসুজি তিনি কৃষকদের অবস্থানে দাঁড়ালেন, দাঁড়ালেন উৎপীড়ক, স্বৈরক্ষমতা, জমিদারদের সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের অবস্থানে। রুশ রাজনৈতিক সাহিত্যে চের্নিশেভস্কিই প্রথম রুশ বিপ্লবে উদারনীতিক অভিজাত, উদারনীতিক বুর্জোয়া আর রুশ কৃষকের স্বার্থের মধ্যে আমূল পার্থক্যের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। এই দিক থেকে তিনি রাশিয়ায় শ্রেণী শক্তির সত্যকার ভেদরেখাটা বহু আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন।**

১৮৫৮-১৮৬৪ সালে সামাজিক বিকাশ সম্পর্কে চের্নিশেভস্কির ধারণায় রীতিমতো একটা বিবর্তন দেখা দেয়। তিনি ছিলেন প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিক। লেনিন যা লিখেছেন: 'চের্নিশেভস্কিই একমাত্র মহান রুশী সাহিত্যিক যিনি ৫০-এর দশক থেকে শুরু করে ৮৮ সন অবধি নয়াকাণ্টপন্থী, দৃষ্টবাদী, মাখপন্থী, প্রভৃতি বিভ্রান্তদের করুণ ছাইভস্ম বর্জন করে অখণ্ড দার্শনিক বস্তুবাদের মানে টিকে থাকতে পেরেছিলেন। কিন্তু চের্নিশেভস্কি পারেন নি, সঠিক বললে রুশ জীবনে পশ্চাৎপদতার কারণে পারতেন না মার্কস ও এঙ্গেলসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের স্তরে উঠতে।'***

চের্নিশেভস্কির সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের ভিত্তি ছিল নৃবৈজ্ঞানিক নীতি। তিনি লিখেছেন: 'জীবনের কোনো একটা বিশেষ শাখা সম্পর্কে যা-কিছু আমরা বলি... তার ভিত্তি হওয়া উচিত মানব প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ বোধ, যা তার মধ্যে জাগায় কর্মের প্রেরণা ও প্রয়োজন।'**** তাঁর প্রথম দিককার রচনায় চের্নিশেভস্কি সামাজিক সম্পর্কাদির বিশ্লেষণ প্রায় করেনই নি, সমাজজীবনের প্রধান বিরোধ বলে গণ্য করেছিলেন মানুষের প্রয়োজন ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধকে। লেনিন যা মন্তব্য করেছেন, চের্নিশেভস্কির নৃবিদ্যা বস্তুবাদের একটা কেবল অযথাযথ, দুর্বল বর্ণনায় সীমিত থেকেছে*****, মানুষের সামাজিক প্রকৃতি এবং তার ক্রিয়াকলাপের সামাজিক প্রেরণার বিশ্লেষণের স্তরে তিনি উঠতে পারেন নি।

কৃষক গণতান্ত্রিকতায় উপনীত হয়ে চের্নিশেভস্কির সমাজতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা সমৃদ্ধ হয়, ঘন ঘনই তিনি মন দিতে থাকেন 'বৈষয়িক স্বার্থের' দিকে, একাধিক ক্ষেত্রে তিনি একেবারে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কাছাকাছি এসে গেছেন।

চের্নিশেভস্কির সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে ভূমিদাস সম্পর্ক ও প্রথার সমালোচনা। ন. আ. ত্সাগোলভ ঠিকই বলেছেন, চের্নিশেভস্কির আগে 'ভূমিদাসপ্রথা আর পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য অমন প্রোজ্জ্বল আর গভীর করে আর কেউ দেখান নি, উদ্ঘাটন করেন নি ভূমিদাসপ্রথা ধ্বংসের অবজেকটিভ আবশ্যিকতা। চের্নিশেভস্কি কেবল মহান কৃষক বিপ্লবীই নন, তিনি ছিলেন সামন্ততন্ত্রবিরোধী কৃষক বিপ্লবেরও মহান তত্ত্বকার।'*

একাধিক বার চের্নিশেভস্কি ঘোষণা করেছেন যে প্রগতির ভিত্তি হল মানসিক বিকাশ এবং 'তার মৌল দিকটা হল সোজাসুজি জ্ঞানের উন্নতি ও বিকাশ'। সেই কারণে তিনি সর্বাগ্রে এই প্রশ্ন করেন: ভূমিদাস সম্পর্ক ও সাধারণত সামন্ততন্ত্র কি বিচারবুদ্ধির সঙ্গে খাপ খায়? সামন্ততন্ত্র, তাঁর মতে, এমন একটা সমাজব্যবস্থা যা প্রগতির পথে বাধা। 'শ্রমপ্রিয়তা আর ঔৎসুক্যের সঙ্গে কী তার মিল?' প্রশ্ন করেছেন তিনি এবং নিজেই উত্তর দিয়েছেন: 'ওটার উদ্ভব যুদ্ধজয় থেকে, উদ্দেশ্য — অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করা, ওটা টিকে থেকেছে বলপ্রয়োগে, বিদ্যার্জনের আগ্রহ সামন্তদের ছিল না। যুদ্ধ, টুর্নামেণ্ট ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার পর যে সময়টা থাকত সেটা তারা অতিবাহিত করতে চাইত আলস্যে।... এখন প্রশ্ন করি, কী উপায়ে এইসব ব্যবস্থা প্রগতির আনুকূল্য করতে পারে? মেহনতিদের সম্পূর্ণ অধীনে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে তারা, আর তার প্রেরণা ছিল শ্রমোৎপন্ন সম্পদ যত বেশি পারা যায় আত্মসাৎ করা।... এর পর কি বলা যায় যে তখনকার ব্যবস্থাগুলি শ্রমকে সাহায্য করেছে? যদি তা কোনো ফললাভ করে থাকে, তাহলে সেটা এইসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও।'**

এই ধরনের ভাবনায় চের্নিশেভস্কি ফিরে এসেছেন বারম্বার। যেমন, 'গ্রামীণ জীবনযাত্রার নতুন পরিস্থিতি প্রসঙ্গে' নামক যে প্রবন্ধে রাশিয়ায় সরাসরি আসন্ন কৃষক সংস্কারের প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে, তাতে তিনি লিখছেন: 'বাধ্যতামূলক শ্রম (বেগার খাটুনি) অর্থশাস্ত্রের নিয়মের দিক

থেকে একেবারে বিজাতীয়, ওটা একেবারে ভিন্ন ক্ষেত্রের একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। সমস্ত অর্থনৈতিক নীতির বিপরীতে তা দেখা দেয় ও টিকে থাকে। এটা একটা নিছক ঐতিহাসিক ঘটনা, তার উদ্ভব রাজনীতি, সামরিক ব্যাপারাদি, প্রশাসনিক ক্ষমতার এক্তিয়ারস্থ সম্পর্ক ও ঘটনা থেকে, কিন্তু মোটেই অর্থশাস্ত্র থেকে নয়। অর্থশাস্ত্রের নীতিগুলির দিক থেকে তার ভূমিকা হল তাদের বিকাশের পরিপন্থী ভূমিকা।'*

এইভাবে, চের্নিশেভস্কির দৃষ্টিকোণ থেকে, সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথায় বিচারবুদ্ধির কোনোরকম ভিত্তি নেই এবং তা উচ্ছেদ করা উচিত। এটা বৈশিষ্ট্যসূচক যে ভূমিদাসপ্রথার অর্থনৈতিক অলাভজনকতার আলোচনায় চের্নিশেভস্কি জমিদারদের অবস্থান থেকে নিজেকে পৃথক করে নেওয়া প্রয়োজন জ্ঞান করেছেন, যুক্তি দিয়েছেন কৃষকদের অবস্থান থেকে। 'কোনো সন্দেহই নেই যে ভূমিদাসপ্রথা কৃষির ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে ও ফেলতে বাধ্য, কেননা বাধ্যতামূলক শ্রম সর্বদাই মুক্ত শ্রমের চাইতে কম উৎপাদনশীল,' লিখেছেন চের্নিশেভস্কি। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথায় জোর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেছেন যে তাঁর থিসিস সঠিক 'মালিকের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, কেননা এমন ঘটনা আছে, যাতে বাধ্যতামূলক শ্রমের বদলে মজুরি শ্রম প্রবর্তনে উৎপাদনের খরচা বেড়ে যাওয়ায় মালিকের পক্ষে লাভজনক তা হবে না, কিন্তু মূল্য সৃজনে শ্রমের উৎপাদনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে।' তিনি আরো বলেছেন: 'বাধ্যতামূলক শ্রম সর্বদাই সম্পাদিত হয় কম-বেশি হেলা ফেলা করে, তার দরুন সময় ও উৎপাদনী শক্তি লোকসান যায়, সুতরাং ক্ষতি হয় জাতীয় অর্থনীতির।**

সেন্সরের ফটক এড়িয়ে চের্নিশেভস্কি 'সভ্রেমেন্নিক' পত্রিকার পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জার স্বৈরতন্ত্রের অস্তিত্বের সঙ্গে ভূমিদাসপ্রথার সম্পর্কে। 'ভূমিদাসপ্রথা যে এতদিন টিকে রইল, অস্তিত্বের এ প্রলম্বনের জন্য দায়ী কেবল কুশাসন,'*** লেখেন তিনি ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত 'কুসংস্কার ও যুক্তিবিদ্যার নিয়ম' প্রবন্ধে।

চের্নিশেভস্কি এখানে সোজাসুজি বলেছেন যে সততাশীল সরকারের উচিত ছিল 'ক্ষমতার অপব্যবহার বিষয়ক মামলায় বিচারকদের রায়ে প্রায় সমস্ত মহালেই ভূমিদাসপ্রথা রদ করা'****।

জারের অনুশাসন প্রকাশের আগেই চের্নিশেভস্কি ভূমিদাসপ্রথা বিলোপের একটা পরিচ্ছন্ন ও সুসঙ্গত কর্মসূচি রচনা করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে 'সভ্রেমেন্নিক' পত্রিকার ৯ ও ১০ম সংখ্যায় তিনি 'ভূসম্পত্তি বিষয়ে' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাতে তিনি লেখেন: 'কৃষির সাফল্যের জন্য জমির সেই ধরনের মালিকানা শ্রেষ্ঠ যাতে এক ব্যক্তিতেই মিলিত হয় জমির মালিক, কর্তা এবং কর্মী। সমস্ত ধরনের মালিকানার মধ্যে গ্রাম-সমাজের ভূমিস্বত্ব সমেত রাষ্ট্রীয় মালিকানাই এ আদর্শের সবচেয়ে কাছাকাছি।'*

জারের অনুশাসন প্রকাশের পরে কৃষক সমস্যা সম্পর্কে উদারনৈতিক ও বৈপ্লবিক মনোভঙ্গির ভেদরেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। লেনিন লিখেছেন: 'যেমন ভূমিদাস-মালিকেরা, তেমনি উদারনীতিকেরাও ছিল জমিদারদের মালিকানা ও ক্ষমতা স্বীকৃতির পক্ষে, এই মালিকানা **উচ্ছেদ,** এ **ক্ষমতা পুরোপুরি বিলোপ** নিয়ে কোনোরকম বৈপ্লবিক ভাবনার সরোষ সমালোচনা করে তারা।' বিপ্লবীরা ছিল কৃষকদের পক্ষে। লেনিন মন্তব্য করেছেন: 'তখন অতি স্বল্পসংখ্যক এই বিপ্লবীদের শীর্ষে ছিলেন ন. গ. চের্নিশেভস্কি।'**

যে সংস্কারের আয়োজন হচ্ছিল সে সম্পর্কে চের্নিশেভস্কির মনোভাব বর্ণনায় লেনিন লিখেছেন: 'চের্নিশেভস্কি বুঝেছিলেন যে রুশ ভূমিদাসমালিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র কৃষকদের মুক্তি দিতে, অর্থাৎ ভূমিদাসমালিকদের উচ্ছেদ

চেষ্টা করেছেন যে 'সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমেত রুশ সমাজব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় প্রভাবের ফল' — এমন একটা তত্ত্বের পক্ষপাতী ছিলেন চের্নিশেভস্কি (পক্রোভস্কি ম. ন.। ইতিহাসবিদ্যা ও শ্রেণী সংগ্রাম। — মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ১৯৩৩, সংস্করণ ২, পৃঃ ১৮৩-১৮৫)। এরূপ সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন। চের্নিশেভস্কি আদৌ রাষ্ট্রের ভূমিকা বাড়িয়ে দেখেন নি। রাষ্ট্রকে তিনি গণ্য করেন নি বিকাশের একমাত্র ও সুনির্দিষ্ট একটা কারিকা বলে।

উক্ত প্রবন্ধে তিনি কেবল এই কথায় জোর দেন যে ভূমিদাসত্বে বাঁধার প্রক্রিয়া চলছিল রাষ্ট্রের অংশগ্রহণে; তৎকালীন স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভূমিদাসপ্রথা রাখার সমর্থন করেছে। 'গ্রামীণ জীবনযাত্রার নতুন পরিস্থিতি প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে (সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৫), গিজোর 'রোম সাম্রাজ্যের পতন থেকে ফরাসি বিপ্লব অবধি ইউরোপে সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থের সমালোচনায় (সম্পূর্ণ রচনাবলি, খণ্ড ৭) এবং একসারি অন্যান্য রচনায় ভূমিদাসপ্রথা উদ্ভবের প্রসঙ্গে চের্নিশেভস্কি নানাবিধ কারণ দর্শিয়েছেন, যদিও উৎপাদনের সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি আবির্ভাবের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট পূর্ণাকারে ব্যাখ্যা করেন নি।

করতে অক্ষম, তা পারে কেবল 'জঘন্যতা' চালাতে, উদারনীতিকদের... আর জমিদারদের স্বার্থের মধ্যে তুচ্ছ আপোস ঘটাতে, এ আপোস কৃষকদের বোকা বানাবে নিশ্চিতি ও মুক্তির অলীক ছায়া দেখিয়ে, আর আসলে তাদের ধ্বংস করবে, পুরোপুরি তুলে দেবে জমিদারদের হাতে। এবং তিনি প্রতিবাদ করেন, অভিশাপ দেন সংস্কারকে, কামনা করেন তার অসাফল্য, কামনা করেন যেন উদারনীতিক আর জমিদারদের মধ্যে দাঁড়িবাজি খেলায় সরকার বানচাল হয়, কুপোকাৎ হয়, সেটা রাশিয়াকে নিয়ে যাবে খোলাখুলি শ্রেণী সংগ্রামের পথে।'*

'সভ্রেমেন্নিক'এর পাতায় চের্নিশেভস্কি অবিরাম কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন, ফাঁস করেছেন ভূমিদাসমালিক আর উদারনীতিকদের পরিকল্পনা। জমিদারদের অনুকূলে কৃষকরা যে ছাড় দিয়েছে সেটা পেঁছেছে 'সেই সীমা পর্যন্ত যার বেশি যাওয়া কান্ডজ্ঞানে বারণ'** এই ঘোষণা করে তিনি বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের নিম্নতম কর্মসূচি পেশ করেন। তাতে ছিল কৃষকদের প্লট এক-তৃতীয়াংশ বাড়াতে হবে, আর ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হবে ৫৩ কোটি ২০ লক্ষ রুবল, অর্থাৎ জমিদাররা যা দাবি করছিল তার অন্তত চার গুণ কম, তাছাড়া ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হবে রাষ্ট্রের মাধ্যমে। এ কথা অনুমান করার খুবই কারণ আছে যে প্রকল্পটা কার্যকর হওয়া সম্ভব বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু পত্রিকায় তার প্রচার করে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারেন কৃষকদের 'মুক্তির' যে প্রকল্প আসছে শুধু সরকারি মহল থেকে নয়, উদারনৈতিক শিবির থেকেও, তার সত্যকার লুঠেরা মর্মার্থটা কী।

লেনিন যা বলেছেন, চের্নিশেভস্কি 'তাঁর যুগের সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনায় বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলতে পারেন সেন্সরের বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়েও কৃষক বিপ্লবের ধারণা, সমস্ত সার্বেকি ক্ষমতা উচ্ছেদের জন্য জন সংগ্রামের ধারণা প্রচার করে।'*** কৃষক সংস্কারের প্রাক্কালে চের্নিশেভস্কির লেখা 'গ্রাম-সমাজের ভূমিস্বত্বের বিরুদ্ধে দার্শনিক কুসংস্কারের সমালোচনা' প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে লেনিন উল্লেখ করেন যে চের্নিশেভস্কি 'সেন্সরাধীন মুদ্রণেও খাঁটি বৈপ্লবিক ধারণা পেশ করতে পারতেন'***। তাঁর ক্রিয়াকলাপের এই দিকটায় লেনিন একাধিক বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বলেছেন 'সেন্সরাধীন প্রবন্ধ দিয়েও সাঁচ্চা

বিপ্লবীদের শিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম' চের্নিশেভস্কির বেগবান প্রচারের কথা।*

চের্নিশেভস্কির বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক কর্মসূচি আর উদারনীতিকদের কর্মসূচির মধ্যে আমূল বৈপরীত্য বিশেষ করে ফুটে ওঠে গের্ৎসেনের অবস্থান নিয়ে উদারনীতিক ও বিপ্লবী-গণতন্ত্রীদের মধ্যে সংগ্রামে।

১৮৫৬ সালে গের্ৎসেন এবং ওগারেভ 'রাশিয়ার কণ্ঠস্বর' নামে সংকলন প্রকাশ করতে শুরু করেন। তার প্রথম পুস্তকে ছিল অনামা লেখকের 'প্রকাশকের নিকট পত্র'। ব. ন. চিচেরিনের সাক্ষ্যে, লেখক ছিলেন তিনি নিজে এবং ক. দ. কাভেলিন। গের্ৎসেনের নিকট উদারনীতিক কাভেলিন ও চিচেরিন আহ্বান জানান, 'জার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক ও জীবন্ত স্রোতের ব্যবস্থা করুন।'** 'উচিত বিচারবুদ্ধি সহ' লিখিত গের্ৎসেনের একমাত্র রাজনৈতিক প্রবন্ধ বলে তাঁরা গণ্য করেছিলেন ২য় আলেক্সান্দরের নিকট তাঁর পত্র। 'বিপ্লবকে রাজনৈতিক মতবাদে পরিণত করা, মঙ্গলের একমাত্র উপায় হিশেবে হৈ-হাঙ্গামা ও বলপ্রয়োগের প্রচার করা, বিদ্বেষকে মানুষের উদার অনুভূতি করে তোলা, নবজাগৃতির অনিবার্য শর্ত হিশেবে রক্তের দীক্ষাপাত্র রাখা, সেটা, আপনার ইচ্ছে হলেও, বিজ্ঞান যে নৈতিকতা ও প্রতীতির জন্ম দিয়েছে, তার কাছে অপমানকর। আপনার বৈপ্লবিক তত্ত্ব কখনোই আমাদের এখানে সাড়া জাগাবে না এবং বাগ্মীর মঞ্চের ওপর আন্দোলিত আপনার রক্তপতাকা কেবল ক্রোধ ও বিতৃষ্ণা জাগায় আমাদের,' — লিখেছিলেন চিচেরিন আর কাভেলিন।***

গের্ৎসেনের প্রকাশনা কর্ম সম্পর্কে একেবারেই ভিন্ন অবস্থান নেন বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের প্রতিনিধিরা। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি যথাসম্ভব পূর্ণাকারে প্রকাশ পেয়েছে 'রুশী মানুষ' স্বাক্ষরিত 'মফস্বলের চিঠি'তে। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালের ১ মার্চ তারিখের 'কলোকোল' পত্রিকার ৬৪ ফর্মায়। চিঠিটা কার লেখা তা নিয়ে নানা উল্লেখ আছে। ম. ক. লেমকের মতে, চিঠিটা চের্নিশেভস্কির লেখা। ভ. আ. আলেকসেয়েভও তাই মনে করেন**** ম. ভ.

নেচাকিনার ধারণা, চিঠি লিখেছিলেন দব্রোলিউবভ।* পত্রলেখক সম্পর্কে অন্যান্য মতও আছে। তবে গবেষকরা মনে করেন যে 'রুশী মানুষ' ছদ্মনামে যিনিই থাকুন, তিনি চের্নিশেভস্কির সহকর্মী।

জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের নিকট গের্ৎসেনের যে পত্র রুশ উদারনীতিকদের খুবই ভালো লেগেছিল, ঠিক তার প্রতিই অতীব বিরূপতা দেখিয়েছেন 'রুশী মানুষ'। তিনি লিখেছেন: 'অসত্যের রুদ্র উন্মোচনের বদলে টেমস নদীর তীর থেকে আমরা পাচ্ছি দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের বন্দনা।' পত্রলেখক উদারনীতিকদের দৃঢ় বিরোধিতা করেছেন, তাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদে ডাক দিয়েছেন গের্ৎসেনকে। 'রুশী মানুষ' লিখছেন: 'সবকিছু থেকে দেখা যাচ্ছে যে সত্যকার রাশিয়া সম্পর্কে আপনি একটা মিথ্যে ধারণা পোষণ করছেন; উদারনীতিক-জমিদার, উদারনীতিক-প্রফেসর, উদারনীতিক-সাহিত্যিকরা আমাদের সরকারের প্রগতিশীল প্রবণতার ভরসা দিয়ে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে।' চিঠিতে দেখানো হয়েছে যে 'কেবল শক্তিবলেই জার ক্ষমতার কাছ থেকে জনগণের জন্য মানবিক অধিকার আদায় করা সম্ভব।'

পত্রসমাপ্তিতে 'রুশী মানুষ' লিখেছেন: 'আমাদের অবস্থা সাঙ্ঘাতিক, অসহনীয়, কেবল কুঠারই আমাদের উদ্ধার করতে পারে, কুঠার ছাড়া আর কিছুতেই কোনো সাহায্য হবে না! এ কথাটা, মনে হয়, লোকে আপনাকে আগেই বলেছে, খুবই সত্যি সেটা, অন্য কোনো পরিত্রাণ নেই। ব্যাপারটার শান্তিপূর্ণ সমাধানে সাহায্যের জন্য আপনি যা পেরেছেন সবই করেছেন, এবার সুর পালটান, আপনার 'কলোকোল' প্রার্থনার ঘণ্টির বদলে বিপদ-সঙ্কেতের ঘণ্টা বাজাক! রুস্‌কে ডাকুন কুঠার তুলে ধরতে। বিদায়, এবং মনে রাখবেন শত শত বছর ধরে রুস্‌ ধ্বংস পাচ্ছে জারের শুভ সংকল্পে বিশ্বাসে, সেটায় সমর্থন করা আপনার কাজ নয়।'**

উদারনৈতিকতার যে সুসঙ্গত সমালোচনা করেছিলেন চের্নিশেভস্কি তাতে খুবই মূল্য দিয়েছেন লেনিন। তিনি বলেছেন, চের্নিশেভস্কি প্রখরোদ্যোগে 'উদারনৈতিকতার বেইমানির মুখোশ খুলেছেন যা আজ

অবধি' (১৯১৪ সালে লিখিত — সম্পাঃ) 'কাদেত ও লুণ্ঠনপন্থীদের কাছে চক্ষুশূল।'*

১৮৬১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারির উদ্‌ঘোষণায় চের্নিশেভস্কির প্রতিক্রিয়া হয় একান্ত বিরূপ। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে উদারনৈতিক সংবাদপত্রের অন্তহীন ধন্য ধন্য রবের বিপরীতে একমাত্র 'সভ্রেমেন্নিক' পত্রিকাই জারের ঘোষণায় কোনোরকম সাড়া দেয় নি। সেন্সরাধীন অবস্থায় সংবাদপত্রে ঘোষণা সম্পর্কে নিজের মতামত সোজাসুজি প্রকাশ করার সুযোগ না থাকায় চের্নিশেভস্কি কৃষকদের উদ্দেশে একটি ইশতেহার লিখে গোপনে প্রকাশ করেন: 'জমিদারের অধীনস্থ কৃষকদের নিকট তাদের হিতৈষীর অভিবাদন'। মনে হয়, ইশতেহারটি লেখা হয়েছিল ১৮৬১ সালের গোড়ায়।

সংস্কারের লুঠেরা চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে চের্নিশেভস্কি মন্তব্য করেন যে জমিদারদের কাছে কৃষকদের বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'সোজা কথা, জারের আজ্ঞায় সবাইকে নিঃস্ব করে ছাড়বে জমিদাররা,' — বলা হয়েছিল ইশতেহারে।**

চের্নিশেভস্কি দেখাতে চেষ্টা করেন সংস্কারের আয়োজনে জারের আসল ভূমিকা কী, কৃষকদের জার সম্পর্কে যে মোহ তখনো থেকে গিয়েছিল সেটা ভাঙতে চান, বোঝাতে চান যে জারের ওপর বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই।

'নিজে উনি ঐ একই জমিদার ছাড়া কে? বাদশাহী খাস কৃষকেরা কার? তারা তাঁর ভূমিদাস-কৃষক। জারেরাই তো আপনাদের ভূমিদাসত্বে তুলে দিয়েছে।... জমিদারদের রইল ভূমিদাস, আর জমিদাররা জারের সেবক, তাদের ওপর উনি জমিদার। তার মানে উনি যা ওরাও তাই — সব একই। আর নিজেরাই তো জানেন, কুকুরে কুকুরের মাংস খায় না। জারই জমিদারের পক্ষ নিচ্ছে। তবে উদঘোষণা আর অনুজ্ঞাগুলি যে প্রকাশ করা হল যেন আপনাদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে, ওটা কেবল ধোঁকার জন্যে।'***

ইশতেহারে অভ্যুত্থানের জন্য তৈরি হবার ডাক দেওয়া হয়। আসন্ন অভিযানের জন্য আগে থেকে কথা কয়ে নেওয়া, যুদ্ধবিদ্যা শেখা, বন্দুক জমানো দরকার। অসংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত অভিযানের বিরুদ্ধে কৃষকদের সতর্ক করে দেন চের্নিশেভস্কি।

ভূমিদাসপ্রথা বিলোপেই চের্নিশেভস্কির সামাজিক আদর্শ সীমাবদ্ধ ছিল না। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন ছিল তাঁর।

তিনি ছিলেন ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী। তাঁর ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে যেমন গেৎর্সেনের 'রুশী সমাজতন্ত্র' তেমনি পশ্চিম ইউরোপের প্রমুখ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক ছিল। গেৎর্সেনের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটা এই যে তিনি পিতৃতান্ত্রিক কৃষক গ্রাম-সমাজকে আদর্শায়িত করতে, অপরিবর্তিত রূপে তাকে সমাজতন্ত্রে টেনে আনতে মোটেই চান নি। চের্নিশেভস্কির ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি তাঁর ভাবনার রূপায়ণকে জড়িত করেছিলেন কৃষকদের শ্রেণী সংগ্রাম, কৃষক বিপ্লবের বিজয়ের সঙ্গে।

চের্নিশেভস্কির রচনায় একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে রাষ্ট্র ও আইনের প্রশ্ন। সমাজের পুনর্গঠন প্রয়াসী বিপ্লবী-গণতন্ত্রী হিশেবে তিনি প্রতি পদে এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হন এবং নিজের কাছে ও পাঠকদের কাছে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়েছিল রাষ্ট্র ও আইনের উদ্ভব হল কিভাবে, আধুনিক সমাজে ও বিপ্লবের বিজয়ের পর কী তাদের মর্মার্থ ও ভূমিকা, রাষ্ট্র ও আইনের ঐতিহাসিক ভবিতব্য কী।

রাষ্ট্র ও আইনের উদ্ভবের প্রক্রিয়া অনুধাবনে চের্নিশেভস্কি নির্ভর করেছেন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পর্যায় তত্ত্বের ওপর। চের্নিশেভস্কির আগেও এ তত্ত্বের বহুল ব্যবহার ঘটেছে সমাজবিজ্ঞানে, বিশেষ করে এরই ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও আইনের উদ্ভব পর্যালোচনা করেছেন অ্যা. স্মিথ ও টিউর্গো, যাঁদের রচনার দ্বারস্থ চের্নিশেভস্কি হয়েছেন একাধিক বার। চের্নিশেভস্কিও এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করছেন। রুশ ঐতিহাসিক কুতোর্গার ধারণা ছিল মানব ইতিহাস শুরু হয়েছে কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা থেকে। তাঁর সঙ্গে বিতর্কে চের্নিশেভস্কি লিখেছেন: 'সমস্ত জাতির কিংবদন্তি এই সাক্ষ্য দেয় যে কৃষিকর্ম জেনে স্থিতু হয়ে বসার আগে তারা ঘুরে বেড়াত, শিকার ও পশুপালন করত'।*

আদিম ইতিহাস অধ্যয়নে চের্নিশেভস্কি খুব তাৎপর্য দিয়েছেন নরকুলবিদ্যায়। এই থেকে তিনি এগিয়েছেন যে 'উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের বিকাশের পর্যায়ে যত উপজাতি আছে, তারা তাদেরই মতো; বেদুয়িনদের পর্যায়ে দণ্ডায়মান সমস্ত উপজাতি দুই বিন্দু জলের মতো

বেদুয়িনদেরই অনুরূপ।'* 'সবচেয়ে বন্য বর্বরতা আর সভ্যতার মধ্যে' বিকাশের কয়েকটি পর্যায়ের পার্থক্য করেছেন চের্নিশেভস্কি।** তিনি দাবি করেছেন, নরকুলবিদ্যাকেই 'হতে হবে সেইসব জাতির বিকাশের প্রাচীনতম কালগুলি পুনরুদ্ধারের পথপ্রদর্শক যারা এখন খুবই বিকশিত, কিন্তু যেসব উপজাতি আজো পর্যন্ত পশু শিকার, ফলমূল সংগ্রহ বা পশুপালন করে জীবন যাপনে থেকে গেছে, তাদের মতো একই জীবনযাত্রার পর্বের মধ্য দিয়ে এসেছে।'***

শিকার ও পশুপালনের পর্যায়ে জমির ওপর গ্রাম-সমাজের মালিকানা ছিল; কৃষিতে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা, যা ক্রমশ গ্রাম-সমাজের স্বত্বকে সংকুচিত করে। সম্পত্তির রূপ বদলের পরিণামে ঘটে রাষ্ট্রের উদ্ভব। তিনি লিখেছেন, 'ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি ছিল রাষ্ট্রীয় অধিকারের আবশ্যিক শর্ত।'**** ভূমির ওপর গ্রাম-সমাজের অধিকারের পর্বে সামাজিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য চের্নিশেভস্কি বর্ণনা করেছেন বেশ বিস্তারিতভাবে। 'প্রথমে আমরা দেখি ছোটো ছোটো উপজাতিদের, যারা চালিত হয় একেবারে স্বাধীনভাবে, সামান্য যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ কর্মের প্রয়োজন দেখা দেয়, কেবল তখনই তারা মিলিত হয় সমপ্রকৃতির অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে।'***** উপজাতির সভ্যদের সার্বভৌমত্বের কথা, এরূপ সামাজিক সংগঠনের পরিস্থিতিতে শাসনের এক-একটা শাখা চালাবার জন্য বিশেষ ব্যক্তির অনস্তিত্বের কথা বলেছেন তিনি। 'পৃথক বিচারক সম্প্রদায়ের কথা সমাজ জানে না: আদিম উপজাতিদের মধ্যে সাধারণ সমাবেশে (গ্রাম জমায়েতে) উপজাতির সভ্যরা সকলে স্বাধীনভাবে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করে।... আদিম সমাজে যুদ্ধের ব্যাপারটা কোনোরকম বিশেষজ্ঞতা ছাড়াই উপজাতির সমস্ত সদস্যদের ব্যাপার। সমর শক্তির রূপটা প্রথমে সর্বত্র একই: যুদ্ধ বাধলে অস্ত্র ধরে যে লোকবাহিনী, শান্তির সময় তারা ফেরে শান্তির কাজে।'*)

চের্নিশেভস্কির মতে; রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে অধিবাসীদের বড়ো একটা অংশ সমাজ পরিচালনায় অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়ে। এই নবপ্রবর্তনার কারণ তিনি দেখেছেন গ্রাম-সমাজের কাছে বিজাতীয় কিন্তু তার অঞ্চলে বসবাসী লোকেদের আবির্ভাবে। এই শেষোক্তরা ছিল ভূমিস্বত্ব থেকে বঞ্চিত। 'সর্বত্র আমরা দেখি আদিতে রাষ্ট্র চালনায় অংশ নিচ্ছে কেবল ভূমি-সম্পত্তির অধিকারী লোকেরা।... রাষ্ট্রীয় অধিকার আর ভূমি-সম্পত্তির মিলন ঘটল এই থেকে যে প্রথমে ছিল কেবল গ্রাম-সমাজের স্বত্ব, ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি নয়; ভূমি ছিল সমাজের অধিকারে, লোকেদের ব্যক্তিগত অধিকারে নয়, তাদের ভূমিখন্ড দেওয়া হত কেবল ব্যবহারের জন্য।... দাস ও বিজিতরা অবশ্যই গ্রাম-সমাজের বিজয়ীদের কাছ থেকে এধরনের ভূমিখন্ড পেত না, রাষ্ট্রশাসনেও অংশ ছিল না তাদের।' — মন্তব্য করেছেন চের্নিশেভস্কি।*

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পত্তিগত ভেদাভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে: 'একদল মালিক হল ধনী, আরেকদল গরিব, একদল হয়ে উঠল পরাক্রান্ত লোক, অন্যেরা দুর্বল, অসহায়'।** এর ফলে সমাজ পরিচালনায় অংশগ্রাহী লোকের সংখ্যা ভয়ানক কমে যেতে থাকে।

তাঁর যে উক্তিগুলি তুলে দেয়া হল, তা থেকে দেখা যাবে যে চের্নিশেভস্কি রাষ্ট্র গড়ে ওঠায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভূমিকা যথেষ্ট স্পষ্ট করে বোঝেন নি। রাষ্ট্র তাঁর কাছে সর্বাগ্রে শাসন সংগঠনের একটা নতুন রূপ, যে আত্মশাসনে উপজাতির সমস্ত সদস্য অংশ নেয়, তা থেকে সেটা পৃথক। রাষ্ট্রে মিলিত হয় সমপরিমাণে ভূমি-সম্পত্তির অধিকারী সমস্ত আদি অধিবাসী। এদিক থেকে রাষ্ট্র দাস ও বিজিতদের বিরুদ্ধে; এই শেষোক্তদের ভূমি-সম্পত্তি নেই। চের্নিশেভস্কির মতে, আদি অধিবাসীদের মধ্যে সম্পত্তিগত পার্থক্য দেখা দিতে থাকে রাষ্ট্র গঠিত হবার পর এবং তা কেবল শাসনের নতুন রূপটাকে জোরদার করতে সাহায্য করে।

সামাজিক বিরোধের বৃদ্ধিকে তিনি রাষ্ট্র উদ্ভবের কারণ বলে ধরেছেন, কিন্তু দর্শনে নরকৌলিক নীতি থেকে এগিয়ে তিনি প্রধান বিরোধ দেখেছেন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কে। তিনি বলেন, বহিঃপরিবেশের গঠন

মানবিক প্রয়োজন পুরোপুরি মেটায় না, 'গ্রহের সাধারণ জীবন ও মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মধ্যে অসামঞ্জস্য' আছে।* ভ. ইয়ে. এভ্গ্রাফভ যা বলেছেন, 'নরকৌলিক নীতি মনীষীকে প্রণোদিত করেছে সামাজিক বিরোধের মূল কারণ সমাজেরই অভ্যন্তরে নয়, তার বাইরে সন্ধান করতে, তাতে তাঁর যুক্তি একটা প্রকৃতিবাদী, অর্থাৎ শেষ বিচারে ভাববাদী ও আধিবিদ্যক চরিত্র লাভ করেছে।'**

রাষ্ট্র ও আইন উদ্ভবের চিত্র দিতে গিয়ে চের্নিশেভস্কি ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্কের ভিত্তিতে যে শ্রেণী বিরোধ বেড়ে উঠছিল তার সরাসরি বিশ্লেষণ করেন নি। তিনি সর্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করেছেন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন, 'স্বভাবের দিক থেকে মানুষ অন্যান্য লোকের হিতৈষী; তবে সবাই নিজেকেই ভালোবাসে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি। প্রত্যেকেই চায় নিজের প্রয়োজন মেটাতে; আর সমস্ত লোকের পরিতুষ্টির জন্য প্রকৃতি যে সম্পদ দেয়, দেখা যায় তা যথেষ্ট নয়; এ থেকে দেখা দেয় লোকেদের মধ্যে শত্রুতা, মানুষের প্রকৃতিগত হিতৈষায় ভাঙন। স্বার্থের সংঘাত পরিণামে এমন কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তনের আবশ্যিকতায় পেঁছিয় যা লোকেদের ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। প্রতিটি সমাজেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য, স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্কের জন্য, কোনো কোনো নীতি রক্ষার জন্য নিয়ম আবশ্যক। এইভাবে, দেখা দেয় রাজনৈতিক, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনকানুন।'**

একাধিক বার চের্নিশেভস্কি সরকারি (রাষ্ট্রিক) ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য আলোচনায় মন দিয়েছেন। 'সরকারের অনুজ্ঞায় সায় না থাকলেও এক-একজন ব্যক্তির পক্ষে তা মেনে চলার' বাধ্যতাকেই, সরকারের বাধ্যকরণী অধিকারকেই সাধারণত সরকারি ক্ষমতার প্রধান লক্ষণ বলে ধরা হয়। কিন্তু, মন্তব্য করেছেন চের্নিশেভস্কি, 'সরকারি ক্ষমতা হল সামাজিক ক্রিয়ার কেবল একটা রূপ,'**** তার অন্যান্য কিছু রূপেরও এই লক্ষণ আছে। একাধিক বার এই প্রসঙ্গে এসে তিনি বিশেষ করে বলেছেন যে এইসব অন্যাবিধ রূপের চরিত্র সম্পর্কে বিশদে আলোচনার সুযোগ না থাকায় তিনি কেবল এইটুকু মন্তব্যে

সীমাবদ্ধ থাকছেন যে সেগুলি সরকারি রূপ থেকে রীতিমতো পৃথক।*

রাষ্ট্র ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় চের্নিশেভস্কি দেখিয়েছেন যে এমনকি স্থানীয় পরিসরেও সরাসরি শাসন থেকে নাগরিককে অপসারণই তার চরিত্রলক্ষণ। 'সর্বকিছু চালায় রাজপুরুষ আর পুলিস নামধারী বিশেষ লোকেরা, নিজেদের উদ্ভব ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের দিক থেকে অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এক অঞ্চল থেকে আরেকটায় তারা যায় কেবল কেন্দ্রীয় ক্ষমতার মর্জি অনুসারে, কাজ করে তার হুকুম মতো, কেবল তার কাছেই জবাবদিহি করে।'** রাষ্ট্রে দেখা দেয় বিচারকদের স্বাধীন সম্প্রদায় আর বিশিষ্ট সামরিক সম্প্রদায়। 'কর ও রাজস্বের সঙ্গে রাষ্ট্রের ধারণার অনিবার্য যোগাযোগের' কথাতেও জোর দিয়েছেন চের্নিশেভস্কি।***

চের্নিশেভস্কি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যে রাষ্ট্র ও আইন উদ্ভবের প্রধান যেটা কারণ, প্রয়োজন ও তা মেটাবার উপায়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য, সেটার 'চরিত্র বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক'****। এই ভাবনা থেকে এগিয়ে তিনি রাষ্ট্র ও আইনের ঐতিহাসিক সীমা নির্ধারণ করেছেন। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং নিষ্প্রয়োজন বস্তুর উৎপাদন হ্রাস অনুসারে সমাজ জীবনে নতুন পরিস্থিতি দেখা দেয়। এরূপ সমাজে 'প্রতিটি উদ্ভূত প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটিয়েও বাড়তি উপায় থেকে যাবে; তখন অবশ্য তার জন্য কেউ ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না; তার বিলি ব্যবস্থা হবে বিশেষ কোনোরকম আইন ছাড়াই, যেমন বর্তমানে বিশেষ কোনো আইন ছাড়াই ব্যবহৃত হয় সমুদ্রের জল; যার ইচ্ছে সাঁতরাও, সবার জন্যে জায়গা আছে যথেষ্ট।'*****

সমাজ জীবনের নতুন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রক্ষমতার আবশ্যিকতাও ফুরিয়ে যাবে। 'দুনিয়ায় চিরন্তন কিছু নেই। কালক্রমে এমন জীবনযাত্রা দেখা দেবে যেখানে সরকার সম্পর্কে আমাদের বর্তমান যা ধারণা তেমন কিছু আদৌ থাকবে না, অথবা তেমন সামাজিক কার্যকলাপ হবে বর্তমানের চেয়ে অনেক কম।'*)

যা কিছু বলা হল তা থেকে সিদ্ধান্ত টানলে বলা যায় যে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তার ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ বিচার প্রসঙ্গে চের্নিশেভস্কি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। তিনি সঠিক মন্তব্যই করেছেন যে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে, যদিও লক্ষ্য করেন নি যে রাষ্ট্র দেখা দেয় সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়া প্রসঙ্গে; সঠিকভাবেই তিনি রাষ্ট্রের কতকগুলি লক্ষণ ব্যক্ত করেছেন যা আদিম সমাজে ক্ষমতার গঠন থেকে পৃথক; শেষত তিনি রাষ্ট্রহীন সমাজের সম্ভাবনার কথা বলেছেন যদিও রাষ্ট্রের শুকিয়ে ঝরে যাওয়াকে তিনি শ্রেণী বিলোপের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন নি।

রাষ্ট্র-আইন বিষয়ে চের্নিশেভস্কির দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা। 'রাষ্ট্র এবং তার সেবক সংস্থা — সরকারের উদ্ভব হল কেন?' জিজ্ঞাসা করেছেন মনস্বী।* এক্ষেত্রে কথাটা কোনো মূর্ত-নির্দিষ্ট রাষ্ট্র নিয়ে নয়, সাধারণভাবেই রাষ্ট্র নিয়ে। প্রশ্নটার এরূপ বিমূর্ত উত্থাপন এসেছে চের্নিশেভস্কির দর্শনের নরকৌলিক নীতি থেকে। রাষ্ট্র উদ্ভবের যে চুক্তি তত্ত্ব তখন ছিল বহুপ্রচলিত, তার সঙ্গে বিতর্কে তাঁর এই নরকৌলিক অভিমুখ বেশ প্রকাশ পায়। 'কেউ কেউ স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের প্রয়োজনের চেয়ে রাষ্ট্রের উচ্চতর আদর্শ কল্পনা করেন, যথা — ন্যায়, সত্য ইত্যাদি ভাবনার রূপায়ণ। কোনো সন্দেহ নেই যে অন্য যে তত্ত্বটা কেবল ব্যক্তিমানুষের উপকারের কথা বলে তার চেয়ে অনেক সহজে এরূপ নীতি থেকে রাষ্ট্রের ব্যাপক অধিকারের সিদ্ধান্ত এসে যায়, কিন্তু সাধারণভাবে আমরা এই অন্যটাই মানি, ভূগোলকে মানবিক ব্যক্তিসত্তার ঊর্ধ্বে কিছুই স্বীকার করি না।... আমাদের মতে, রাষ্ট্র রয়েছে ব্যক্তিমানুষের কল্যাণের জন্যে,' লিখছেন চের্নিশেভস্কি।**

প্রশ্নটার এরূপ উপস্থাপনে যে ঐতিহাসিকতা খণ্ডিত হয় সেটা চের্নিশেভস্কি কিছুটা বোঝেন। সরকারের উৎস ও উদ্দেশ্য হল 'ব্যক্তিসত্তার উপকার', এই মন্তব্য করে তিনি বলছেন যে এই উপকারের উদ্দেশ্যে চালিত রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের বিষয়বস্তু a priori*** নির্ধারণ করা চলে না, 'সব নির্ভর

করবে ঘটনাচক্রের ওপর'। তাঁর মতে, বর্তমান অবস্থায় 'তিনটি আবশ্যিকতা সমান জরুরি: জনগণের বৈষয়িক অবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার এবং ব্যক্তিগত স্বাবলম্বন বৃদ্ধি'।*

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রশ্নটির এরূপ উপস্থাপন সমগ্রভাবে ভাববাদী, তবে চের্নিশেভস্কির রচনায় এটি কাজে লাগানো হয়েছে শোষক রাষ্ট্রের সমালোচনার জন্য, যাতে তিনি দেখিয়েছেন তার জনবিরোধী চরিত্র।

যেমন, তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁর মতে, রাষ্ট্রের মর্মার্থ অনুসারে যেসব উদ্দেশ্য থাকার কথা, পরারাজতন্ত্র তা অনুসরণ করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পরারাজতন্ত্রের যুগে ফরাসি রাজারা 'রাষ্ট্রের... এমন ব্যবস্থা করেন যাতে সমস্ত জনগণ দিন কাটায় কেবল রাজদরবার ও দরবারী অভিজাতদের পালন করার জন্য।... কেবল অভিজাতরাই তাৎপর্যপূর্ণ, কেবল তারাই রাষ্ট্রক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করে।'** অস্ট্রীয় রাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতেও ছবিটা অনুরূপ।***

নিজের রচনায় তিনি রুশ পরারাজতন্ত্রের আসল চেহারা খুলে দেখাতে চেয়েছেন। যেমন, বিদেশে প্রকাশিত 'বিনা ঠিকানায় চিঠি'তে তিনি লিখেছেন যে রুশ স্বৈরতন্ত্রের অপরিবর্তনীয় নিয়ম ছিল 'অভিজাত সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভর করা।'**** একই চিন্তা আরো পকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'জমিদারের অধীনস্থ কৃষকদের নিকট তাদের হিতৈষীর অভিবাদন'এ। রাষ্ট্রের মর্মার্থের দিক থেকে যেসব উদ্দশ্য থাকার কথা, রুশ স্বৈরতন্ত্র যে তা অনুসরণ করে না, এ কথা তিনি ছদ্মাকারে বলেছেন 'সভ্রেমেন্নিক' পত্রিকার পাতায়।*****

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জনবিরোধী গণতন্ত্রবিরোধী মর্মার্থ চের্নিশেভস্কি বুঝেছিলেন। তিনি বলেন যে, 'কেবল স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেই নয়, ইংলন্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জনগণের ইচ্ছা বা অংশগ্রহণ ব্যতিরেকেই কেবল উচ্চ ও মধ্য সম্প্রদায়ের পার্টি থেকে অনুমোদন বা সমালোচনা পেয়েই সরকার বহু আইন ও অনুজ্ঞা জারি করতে পারে'।*) চের্নিশেভস্কি দেখান যে ইংলন্ডে 'পার্লামেণ্টী শাসনের চমৎকার নাটক প্রায় অনবরতই

পরিণত হয় নিছক প্রহসনে'।* কমন্স সভার সভ্যদের 'চিন্তার ধারা জনগণের ইচ্ছা থেকে বহু পিছিয়ে আছে'।** বুর্জোয়া রাষ্ট্রে 'সরকার সৈন্যবাহিনী রাখে বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা ভেতরকার শত্রুর বিরুদ্ধে নির্ভরস্থল হিশেবে'।***

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কপটতা ও ভণ্ডামিদেখালেও চের্নিশেভস্কি সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রামে তার তাৎপর্য নাকচ করেন নি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমস্যাটার উপলব্ধিতে তিনি মোটেই চট করে পৌঁছে গেছেন এমন নয়। যেমন, ১৮৫৭ সালে তিনি, মনে হয়, ধরে নিয়েছিলেন যে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব হতে পারে অতি বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে। নিরঙ্কুশ রাজারা, ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজা, মার্কিন গণতন্ত্রীরা 'সবাই সমানভাবে অনুমোদন করেছে রবার্ট ওয়েনকে'। 'সমিতির নীতি মূলত আদৌ রাজনৈতিক ব্যাপার নয়, নিছক অর্থনৈতিক... বাণিজ্যের মতো, কৃষির মতো তা শুধু একটা জিনিস দাবি করে: নিশ্চিন্তি, শান্তি, শৃঙ্খলা — প্রতিটি উত্তম সরকারের আমলে বিদ্যমান মঙ্গল, তা সে সরকারের রূপ যাই হোক,' সে সময় এই ছিল চের্নিশেভস্কির চিন্তা।****

পরে তিনি তাঁর মত বদলান। ১৮৫৯-১৮৬২ সালে 'সভ্রেমেন্নিক'এর পাতায় তিনি ঘন ঘনই রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার গুরুত্বে জোর দিয়েছেন। 'জমিদারের চাষিদের নিকট হিতৈষীর অভিবাদন' ঘোষণায় তিনি রাজনৈতিক দাবি উত্থাপন করেছেন সুসঙ্গত ধারায়। 'দুনিয়ায় মুক্তি হল এইরকম: জনগণ যেন হয় সবকিছুর কর্তা, প্রতিটি রাজপুরুষ যেন লোক সমাজের আজ্ঞা মানে, বিচার যেন হয় ন্যায্য, সকলের পক্ষে সমান, চাষির ওপর অত্যাচার করার স্পর্ধা যেন কারো না হয়, পাসপোর্ট যেন না থাকে, মাথাপিছু কর যেন না বসে, জবরদস্তি সৈন্যভুক্তি যেন না চলে,' লেখা হয়েছিল ঘোষণায়। জারের বদলে 'জনগণের নির্বাচিত মণ্ডল-প্রধান' প্রবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন চের্নিশেভস্কি। তিনি লেখেন: 'এটা বলা দরকার যে জনগণের মণ্ডল-প্রধান যখন বংশগত হয় না, একটা মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়, তাকে জার বলা হয় না, স্রেফ সে মণ্ডল-প্রধান, অথবা

অন্যভাবে, বিদেশী ভাষায় যাকে বলা হয় প্রেসিডেন্ট, তখন জনগণের দিন কাটবে ভালো, লোকে ধনী হবে।'*

অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না, এই নীতির ভিত্তিতে যে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক উদারনৈতিকতা প্রচলিত ছিল, চের্নিশেভস্কির একাধিক রচনায় তার সমালোচনা করা হয়েছে। এই ধারণাকে আক্রমণ করেছেন চের্নিশেভস্কি এবং দেখিয়েছেন যে তা পুঁজিপতিদের ভাবাদর্শের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে, ধনীদের দ্বারা গরিবদের অন্তহীন শোষণকে সমর্থন করে। তিনি দেখিয়েছেন যে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের না-হস্তক্ষেপের ধারণা একটা অলীকতা, আসলে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক প্রশ্নে অসাধারণ সক্রিয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজের ধারণা থেকে এগিয়ে তিনি বলেছেন: 'অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রত্যক্ষ প্রভাব না ফেলে রাষ্ট্র পারে না। সুবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ যেসব ক্রিয়াকলাপ দাবি করে তা কেবল রাষ্ট্রের অধিকার নয়, তার প্রত্যক্ষ কর্তব্যও।'** এই হস্তক্ষেপের ধারা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে চের্নিশেভস্কির 'পুঁজি ও শ্রম' প্রবন্ধে। বিশেষ করে তিনি বলেছেন মেহনতিদের শ্রম সমিতির সংগঠন, পরিচালন ও অর্থ সংস্থানে রাষ্ট্রের যে ভূমিকা নেওয়া উচিত তার কথা। প্রবন্ধের শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন যে সমিতির 'সহজ ও সাধারণ কথাটা' আজ অবধি 'কার্যকৃত হয় নি এবং খুব সম্ভব বহুদিন হবেও না।'*** তার কারণ সম্পর্কে তিনি বারান্তরে আলাপ করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, তবে 'সভ্রেমেন্নিক'এর পাতায় সে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। যতদূর মনে হয়, শোষক সমাজের পরিস্থিতিতে সমিতির প্রকল্প কার্যকর হবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল না; সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ধারা বর্ণনার চেষ্টা করেছিলেন তিনি এ প্রকল্প রচনার সময়ে। এটা বৈশিষ্ট্যসূচক যে 'অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও আইনপ্রণয়ন' প্রবন্ধে তিনি এই মন্তব্য করা আবশ্যক জ্ঞান করেছিলেন যে অর্থনৈতিক প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ধারা ও সম্ভাবনা 'অসাধারণ নির্ভর করে রাষ্ট্রক্ষমতার চরিত্রের ওপর।'****

কৃষক বিপ্লবের পক্ষ নিলেও তার বিজয়ের অবিলম্ব পরেই সমাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন নি তিনি। পুরনো সমাজব্যবস্থা থেকে নতুনে 'উৎক্রমণমূলক অবস্থার' প্রয়োজনীয়তা তিনি মানতেন। এই পর্বে রাষ্ট্রের ভূমিকা তাঁর কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল।

সমাজজীবনের একটা নিয়মবদ্ধতা তিনি এই দেখেছিলেন যে 'সামাজিক ব্যবস্থার এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও সরকারি ক্ষমতার রক্ষণ ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।'* উৎক্রমণমূলক অবস্থাতেও তিনি এই নিয়মবদ্ধতাকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

বিপ্লবের গতিপথে উত্থিত রাষ্ট্রই জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে তা কৃষক গ্রাম-সমাজের হাতে তুলে দেয়। 'পুঁজি ও শ্রম' প্রবন্ধের বিশ্লেষণ থেকে এ কথা মনে করবার কারণ থাকে যে চের্নিশেভস্কি ভেবেছিলেন যে এই রাষ্ট্র শিল্প-কৃষি সমিতির জন্য অর্থ জোগাবে এবং প্রথম দিকে (একবছর ধরে) তার পরিচালনা করবে।** সমিতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গড়ারও পরিকল্পনা ছিল তাঁর।

এইভাবে খুবই সাধারণ রূপরেখায় হলেও উৎক্রমণমূলক পর্যায়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটা চেহারা দিয়েছেন চের্নিশেভস্কি। 'উৎক্রমণমূলক অবস্থায়' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি। তাহলেও চের্নিশেভস্কির সঙ্গতিপরায়ণ গণতান্ত্রিকতা, বিপ্লবের বিজয়ের পর 'সবচেয়ে দরিদ্র ও সংখ্যাবহুল শ্রেণী — কৃষক+দিনমজুর+শ্রমিকদের হাতে' ক্ষমতা তুলে দেবার প্রয়াস***, আঠারো শতকের ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস, বিশেষ করে জ্যাকোবিন একনায়কত্বের পর্বে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ, ইত্যাদি থেকে এ কথা মনে করার কারণ আছে যে বৈপ্লবিক জনগণের হাতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ার হিশেবে রাষ্ট্রের তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন না।

এ প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এমন কিছু চিত্তাকর্ষক উক্তি চের্নিশেভস্কি করেছিলেন ১৮৫৯-১৮৬০ সালের ইতালীয় বিপ্লবের ঘটনাবলি প্রসঙ্গে। তিনি বলেন যে বিপ্লবী সরকারের সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল প্রস্তাবিত কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য জোরালো ব্যবস্থা, তা সত্যই কার্যকর করার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তাতে দ্বিধা না করা। তিনি

মন্তব্য করেন: 'শান্তির সময়ে যে ব্যবহারশাস্ত্রীয় ন্যায় লক্ষিত হয় তাকে লঙ্ঘন করে বিধিবহির্ভূত ঘটনা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক ওলটপালট কখনো ঘটে নি।... যে ব্যক্তি রাজনৈতিক বিপ্লবে এই ভেবে অংশ নেয় যে তাতে শান্তিকালীন ব্যবহারশাস্ত্রীয় নীতি বহুবার লঙ্ঘিত হবে না, তাকে বলা উচিত আদর্শবাদী।'*

গণতন্ত্র বিকাশের প্রবণতা অনুধাবনে চের্নিশেভস্কি বেশ মন দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য হল স্বশাসন ও ফেডারেশন নীতির সুসঙ্গত অনুসরণ**, পরে এ নীতিগুলি বিলুপ্ত হয়। তবে, মনীষী মনে করেছেন, বিকাশ চলে বৃত্তাকারে, আমাদের কালে স্বশাসন ও ফেডারেশনের পুনর্জন্ম হচ্ছে সুইজারল্যান্ড ও উত্তর আমেরিকায়।*** চের্নিশেভস্কি দৃঢ়ভাবে আপত্তি করেন ব. ন. চিচেরিনের মতে, যিনি মনে করেন 'গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের অনুরূপ এই দিক থেকে যে তা আমলাতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতা খুবই ভালোবাসে'।****

চের্নিশেভস্কি দেখান যে 'চরিত্রগতভাবেই গণতন্ত্র আমলাতন্ত্রের বিপরীত; তা দাবি করে যেটা কেবল তার নিজের ব্যাপার তাতে প্রতিটি নাগরিক থাকবে স্বাধীন; যেটা কেবল তার ব্যাপার তাতে প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি নগর স্বাধীন, প্রতিটি অঞ্চল নিজের ব্যাপারে স্বাধীন। গণতন্ত্র দাবি করে যে প্রশাসক যে এলাকার ব্যাপারে ব্যাপৃত তার অধিবাসীদের বশবর্তী হবেন তিনি।'*****

ফেডারেল নীতির সুসঙ্গত পক্ষাবলম্বন করেন চের্নিশেভস্কি।

'গণতন্ত্র দাবি করে স্বশাসন এবং তাকে নিয়ে যায় ফেডারেশনে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল প্রজাতন্ত্রগুলির সংঘ, অথবা বলা ভালো, তা এমনভাবে গড়ে ওঠে স্তরে স্তরে গঠিত কয়েকটি প্রজাতান্ত্রিক সংঘ দিয়ে, যাতে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিটি সংঘই আবার কয়েকটি করে অঞ্চল নিয়ে গঠিত,' — লিখেছেন চের্নিশেভস্কি।*)

প্রুধোঁ ও বাকুনিনের ফেডারেলপন্থার সঙ্গে চের্নিশেভস্কির ফেডারেল

নীতির কোনো মিল নেই। রাষ্ট্রের এক-একটা অংশের স্বাধীনতার পক্ষ নিলেও চের্নিশেভস্কি সেই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে ফেডারেশনের অংশীদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে এবং সঙ্ঘ-রাষ্ট্রের নামে এগিয়ে আসতে সক্ষম একটা যথেষ্ট শক্তিশালী সাধারণ রাষ্ট্রক্ষমতার প্রয়োজন আছে।*

এ কথা মনে করার খুবই কারণ আছে যে স্বশাসন আর ফেডারেশনের প্রশ্নে চের্নিশেভস্কির বিশ্লেষণ সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রপাট নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে জড়িত। মনে হয়, তাঁর ধারণায়, এই নীতিগুলিই হবে ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি।

চের্নিশেভস্কির বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গুরুদের কাছ থেকে সমুচ্চ সমাদর লাভ করেছে। কার্ল মার্কস তাঁকে বড়ো দরের রুশ পণ্ডিত বলে গণ্য করেছেন।** লেনিন তাঁকে অভিহিত করেছেন মহান রুশ বিপ্লবী***, প্রাক্-মার্কসীয় যুগের মহান রুশ সমাজতন্ত্রী বলে****।

রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে খুবই বড়ো একটা স্থান নিয়েছে চের্নিশেভস্কির রাজনৈতিক তত্ত্ব। লেনিন এই কথায় জোর দিয়েছেন যে চের্নিশেভস্কি 'গের্ৎসেন থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছেন। চের্নিশেভস্কি ছিলেন অনেক বেশি সঙ্গতিপরায়ণ ও জঙ্গী গণতন্ত্রী। তাঁর রচনায় শ্রেণী সংগ্রামের হাওয়া বয়'*****।

অবজেকটিভ শ্রেণী মর্মার্থের দিক থেকে চের্নিশেভস্কির রাজনৈতিক তত্ত্ব হল বিপ্লবী কৃষক গণতন্ত্রের তত্ত্ব। প্রাক্-প্রলেতারীয় বিপ্লবী চিন্তায় তা একটা উচ্চতম কৃতিত্ব।

চের্নিশেভস্কির রাজনৈতিক তত্ত্ব রাশিয়ায় মার্কসবাদের পথ করে দেয়। নিপীড়িত শ্রেণীগুলির আঘাতে পুরনো দুনিয়ার ধ্বংস অনিবার্য, এই মর্মে তাঁর মতবাদ ছিল ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিকে একটা বড়ো পদক্ষেপ।

চের্নিশেভস্কি এবং তাঁর সহযোদ্ধারা ছিলেন রুশ বৈপ্লবিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অগ্রদূত। লেনিন লিখেছেন: '৬১ সালের বিপ্লবীরা ছিলেন নিঃসঙ্গ এবং দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে তাঁদের। কিন্তু আসলে তাঁরাই ছিলেন সে যুগের মহান কর্মযোগী, সে যুগ থেকে আমরা যত সরে যাচ্ছি, ততই পরিষ্কার হয়ে উঠছে তাঁদের মহিমা।'*



পঞ্চম অধ্যায়

রুডল্ফ ইয়েরিঙ্গ

রুডল্ফ ইয়েরিঙ্গ (১৮১৮-১৮৯২) বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রের ইতিহাসে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি*। রোমক আইন, নাগরিক আইন, আইনের দর্শন বিষয়ক মূর্ত-নির্দিষ্ট মালমশলা থেকে ইয়েরিঙ্গ আইনের মর্মার্থ, তার সামাজিক ভূমিকা ও কর্তব্যের মূল প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁর তাত্ত্বিক নির্মিতি ছিল আইনপ্রণয়ন (সর্বাগ্রে

* ইয়েরিঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ রচনা: বিকাশের বিভিন্ন স্তরে রোমক আইনের মর্ম। খণ্ড ১-৩ (১৮৫২-১৮৫৪); আইনের জন্য সংগ্রাম (১৮৭২); আইন-অন্তর্গত লক্ষ্য। খণ্ড ১-২ (১৮৭৭-১৮৮৩)।

নাগরিক আইন), বুর্জোয়া আইনী রাষ্ট্রপাটে সাংবিধানিক ভিত্তি উন্নয়নের অভিমুখে।

ইয়েরিঙ্গের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন শুরু হয় আইনের ঐতিহাসিক স্কুল এবং রোমক আইনের ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলির নিয়ে সমালোচনা থেকে। যে যুগে জার্মানির সামনে আসে রাষ্ট্রের সচেতন ও লক্ষ্যনিষ্ঠ আইনপ্রণয়নী ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বুর্জোয়া আইনের একটা বিকশিত ও সুসমঞ্জস ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ, তখন কোডবদ্ধতার বিরোধী, আইনের 'স্বাভাবিক' উদ্ভবের পক্ষপাতী আইনের ঐতিহাসিক স্কুল সমালোচনার মুখে পড়ে। ইয়েরিঙ্গ যে রোমক আইনের ইতিহাস ও গঠন বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন, সেটা অকারণে নয়। কার্ল মার্কসের কথায়, রোমক আইন ছিল '...যে সমাজে নিছক ব্যক্তিগত মালিকানার আধিপত্য, সেখানকার জীবন-পরিস্থিতি ও সংঘাতের ক্ল্যাসিক ব্যবহারশাস্ত্রীয় অভিব্যক্তি'*, উনিশ শতকে তা হয়ে দাঁড়ায় বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রীদের প্রগাঢ় আগ্রহের বিষয়, আইনের বুর্জোয়া শাখা ও তদুপযোগী অনুরূপ আইনী বোধের ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিক নিদর্শন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্যক্তিগত আইন বিষয়ক বুর্জোয়া প্রথার পূর্ণীকরণ জার্মানিতে হয়ে দাঁড়ায় খুবই জরুরি একটা প্রশ্ন। সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে প্রবল সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের অস্তিত্ব মেনে নিলেও ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক জের জার্মান বুর্জোয়ারা চাইছিল না ও মানতে পারছিল না। সাধারণ আইনের ভিত্তি হিশেবে ইয়েরিঙ্গ যে ব্যক্তিগত আইনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, সেটা অকারণে নয়। তাঁর কালের আইনী বিকাশের প্রয়োজনের থেকে রোমক আইনের পর্যালোচনাতেই সেই সব আবিষ্কার দেখা দেয় যা বুর্জোয়া দৃষ্টবাদী ব্যবহারশাস্ত্রে ইয়েরিঙ্গের অবদান।

আইনের বুর্জোয়া তত্ত্বে দৃষ্টবাদ দেখা দেয় (শুধু জার্মানিতে নয়, অন্য দেশেও) প্রথমত, এমন একটা ব্যবহারশাস্ত্রীয় চিন্তা-ধারা হিশেবে যা বলবৎ আইনের ব্যবস্থা নিয়ে ভাবিত, যাতে সবচেয়ে কম ফাঁক রেখে আইনের 'ব্যবহারিকভাবে উপযোগী' আদর্শগুলি বিধৃত থাকবে। ব্যবহারিক আইনপ্রণয়নে এই লক্ষ্য সাধন করে কোডবন্ধন এবং তত্ত্বের ক্ষেত্রে আইনী নির্মিতির সুসমঞ্জস যুক্তিসিদ্ধি। যতটা সম্ভব ফাঁক না রেখে আইনের একটা ব্যবস্থা রচনা ছিল বুর্জোয়া আইনবিদদের সামনে একটা ব্যবহারশাস্ত্রীয়-

টেকনিকাল কাজ। 'প্রণালীবদ্ধ বা যুক্তিসিদ্ধ নির্মিতিকে' ইয়েরিঙ্গ বলেছেন 'আইনের অ-আ-ক-খ'।

দ্বিতীয়ত, আইনের দৃষ্টবাদী তত্ত্বের বেশ সারগর্ভ রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক তাৎপর্য ছিল। এ দিক দিয়ে আইনী ব্যবস্থার উন্নয়নের অর্থ ছিল সর্বাগ্রে বুর্জোয়া ব্যক্তিসত্তার অধিকারের প্রসার, সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের বিপরীতে সমাজে আইনের ভূমিকা বৃদ্ধি। এই অর্থেও প্রাচীন রোমের রাষ্ট্রিক-আইনী জীবনের সংগঠন বহু দিক থেকে জার্মান বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল। তাঁর প্রথম বৃহৎ রচনা — 'বিকাশের বিভিন্ন স্তরে রোমক আইনের মর্ম' গ্রন্থে ইয়েরিঙ্গ ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আইনকে দেখেছেন প্রাচীন রোমের সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিশেবে এবং রোমক সমাজজীবনে আইনী প্রেরণার তাৎপর্যে জোর দিয়েছেন। অন্য কথায়, আইনবিদ্যায় দৃষ্টবাদ দেখা দেয় আইনের বুর্জোয়া রাজনৈতিক অন্তঃসার প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে আইনের ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা হিশেবেও (তদুপযোগী দার্শনিক-পদ্ধতিবিদ্যাগত অবস্থান থেকে)। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে আইন গবেষণায় উক্ত যুক্তিবিদ্যা-আইনী ও সমাজবিদ্যা-আইনী উভয় অভিগমনই পারস্পরিক সম্পর্কে প্রকাশ পেয়েছে এবং দুয়েতেই প্রতিফলিত হয়েছে ইয়েরিঙ্গের দৃষ্টবাদী পদ্ধতিবিদ্যাগত প্রবণতা।

সামাজিক বিজ্ঞানে দৃষ্টবাদী দর্শন ও পদ্ধতি নিজেই প্রণোদিত হয়েছে বুর্জোয়া সামাজিক-রাজনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন থেকে এবং তা বুর্জোয়া রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষার সেই পর্যায়ের অনুসারী যখন তা আর সামাজিক বিজ্ঞানের বোধ ও হাতিয়ার সংরচন ও ব্যবহার না করে পারছে না। 'বাস্তব ঘটনার' দিকে দৃষ্টবাদের ঝোঁক, 'মোহ' আর 'অধিবিদ্যার' সমালোচনা চালিত হয় সামাজিক রূপ সম্পর্কে অচল হয়ে পড়া সামন্ততান্ত্রিক ধারণাদির বিরুদ্ধে, নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি সৃষ্টির জন্য, যাদের বিচক্ষণতা ও উপযোগিতা প্রমাণ করা যাবে 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতিতে।

কিন্তু নিজের ব্যবহারশাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক-আইনী গবেষণার ভিত্তিতে ইয়েরিঙ্গ যে দার্শনিক-পদ্ধতিবিদ্যাগত ধারণা অনুসরণ করেছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট সূত্রায়ণ ছিল না। তাঁর দার্শনিক-পদ্ধতিবিদ্যাগত যাত্রাবিন্দু ছিল খুবই বিচিত্ররূপী ও পাঁচমিশেলি। এই সব অবস্থান খুবই প্রভাবিত হয়েছিল এই ঘটনাচক্রে যে ইয়েরিঙ্গ দিন

কাটিয়েছেন প্রকৃতিবিদ্যার প্রখর বিকাশের যুগে যা প্রতিফলিত হয় সমাজের আঙ্গিক ধারণার প্রসারে, সেই সঙ্গে দর্শনের হেগেলীয় স্কুলের সংকটও ছিল।

ইয়েরিঙ্গের মূর্ত-নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দার্শনিক-পদ্ধতিবিদ্যাগত ভিত্তিটাকে বলা যেতে পারে একধরনের স্বতঃস্ফূর্ত দৃষ্টবাদ, যা তিনি আহরণ করেছিলেন বড়ো বড়ো রোমবিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক (গিবন, মমজেন) আর সেই সঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতিনিধিদের (হেককেল) রচনা থেকে। তাঁর সৃজনকর্মের দ্বিতীয়ার্ধে ইয়েরিঙ্গের ওপর খুবই প্রভাব ফেলে শোপেনহাওয়ার আর ট্রেন্ডেলেনবার্গের পরমকারণবাদ (teleology)। সেই সঙ্গে হেগেলের সামাজিক দর্শন এবং উপযোগিতাবাদের নৈতিকতার প্রভাবও তিনি অনুভব করেছিলেন।

বাহ্যিক যৌক্তিক পদ্ধতির বিপরীতে ইয়েরিঙ্গ তাঁর পরমকারণবাদী পদ্ধতিকে উপস্থিত করেন 'বাস্তব' বলে, বলেন যে আইনের ক্ষেত্রে যুক্তির আধিপত্য হল 'জবরদখলের ফল'। অন্যদিকে, আবার আইন তাঁর কাছে 'বুদ্ধি' বা 'মানুষের অন্তর্নিহিত একটা নীতির' রূপায়ণ নয়, ব্যবহারিক সামাজিক লক্ষ্য সাধনের উপায়। তিনি দেখান যে আইন আত্মমুখী চেতনার সঙ্গে মিলে যায় না, ব্যাপারটার ওপরটা ছাড়িয়ে তার মর্ম, ঘটনাদির অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক দেখার ডাক দেন তিনি।

বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রের বিকাশের ইয়েরিঙ্গের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য, বলাই বাহুল্য, তাঁর দৃষ্টবাদী-পরমকারণবাদী ঝোঁকে নয়, সেটা এইখানে যে আইনের রূপের বিকাশে তিনি তাদের ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতা দেখাতে পেরেছিলেন। এতে করে তিনি আইনের তত্ত্বে অন্যান্য দৃষ্টবাদী — পোস্ট আর ম্যুল্লেরের থেকে বেশ পৃথক, যাঁরা যান্ত্রিকভাবে আইনের ওপর চাপাতে চেয়েছিলেন নিষ্প্রাণ প্রকৃতির নিয়ম*।

আইনের জার্মান বুর্জোয়া তত্ত্বের বিকাশে ইয়েরিঙ্গের তাৎপর্য হল এই যে তিনি বুর্জোয়া আইনী ভাবাদর্শের তিনটি প্রধান ধারার অর্জনকে মিলিত করেছিলেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে, অবদান যোগ করেছেন তাদের প্রত্যেকটিতে: আইনী নির্মিতির যুক্তি, আইনের সামাজিক প্রকৃতি এবং তার নৈতিক ভিত্তি, অর্থাৎ আইনের দর্শনের গবেষণায়। এতে করে তিনি চেষ্টা করেছেন আইন সম্পর্কে একটি একক মতবাদ রচনার, দেখাতে

চেয়েছেন আইনের মূলসূত্র আর সামাজিক-ঐতিহাসিক ও নৈতিক প্রকৃতি বিষয়ে মতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বিশেষ করে তীব্র সমালোচনা করেছেন তথাকথিত 'বোধের ব্যবহারশাস্ত্রকে' এই জন্য যে তা আইনের বাহ্যিক মূলসূত্রের দিকটাকে অতিপুষ্ট করেছে। জার্মানিতে আইনের নতুন বুর্জোয়া তত্ত্ব, সমাজবিদ্যা ও দর্শনের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি, এই তিনটি ধারার পরবর্তী বিকাশে খুবই প্রভাব ফেলেছিলেন।

ইয়েরিঙ্গের মূর্ত-নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক-আইনী দৃষ্টিভঙ্গির কালানুক্রমিক বিবর্তনের পর্যালোচনা করা যাক। মনে রাখতে হবে যে এই বিবর্তনে প্রতিফলিত হয়েছে জার্মানিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আইনের বুর্জোয়া তত্ত্ব, সমাজবিদ্যা ও দর্শনের রূপলাভ ও পরিপক্কতা।

এই ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ যে রোমবিশেষজ্ঞ হিশেবে নিজের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ শুরু করার পর ইয়েরিঙ্গ ক্রমেই রোমক আইনের 'সাধারণ' বা 'সর্বমানবিক' উপাদানে জোর দিতে থাকেন, যেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাভিনি রোমক আইনের কেবল 'জাতীয়' মর্মটা তুলে ধরেছিলেন। তাহলেও সাভিনির শিষ্য হওয়ায় ইয়েরিঙ্গ মনে করতেন যে আইনের জ্ঞানের জন্য তার ইতিহাস আর উদ্ভবের কথাও জানতে হবে। আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের তীব্র সমালোচনা করলেও এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে 'বিকাশের বিভিন্ন স্তরে রোমক আইনের মর্ম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (১৮৫২) ইয়েরিঙ্গ উৎসর্গ করেছিলেন গ. পুখতাকে। সত্যিই, রোমক আইনের ইতিহাস অধ্যয়নে, তাতে বর্তমান কালের পক্ষে উপযোগী এমন কিছুর সন্ধানে ঐতিহাসিক স্কুল কম প্রেরণা জোগায় নি।

রোমক আইন ও রাষ্ট্রের বিকাশের ইতিহাসে ইয়েরিঙ্গ দেখেছেন আইন ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা। পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি সোজাসুজি উল্লেখ করেছেন যে তিনি 'আইনের সাধারণ বিকাশের আত্মিক সংযোগের' সন্ধানী, তাঁর লক্ষ্য 'রোমক আইন নয়, সাধারণভাবেই আইন, যাকে অনুধাবন ও জাজ্বল্যমান করা হয়েছে রোমক আইন অবলম্বনে'। 'অন্য কথায়,' লিখেছেন তিনি, 'আমার কাজটি আইনের ইতিহাসের চেয়ে বরং তার দর্শন ও মূলসূত্রের অন্তর্গত।'*

এইভাবে ইয়েরিঙ্গ রোমক আইন নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে আইনের বৈজ্ঞানিক অনুধাবনের পথ সন্ধান করেছেন, তবে অন্যদিকে, রোমক আইনের নীতিগুলিতে তিনি খুঁজেছেন তাঁর সমকালীন জার্মান আইনী ব্যবস্থার পূর্ণতা সাধনের মডেল। 'রোমক আইনের পথ ধরে চলা, কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া, তা থেকে সিদ্ধান্ত টানা — এই হল নীতিসূত্র যাতে আমার কাছে নতুন দুনিয়ার পক্ষে রোমক আইনের তাৎপর্য নিহিত।'* রোমক আইনের বর্গ ও প্রতিষ্ঠানের রীতি ব্যবহার করে তিনি প্রথমে চেষ্টা করেছেন তাঁর সমকালীন নাগরিক আইনের বোধগুলিকে পরিচ্ছন্ন করে নেবার জন্য। এই প্রসঙ্গে তিনি খুবই মন দিয়েছেন রোমক আইনের উৎসগুলি এবং ব্যবহারশাস্ত্রীয় টেকনিকে যার তাৎপর্য ছিল ব্যক্তিগত আইনের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে। রোমক আইনের ইতিহাসের মালমশলা তিনি পরে কাজে লাগান আইন-অন্তর্গত লক্ষ্য, অর্থাৎ আইনের সামাজিক ও নৈতিক প্রকৃতির অধ্যয়ন গভীর করে তোলার জন্য। ইয়েরিঙ্গ যা মন্তব্য করেছেন, বেনথাম অনুসরণে তিনি আইনী দেহসত্তার শুধু শারীরস্থান (অর্থাৎ যৌক্তিক) নয়, শারীরবৃত্তও পর্যবেক্ষণের কর্তব্য নিয়েছেন**। 'আইনের সত্যকার গুণ হল তার কর্মনির্বাহে, অর্থাৎ তার ব্যবহারিক যোগ্যতায়।'*** 'সমস্ত আইন রয়েছে সমাজের জন্য,' — এই হল ইয়েরিঙ্গের তত্ত্বের আবহমান প্রসঙ্গ। নিখুঁতভাবে তিনি ধরতে পেরেছিলেন জার্মান সমাজের বুর্জোয়া বিকাশের জন্য কী প্রয়োজন এবং 'সাধারণ কল্যাণের' অনুজ্ঞা হিশেবে সে প্রয়োজনটাকে করে তোলেন যেমন আইনের প্রকৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে, তেমনি আইনী ব্যবস্থার ব্যবহারিক পূর্ণতা সাধনের প্রধান যুক্তি। রোমক আইনের বিকাশ, গঠন ও প্রথার ইতিহাস নিয়ে গবেষণাকে তার নিজস্ব মূল্য ছাড়াও তিনি কাজে লাগিয়েছেন সেই যুক্তিবিস্তারের রূপ হিশেবেও। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিজের 'মালিকানার সামাজিক তত্ত্ব' সূত্রবদ্ধ করতে গিয়ে এবং 'মালিকানা বিদ্যমান কেবল সম্পত্তিমালিকের জন্য নয়, সমাজের জন্যও'****—এই কথায় জোর দিয়ে ইয়েরিঙ্গ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন প্রাচীন রোমে সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি নিয়ামনের কথা।

ইয়েরিঙ্গের আইনের সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে ছিল এই ধারণা যে আইন হল সমাজের এমন একটা কাজ যা তার 'আত্মসংরক্ষণের' জন্য আবশ্যক। তাঁর কাছে আইন নিজেও — তার উদ্ভব ও রূপায়ণের নিয়মবদ্ধতায় একটা দেহযন্ত্র। আইনী দেহযন্ত্রটা, তাঁর মতে, তিনটি অংশে গঠিত: আইনী প্রস্তাব, আইনী বোধ এবং তার মনস্তাত্ত্বিক সংগঠন*, যেগুলিতে প্রতিফলিত হয় আইনের ক্রমাগত জটিল সংগঠন। রোমক আইনের উদ্ভবের ইতিহাস অনুধাবন করে তিনি লিখেছেন যে প্রথম ঐতিহাসিক ধাপে ছিল শক্তি ও স্বেচ্ছাচারের প্রভুত্ব। তার পরে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, 'আত্মচালনার' রূপ হিশেবে সালিশ এবং বিচারবহির্ভূত শপথ আইনের কাছে পথ ছেড়ে দেয়, তবে তার ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত আবর্তনের বিকাশ, আইন বিকশিত হতে থাকে প্রথমে ব্যক্তিগত আইন হিশেবে। 'ব্যক্তির ইচ্ছার নীতি ছিল রোমক ব্যক্তিগত আইনের আদি উৎস।'** রোমক রাষ্ট্র তো দেখা দিয়েছিল পরিবার ও কুলে সংগঠিত রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকদের সমষ্টি হিশেবে; সেই কারণে রাষ্ট্রেরও ছিল কৌলিক ও পিতৃতান্ত্রিক চরিত্র। রাষ্ট্রের নাগরিকেরা, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকে এবং জনগোষ্ঠী হিশেবে সবাই একত্রে ছিল সাধারণ অধিকারভোগী। রাষ্ট্র এখানে এগিয়ে আসে সমস্ত নাগরিকের চুক্তিমূলক সংগঠন হিশেবে এবং 'রাষ্ট্রীয় আদান-প্রদান' আসে 'চুক্তিমূলক সম্পর্ক' হিশেবে। 'রাষ্ট্রের অভিলাষ হল সমস্ত নাগরিকের অভিলাষ, আইন হল চুক্তি'*** এইভাবে, ইয়েরিঙ্গের মতে, সাধারণ আইন এসেছে ব্যক্তিগত আইন থেকে।

উনিশ শতকের জার্মান ব্যবহারজীবীদের মধ্যে রোমক আইন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জনপ্রিয়তার কারণ হল এটা ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সিদ্ধান্তে জনগণের কিছু পরিমাণ অংশগ্রহণ এবং সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রচণ্ড সংকোচনের ভিত্তিতে গঠিত একটা প্রবল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্ল্যাসিক দৃষ্টান্ত। শক্তি, শৃঙ্খলা, ঐক্য' — এই হল, ইয়েরিঙ্গের মতে, রোমক রাষ্ট্রব্যবস্থার নীতি। সেই সঙ্গে এই মডেল ইয়েরিঙ্গকে আকৃষ্ট করেছে এই জন্য যে রোমকদের কাছে রাজনীতি আইনের নীতিতে বাঁধা বলে স্বীকৃত'****।

আইন ছিল নগ্ন শক্তির বিপরীত। রোমক আইনকে ইয়েরিঙ্গ উদ্ঘাটিত করেছেন 'স্বার্থপরতার ধর্ম' বলে, আর রোমক চরিত্র হল 'সুশৃঙ্খল স্বার্থপরতার' একটা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় আইনের স্থান সর্বাগ্রগণ্য। অন্যদিকে, সমস্ত রোমক আইন উপযুক্ততার — যেমন ব্যক্তি, তেমনি রাষ্ট্রের স্বার্থ সাধনের প্রেরণায় বিধৃত। ব্যক্তির স্বার্থ আর রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল জার্মান বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের কাছেও আদর্শ।

ইয়েরিঙ্গ লিখেছেন: 'রোমক জানে যে তার ব্যক্তিগত কল্যাণ রাষ্ট্রের কল্যাণ দ্বারা নির্ধারিত, সুতরাং তার স্বার্থপরতা প্রথমটার সঙ্গে রাষ্ট্রকেও আলিঙ্গন করে। সে জানে যে আইনের কঠোর পালন ও পূরণ সর্বসাধারণের, সুতরাং তার নিজস্ব স্বার্থেরও অনুসারী।'*

এইভাবে, ইয়েরিঙ্গের মতে, রোমক আইনের বিকাশের উৎস 'যৌথ জাতীয় প্রেরণা' নয়, ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ, তার স্বার্থ, যা বিধিবদ্ধ হয়েছে সেগুলির আইনী রক্ষায়। ব্যক্তির আত্মমুখী ইচ্ছাই হল, তাঁর মতে, 'আইনের ভ্রূণ'।

নিজের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের প্রথম দিকে ইয়েরিঙ্গ যেখানে রোমক আইনের দৃষ্টান্তে আইনের সামাজিক-ঐতিহাসিক শর্তবদ্ধতা নিয়ে বিশদ অনুধাবন করেছেন, সেখানে তাঁর সৃজনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বিশেষ করে জোর দিয়েছেন আইন ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে নৈতিক ধারণার তাৎপর্যের ওপর।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি জার্মানিতে বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষার নৈতিক ভিত্তি একটা পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যায়। রাজনৈতিক-আইনী ক্ষেত্রে এই পুনর্গঠনের সামাজিক-শ্রেণীগত ভিত্তি ছিল শ্রেণী শক্তির পরিবর্তমান সম্পর্ক, ক্রমাগত শক্তি বাড়িয়ে তোলা, পরিণত প্রলেতারিয়েতের ওপর বুর্জোয়া আধিপত্যের পদ্ধতি উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা। ঠিক আইনী ভাবাদর্শের ক্ষেত্রেই যে বুর্জোয়া সমাজের নৈতিক সমস্যাদি বিশেষ তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছিল সেটা নিতান্ত আপতিক নয়, কেননা সেটা ছিল জার্মানিতে বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের, রাষ্ট্রপাটের 'আইনী' ভিত্তি সুদৃঢ়করণের, বিকশিত নাগরিক-আইনী ব্যবস্থা, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থা সৃষ্টি প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জড়িত। সেই কারণে এটাও আপতিক নয় যে বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্র ইয়েরিঙ্গের

মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে অন্যতম প্রথম তীব্র নৈতিক সমস্যায় সাড়া দেয়। ইয়েরিঙ্গ ছিলেন সেই প্রগতিশীল জার্মান বুর্জোয়া ধারার প্রতিনিধি যা প্রগতিতে বিশ্বাস করত এবং নরমপন্থী-উদারনৈতিক প্রেরণায় আইনী ব্যবস্থাকে উন্নত করার প্রয়োজন বোধ করেছিল। একান্তই যা নৈতিকতার সমস্যা, ইয়েরিঙ্গ তাতে যথেষ্ট মন দিয়েছিলেন এবং এ সব সমস্যায় বিশেষজ্ঞ না হলেও তিনি তার চর্চা করতে বাধ্য হন, কেননা বিদ্যমান নৈতিক তত্ত্বে আইন-অন্তর্গত লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো উত্তর খুঁজে পান নি। বলাই বাহুল্য যে ইয়েরিঙ্গের গুরুত্ব এই জন্য নয় যে তিনি নতুন বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্র রচনা করেছিলেন — তিনি দার্শনিক নন, ব্যবহারশাস্ত্রী। বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রের বিকাশে তাঁর বিশেষ অবদান হল এই যে তিনি নতুন বুর্জোয়া নৈতিকতা, সংহতির নৈতিকতাকে সাহসের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন আইনের তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের সঙ্গে।

সমকালীন অন্যান্য বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রীর তুলনায় ইয়েরিঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে তিনি আইনের বিচার করেছেন বহু দিক থেকে এবং চেষ্টা করেছেন এই দিকগুলিকে সম্পৃক্ত করতে। তিনি মনে করতেন যে কেবল মানের ব্যবস্থা হিশেবে আইনের গঠন অনুধাবনে তার অন্য দিকটা, আইনের নৈতিক সারার্থ দৃষ্টিচ্যুত হবার বিপদ থাকে, যেটাকে তিনি আইন-অন্তর্গত লক্ষ্য বলে বুঝেছিলেন। তাই ইয়েরিঙ্গ তাঁর সৃজনের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'বোধের ব্যবহারশাস্ত্রের' প্রতিনিধিদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এই জন্য যে তাঁরা আইনের আনুষ্ঠানিক, যুক্তিগত-বোধমূলক দিকটাকে পরম করে তুলেছেন, দেখছেন না আইন-অন্তর্গত নৈতিক লক্ষ্য: অর্থাৎ জীবনের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের সঙ্গে, আইনের সামাজিক কাজের সঙ্গে আইনের যোগাযোগ।

সমাজে আইনের ভূমিকা উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এমন একটা প্রশ্ন হিশেবে আইন-অন্তর্গত লক্ষ্যের উপর বিশেষ গুরুত্বে জোর দেন ইয়েরিঙ্গ।

সাবজেকটিভ আইনের তত্ত্বে, ইয়েরিঙ্গ নিজেই যা বলেছেন, তদবধি প্রচলিত 'ইচ্ছার' বদলে তিনি যাত্রাবিন্দু হিশেবে নেন 'স্বার্থের' বোধ*।

আর স্বার্থের বোধ তাঁকে বাধ্য করে উদ্দেশ্যের বোধে মন দিতে, 'সাবজেকটিভ অর্থে আইনের ভাবনা নিয়ে যায় অবজেকটিভ অর্থে আইনের ভাবনায়'*। এই জন্যই ইয়েরিঙ্গ সচেতনভাবেই তাঁর পদ্ধতিকে বলেছেন পরমকারণবাদী। ইয়েরিঙ্গের আইনের দর্শনে আইন-অন্তর্গত লক্ষ্য বিষয়ক মতবাদ আছে কেন্দ্রীয় স্থানে। 'লক্ষ্য হল গোটা আইনের সৃজনী শক্তি।'** তাঁর মতে, কারণের নিয়ম লক্ষ্যের নিয়মের অধীন। 'সমস্ত কারণ তাদের মর্মার্থের দিক থেকেই হল লক্ষ্য'***। আর লক্ষ্যকে ইয়েরিঙ্গ বোঝেন স্রেফ ইচ্ছামূলক ব্যাপার নয়, ইচ্ছা অনুসৃত স্বার্থ বলে, প্রয়োজন মেটানোয় নিহিত লাভ বলে। তাঁর কাছে সঠিক অর্থে আইন হল তদুপযোগিতা, অর্থাৎ ব্যবহারিক উপকার থেকে অভিন্ন। এইভাবে, লক্ষ্যের বর্গটা তাঁর কাছে আইন ও স্বার্থের মধ্যে যোগাযোগের একটা কল্পিত ধাপ: আইন রক্ষা করে কেবল তা-ই যা উপযোগী, অর্থাৎ যাতে মানুষের ব্যবহারিক স্বার্থ আছে।

লক্ষ্য বর্গটার ব্যাখ্যায় নীতিসূত্র সম্পর্কেও ইয়েরিঙ্গের উপযোগিতা-বোধ দেখা দিয়েছে: সেইটেই নীতিসম্মত যা ব্যক্তি ও সমাজের সত্যকার স্বার্থের উপযোগী। সেই জন্য তাঁর আইনের দর্শনে তিনি অনেক মন দিয়েছেন নীতিসূত্রের সামাজিক নির্ভরতায়, নৈতিক মানের উদ্ভব বা উৎসে, তাদের উদ্দেশ্য ও মানুষের ইচ্ছার উপর তাদের ক্রিয়ার উপায়ে। নীতিসূত্রে 'পূর্বকল্পিত ধারণা থেকে মুক্ত, অভিজ্ঞতাবাদী-ঐতিহাসিক পদ্ধতি' প্রয়োগের পক্ষে তিনি।**** তিনি লিখেছেন: 'জন্মগত নৈতিক অনুভূতির তত্ত্বের বিপরীতে আমি উপস্থিত করছি ঐতিহাসিক তত্ত্ব: প্রকৃতি নয়, ইতিহাসই হল নৈতিক, এবং শুধু মৌল নৈতিক প্রতিপাদ্য ও ভাবনার নয়, নৈতিক অনুভূতিরও স্রষ্টা, যা হল কেবল এই সব প্রতিপাদ্য ও ভাবনার প্রত্যক্ষ, অচেতন আত্তীকরণের রূপ—শুধু তাই নায়, এমনকি নৈতিক ইচ্ছারও স্রষ্টা।'***** তিনি মন্তব্য করেছেন যে নীতিসূত্রের ঐতিহাসিক তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে নৈতিক নীতিগুলির **আপেক্ষিকতা** স্বীকৃতির ওপর,

এই ঘটনা স্বীকারের ওপর যে সত্যতা নয়, নৈতিকতা, অর্থাৎ জীবনের ব্যবহারিক লক্ষ্যের অনুযায়িতাই হল নীতিসূত্রের পরিমাপ'*।

এইভাবে, নীতিশাস্ত্র সামাজিক বিকাশের প্রয়োজন থেকে প্রয়োজনীয় ও যথোচিত আইনী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির দিকে একটা প্রেরক ধাপের কাজ করে। নীতিশাস্ত্রের — আর 'সঠিক বোধের' মাধ্যমে দেখা দেয় সমাজের জরুরি প্রয়োজনের চেতনা। সেই জন্যই আইনে নৈতিক প্রেরণা নিয়ে গবেষণা এত গুরুত্বপূর্ণ। ইয়েরিঙ্গ সেই সময়ের কথা লিখেছেন, যখন 'সমস্ত সামাজিক বিদ্যার রানীর' তাৎপর্য লাভ করবে নীতিশাস্ত্র, সরল বিজ্ঞান থেকে পরিণত হবে সামাজিক রাজনীতির শাখায়, 'জাতীয় শিক্ষাবিদ্যায়'**।

ইয়েরিঙ্গ মন্তব্য করেছেন: 'ব্যবহারশাস্ত্র এতদিন যা সযত্নে এড়িয়ে এসেছে, নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে তার সেই আশু সম্পর্ক ঘটলে ভবিষ্যৎ ব্যবহারশাস্ত্রের কাছে আমি আশা করছি নতুন বিকাশ, সেটা ততটা তাত্ত্বিক নয়, যতটা — যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ --- ব্যবহারিক বিকাশ, সমাজ তার সামনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য রেখেছে তার সঠিক বোধ।... কী রয়েছে এবং কেন রয়েছে, সেটা দেখাবার পর তত্ত্বকে আরো একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে: যা রয়েছে সেটা থাকা উচিত কি না, উচিত না হলে কী পরিবর্তন প্রয়োজন।'*** নীতিশাস্ত্রকে দেখাতে হবে কোনটা আইনের ভাবকল্পের অনুযায়ী, কোনটা বিরোধী।****

সমাজ ও রাষ্ট্রের আঙ্গিক ধ্যানধারণার ভিত্তিতে নিজের নীতিশাস্ত্র রচনা করেন ইয়েরিঙ্গ। মানুষের আচরণের সামাজিক কারণকে তিনি জৈবিক কারণের সঙ্গে এক করে দেখেন এবং মনে করেন যে সেগুলি প্রধান লক্ষ্য — সমাজ ও রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার অধীন। এই প্রধান লক্ষ্যই ব্যক্তির স্বার্থের ক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের আচরণ নির্ধারিত করে দেয়। প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে ব্যক্তির নিজ স্বার্থ, অর্থাৎ 'নিজস্ব নির্বাচন অনুসারে ক্রিয়াকলাপ'***** তাকে প্রণোদিত করে অন্য লোকেদের স্বার্থের কথা ভাবতে। আর এতে তাকে বাধ্য করার কলকাঠি হল তৃপ্তিলাভ আর কষ্ট, পুরস্কার

আর শাস্তি। তাঁর মতে, সমাজ হল 'অন্যদের জন্য এবং মাধ্যমে' জীবনের সংগঠন এবং সেই সঙ্গে 'নিজের জন্য' জীবনের প্রয়োজনীয় রূপ।*

ব্যক্তি ও সমাজের লক্ষ্যের শ্রেণী-বিভাজন করেছেন ইয়েরিঙ্গ। লক্ষ্য তার সাধনের হাতিয়ার হিশেবে নির্ধারিত করে দেয় মানুষের ইচ্ছাকে। এ ব্যাপারে আইনের ভূমিকা হল লক্ষ্যকে রক্ষা করা: আইন হল রক্ষিত স্বার্থ। এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে লক্ষ্য বলতে ইয়েরিঙ্গ সাধারণভাবে মানবিক ক্রিয়াকলাপের সামাজিক প্রণোদন বুঝিয়েছেন। লক্ষ্যের বোধের মধ্য দিয়ে তিনি সূত্রবদ্ধ করেছেন সমাজ বিকাশের সমাজতাত্ত্বিক নিয়মবদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা। আর 'কার্যত' এই নিয়মবদ্ধতাকেই তিনি তুলে ধরেন নীতিশাস্ত্রীয় সূত্রে।

উল্লেখ করা উচিত যে তা সত্ত্বেও ইয়েরিঙ্গ এই নিয়মবদ্ধতাকে দেখেছেন ব্যবহারশাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান ও বোধের প্রিজম মারফত। তাঁর কাছে এই প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যেমন, সমাজ বিকাশ বিষয়ে তাঁর তত্ত্বের কেন্দ্রে রয়েছে ব্যক্তিসত্তা, তবে সম্পত্তিমালিক ব্যক্তি। ব্যবহারশাস্ত্রী হিশেবে সম্পত্তির অস্তিত্বে তিনি দেখেন ব্যক্তির দৈহিক আত্মসংরক্ষণের শর্ত। সম্পত্তি এবং ব্যক্তি নিজে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা হিশেবে দাবি করে আইনের অস্তিত্ব। আইন আবার দাবি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। তিনি লিখেছেন: 'আইন বলতে বোঝায় দুটি দিক: লক্ষ্যের ব্যবস্থা এবং তা রূপায়ণের ব্যবস্থা'**।

রাষ্ট্র ও আইন হল মানবিক স্বার্থপরতার ভিত্তিতে গঠিত 'সামাজিক যন্ত্রক্রিয়া ইঞ্জিন হিশেবে' পুরস্কার ও বাধ্যকরণের সাহায্যে সমাজের লক্ষ্য সাধনের হাতিয়ার। তিনি লিখেছেন: 'আইন ও রাষ্ট্র হল বাধ্যকরণের সামাজিক সংগঠন।'*** মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত স্বার্থপরতার বাহন হল নাগরিক আবর্তন, এটা সমাজের আত্মপোষণের অর্থনৈতিক ভিত্তি। স্বার্থপরতা হল নাগরিক আবর্তনের ইঞ্জিন। ইয়েরিঙ্গ লিখেছেন: 'নাগরিক আবর্তন হল মানুষের প্রয়োজন মেটাবার একটা ব্যবস্থা যা স্বার্থপরতার ওপর স্থাপিত।... আবর্তনে একমাত্র চালিকাশক্তি যে স্বার্থপরতা, তাতে আমার যত দৃঢ় বিশ্বাসই থাকুক না কেন, অন্য দিকে, এ ব্যাপারেও আমার বিশ্বাস কম দৃঢ়

নয় যে সে স্বার্থপরতায় যখন সামাজিক কল্যাণ বিপন্ন হয় তখন তার আধিক্যকে সংযত রাখাই রাষ্ট্রের কাজ।... ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা যে আরক্ষার দাবি করে, তার বিরুদ্ধে নিজের স্বার্থ পেশ করার অধিকার আছে সমাজের। সমাজের স্বার্থ হল সেইটে যা একজনের পক্ষে নয়, সবার পক্ষে লাভজনক, যাতে সবাই একমত হতে পারে, এবং এ স্বার্থ... ন্যায্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। তা স্বাধীনতার চেয়ে বড়ো; ব্যক্তির অস্তিত্ব একমাত্র নিজের জন্য নয়, বিশ্বের জন্যও: তাই স্বাধীনতা, অর্থাৎ যা ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থ অনুসারী, তাকে হতে হবে ন্যায্যতার, অর্থাৎ সকলের স্বার্থ যা দাবি করে তার অধীন।'* 'সাধারণ কল্যাণ' সর্বোচ্চ মূল্য ধরে।

ন্যায্যতা দাবি করে, ইয়েরিঙ্গের মতে, অন্য দুটো ক্রিয়া, যা পুরস্কার ও বাধ্যকরণের চেয়ে উচ্চতম, সামাজিক যন্ত্রব্যবস্থার ইঞ্জিন: কর্তব্য ও স্বাধীন আত্মসম্বরণের বোধ। তাদের ক্রিয়ার নিদর্শন তিনি ফের দেখছেন ওই নাগরিক-আইনী ক্ষেত্রে। 'একমাত্র স্বার্থপরতার সেবায় আহূত কোম্পানি প্রথমোক্তের কাছে দাবি করে আত্মসম্বরণ, পরদ্রব্যকে আত্মদ্রব্য বলে দেখার কর্তব্য চাপায় তার ওপর, সেই সঙ্গে তা আইনী ব্যবস্থায় স্বার্থপরতা ও আত্মত্যাগের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে: তাতে সূচিত হয় তাদের সংস্পর্শের বিন্দু।... কোম্পানি বলতে বোঝা উচিত সম সম্পর্কের সমস্ত ব্যবস্থা, যথা: গ্রাম-সমাজ, কর্মশালা সমবায়, নিচু থেকে উপর: রাষ্ট্র ও চার্চ পর্যন্ত ইউনিয়নগুলি। এই সমস্ত সম্পর্কগুলিকে আমরা এক কথায় বলব — সমিতি।... সমিতি হল সামাজিক অস্তিত্বের একটা বনিয়াদী রূপ।'**

তাঁর মতে, রাষ্ট্র নিজেই বেড়ে উঠেছে বাণিজ্যাবর্তনের রূপগুলি থেকে — পারস্পরিক অধিকারের গ্যারান্টি ও মাত্রাতিরিক্ত স্বার্থপরতা থেকে রক্ষা করার জন্য, অর্থাৎ স্বার্থপরতাকে পরিচালনা, সমস্ত সমাজের সেবায় তার অভিযোজনের যন্ত্র থেকে। তিনি লিখেছেন: 'কোম্পানি মানবসমাজকে সমৃদ্ধ করেছে শুধু এক-একটা চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক দিয়েই নয়, মানবিক লক্ষ্য অনুসরণের মৌল রূপ দিয়েও।'***

ইয়েরিঙ্গের চিন্তাটা হল এই যে স্বার্থপরতার আত্মসংযমন ব্যক্তির নিজের কাছেই লাভজনক। 'আত্মত্যাগ... স্বার্থপরতার অঙ্গ।... আত্মত্যাগ —

ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে সাধারণ স্বার্থের সংঘাতের ফল, এই অর্থে আত্মত্যাগ হবে এক ধরনের আত্মসংরক্ষণ।'*

এইভাবে, ইয়েরিঙ্গের কাছে অর্থনৈতিক আবর্তন হল সমাজজীবনের ভিত্তি। ঠিক একইভাবে ব্যবহারশাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান, সর্বাগ্রে কোম্পানি ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রিজমের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সমাজের স্বাভাবিক কাজ চলার নৈতিক-রাজনৈতিক শর্ত: ব্যক্তির স্বাধীনতা; সমতা; ন্যায্যতার ধারণার আধিপত্য। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক আবর্তনেই এই সব শর্ত সর্বাধিক রূপায়িত হয়।

ইয়েরিঙ্গের ধারণায় রাষ্ট্র ও আইন হল এমন প্রতিষ্ঠান যা নাগরিক আবর্তনের চাহিদার পরিপূরক ও তা মেটাচ্ছে। নাগরিক আবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি 'পুরস্কার' লাভ করে, কিন্তু নাগরিক আবর্তন 'সামাজিক পুরস্কারের সংগঠন হিশেবে তার পরিপক্বতা অর্জন করে কেবল 'বাধ্যকরণের' সামাজিক 'সংগঠন', অর্থাৎ রাষ্ট্র ও আইনের সাহায্যে'। 'রাষ্ট্র হল খাস সমাজই অথবা সংগঠিত বাধ্যকরণ ক্ষমতার রূপায়ণ।... আইন হল বাধ্যকরণ নিশ্চিত করার সামাজিক লক্ষ্যের একটা ব্যবস্থা'**। রাষ্ট্র ও আইন যেহেতু জন্ম নেয় নাগরিক আবর্তনের চাহিদা থেকে, তাই দেখা যাচ্ছে যে সুবিবেচিত ছাড়া অন্য কোনো আইন হতে পারে না এবং আইনের উৎস হতে পারে কেবল সুবিবেচক ও আত্মসংরক্ষণে সমর্থ ক্ষমতা। স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রক্ষমতার উদ্ভব বা অস্তিত্বকে ইয়েরিঙ্গ শাসকদের কু ইচ্ছা, তাদের দ্বারা সামাজিক চাহিদার উপেক্ষা ছাড়া অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না।

তাই, রাষ্ট্র ও আইনের উদ্ভব সম্পর্কে ইয়েরিঙ্গের ধারণা মোটেই বস্তুবাদী ও সাঁচ্চা বৈজ্ঞানিক নয়। যদিও তিনি এ কথায় জোর দিয়েছেন যে আইন জন্ম নেয় সামাজিক স্বার্থের সংগ্রামের মধ্য থেকে এবং আইন নিজেই হল 'রক্ষিত স্বার্থ', তাহলেও আইনের শ্রেণীগত মর্মার্থের বিশ্লেষণের পর্যায়ে তিনি উঠতে পারেন নি। আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রেণীগত অভিগমন উপেক্ষা করায় ইয়েরিঙ্গ আইনকে ব্যক্তি ও সমাজের 'জৈব পরিস্থিতির' সঙ্গে এক করে দেখেছেন, যা নিশ্চিত হচ্ছে বাধ্যকরণ দ্বারা***। বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের রেওয়াজ অনুসারে, রাষ্ট্র ও আইনের উদ্ভবের

ইতিহাসকে তিনি আগের মতোই দেখেছেন 'ব্যবহারশাস্ত্রে রাঙানো চশমার' ভেতর দিয়ে, যদিও চেষ্টা করেছেন আইন ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক উদ্ঘাটনের। সামাজিক বিকাশ তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল অর্থনৈতিক আবর্তন ও সে সম্পর্কে ধারণার আইনী রূপের বিকাশ মাত্র।

আইনের গবেষণায় ইয়েরিঙ্গ অবদান যোগ করেছেন বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রীয় বিশ্ববীক্ষার কাঠামোর মধ্যে, কিন্তু তার বাইরে যেতে পারেন নি। তাহলেও ভাববাদী পদ্ধতিধারার কাঠামোর মধ্যেই তিনি আইনের বিকাশে কতকগুলি সত্য দিক, বিশেষ করে সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কটা দেখেছিলেন।

অন্যান্য বহু বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রীর কাছে যেমন, ইয়েরিঙ্গের কাছেও তেমনি আইন হল রাষ্ট্রকে সীমিত করার মতো কিছু একটা ব্যাপার, রাষ্ট্রক্ষমতার শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপায়ণ। 'আইনে নির্ধারিত হয় ক্ষমতার নাকচ নয়, কেবল তার নিজস্ব উপকারের প্রকৃতিগুলিতে নম্রতা।... আমার চোখে আইন হল নিজের লাভ এবং সেই সঙ্গে মাত্রার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ক্ষমতা, সুতরাং কোনো কিছুতে মূলত তা ক্ষমতা থেকে পৃথক নয়, কেবল তার আত্মপ্রকাশের একটা রূপ: কেবল রিপু ও সাময়িক লাভের তাড়নায় চালিত বন্য, রূঢ় ক্ষমতা বা শক্তি, বেআইনী ক্ষমতার বিপরীতে তা হল সঠিক, নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত, সুতরাং, শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষমতা।... এইভাবে, ক্ষমতার বদলে আইন আধিপত্য করে না, করে স্বয়ং ক্ষমতাই, এবং সেটা অবিরাম ও সর্বত্রই; তরবারিতে সশস্ত্র হয়ে সে-ই সিংহাসনে বসে, আর আইন তার সেবা করে যেভাবে কম্পাস সেবা করে ন্যাভিগেটরের।... আইন ক্ষমতার বিপরীত কিছু নয়, তারই উপাঙ্গ, তার আত্তীকৃত নিয়ম, অবিরাম অনুসরণ করায় যা পরিণত হয়েছে ক্ষমতার সাক্ষ্যে, তার দ্বিতীয় প্রকৃতিতে।'*

ইয়েরিঙ্গের মতে, 'আইনী' ক্ষমতা হল ঐতিহাসিক বিকাশের যোগফল। 'আইনী' রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা হল রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক প্রতিপাদন, যেখানে আইন দেখা দেয় ক্ষমতার স্বাভাবিক কাজ হিশেবে, 'সাধারণ কল্যাণের' নির্দিষ্ট একটা নৈতিক লক্ষ্যানুসারী তার রাজনীতি। 'কেবল আইনের আধিপত্যেই জাতীয় সমৃদ্ধি প্রস্ফুরিত হতে পারে।'**

সামাজিক বাধ্যীকরণের হাতিয়ার হিশেবে আইন দেখা দেয় ব্যক্তিকে

'সাধারণ কল্যাণের' দিকে ফেরাবার লক্ষ্যে। 'রাষ্ট্রের মৌল অর্থ হল **সকলের পক্ষে সাধারণ** স্বার্থ, অর্থাৎ **ব্যক্তিগত** স্বার্থে বিপন্ন সমাজের স্বার্থকে নিশ্চিত করা। এইভাবে রক্ষিত সমাজের স্বার্থকে আমরা বলি আইন।'*

এইভাবে, রাষ্ট্র এবং আইন উভয়কেই ইয়েরিঙ্গ দেখেছেন সামাজিক গঠনের উপাদান হিশেবে। মানবিক সমিতির উচ্চতর ও সর্বজনীন রূপ হিশেবে রাষ্ট্র উচ্চতর বাধ্যীকরণ ক্ষমতার বাহক। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হল সামাজিক বাধ্যীকরণ ক্ষমতা সংগঠনের বাহ্যিক দিক, এ সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দিকটা আইন, তা 'ক্ষমতা প্রয়োগের শৃঙ্খলার' সঙ্গে জড়িত। ইয়েরিঙ্গ তাতে এই কথায় জোর দিতে ভোলেন না যে রাষ্ট্র বাধ্যীকরণের একচেটিয়া অধিকার রাখে এবং আইনের সেই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি মনে করেন যে রাষ্ট্রের বাধ্যীকরণে সক্রিয় আদর্শগুলির যোগফল হিশেবে আইনের যে সংজ্ঞা 'চালু' আছে তা সঠিক।**

অন্যদিকে, ইয়েরিঙ্গ সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ আইনের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। তাঁর কাছে অবজেকটিভ আইন যদি হয়ে থাকে আইনী আদর্শগুলির যোগফল, তাহলে সাবজেকটিভ আইন হল 'ব্যক্তির কোনো একটা মূর্ত-নির্দিষ্ট অধিকারের বিমূর্ত আদর্শের মূর্ত প্রয়োগ'***। অবজেকটিভ অর্থে ইয়েরিঙ্গ আইনকে বলেছেন বিমূর্ত, আর সাবজেকটিভ অর্থে তা মূর্ত এবং এই কথায় জোর দিয়েছেন যে তারা পরস্পর নির্ভরশীল। 'আইনের মূলকথা হল তার ব্যবহারিক রূপায়ণ। যে আইনী আদর্শ কখনো রূপায়িত হয় নি অথবা রূপায়িত হবার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত, তার আইন নামধারণের দাবি থাকতে পারে না।'****

অবজেকটিভ আইনের আদর্শের ভিত্তিতে সাবজেকটিভ আইনের সমর্থনকে ইয়েরিঙ্গ বলেছেন মূর্ত-নির্দিষ্ট আইনের সঙ্গে বিধানের সংহতি। তিনি মনে করেন সাবজেকটিভ অর্থে আইনের 'ব্যবহারিক কোষকেন্দ্র' হল স্বার্থ। সাবজেকটিভ আইনে এবং তা রূপায়ণের জন্য ব্যক্তির সংগ্রামে তিনি দেখেন ব্যক্তির নৈতিক মর্যাদার ভিত্তি। 'আইনে' লোকের থাকে নিজের অস্তিত্বের নৈতিক ভিত্তি এবং তা রক্ষা করে; বিনা আইনে লোকে নেমে

যায় নিম্নতম পশুর পর্যায়ে।'* তদুপরি, নিজের সাবজেকটিভ আইনের জন্য ব্যক্তির সংগ্রাম হল সমাজের কাছে তার কর্তব্য, ইয়েরিঙ্গের মতে, এ সংগ্রাম ছাড়া সামাজিক অগ্রগতি অসম্ভব। সেই কারণে তিনি প্রচুর গুরুত্ব অর্পণ করেন 'সুস্থ আইনচেতনায়', একে তিনি বলেন 'সর্ববিধ আইনের মনস্তাত্ত্বিক আদি উৎস'**। এই কথায় তিনি জোর দিয়েছেন যে আইনচেতনা ছাড়া আইন সম্ভব নয়। আর আইনচেতনার মূলকথা হল নিজের জন্য নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে সজ্ঞান ব্যক্তিসত্তার উদ্যম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমক্ষে নিজেকে রক্ষা করার প্রবণতা। তাঁর মতে, জনগণের আইনচেতনা হল আইনের মজবুতির একমাত্র গ্যারাণ্টি***, আর আইনচেতনা বিকাশ পেতে শুরু করে সর্বাগ্রে ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে।****

'বৈষয়িক আইনের দৃঢ়তা, স্পষ্টতা, সুনির্দিষ্টতা, সুস্থ আইনচেতনা যাতে হোঁচট খেতে পারে তেমন সমস্ত মানের অপসারণ, বিচারালয়ের স্বাধীন-তা, মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের যথাসম্ভব উন্নয়ন — এটা হল রাষ্ট্রের পক্ষে তার প্রজাদের আইনচেতনাকে পূর্ণ পরিসর দান আর নিজের শক্তিকে মুক্ত করার অত্যাবশ্যক পথ।'***** ইয়েরিঙ্গের ধ্বনি হল 'সংগ্রামে তুমি নিজের অধিকার অর্জন করো'। সংগ্রাম ছাড়া অধিকার নেই, যেমন সম্পত্তি নেই শ্রম ছাড়া।

শক্তিশালী রাষ্ট্রক্ষমতা চাইতেন ইয়েরিঙ্গ, তবে এমন ক্ষমতা যা একই সময়ে বুর্জোয়া ব্যক্তিসত্তার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য পরিস্থিতি নিশ্চিত করবে এবং আইনে নিবদ্ধ তার রাজনৈতিক অধিকারকে মানবে। সেই জন্য তিনি, একদিকে, ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে দেখাবার চেষ্টা করেন যে রাষ্ট্রক্ষমতার ঐতিহাসিক বিকাশ ব্যক্তির অধিকার রক্ষক হিশেবে আইনের ক্রমিক বিকাশের সঙ্গে জড়িত এবং অন্যদিকে ব্যক্তিকে আহ্বান করেন অধিকারের জন্য লড়তে এই যুক্তিতে যে ঐতিহাসিক দিক থেকে আইনী ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে আইনের জন্য অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বুর্জোয়া ব্যক্তিসত্তার অধিকার আছে ইয়েরিঙ্গের রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের কেন্দ্রে।

ইয়েরিঙ্গের মতে, আইনের রূপটাই, মানের আকারে বিমূর্ত আচরণের রূপ নির্ধারিত হয় এই থেকে যে ব্যক্তিগত হুকুম জারির চেয়ে এই রূপটা ক্ষমতার কাছে সুবিধাজনক। আইনের পক্ষে মানভিত্তিক রূপ আবশ্যক তার লক্ষ্য পূরণের জন্য — সাবজেকটিভ অর্থে সমতা ও আইন নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। আর আইনের মর্মার্থই হল তার সাধনীয় লক্ষ্য।*

সাবজেকটিভ অর্থে আইনের ধারণা ইয়েরিঙ্গের রাজনৈতিক-আইনী তত্ত্বে নিয়েছে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

তিনি দাবি করেন যে রাষ্ট্র আইনের যেসব মান নির্দিষ্ট করে, তাদের হতে হবে উভয়ত বাধ্যতামূলক — শুধু ব্যক্তির পক্ষে নয়, খোদ রাষ্ট্রের পক্ষেও। রাষ্ট্রের অধিকার হল সেই সঙ্গে সমাজের স্বার্থে নিজের ক্ষমতা ব্যবহারের যে কর্তব্য আইনপ্রণেতার থাকে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের কাছে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা। আইনসঙ্গতির, আইনের মূর্ত-নির্দিষ্ট মানের বৈধতার মাপকাঠি কী? ইয়েরিঙ্গ টিপিকাল ব্যবহারশাস্ত্রীয়-দৃষ্টবাদী জবাব দিয়েছেন: 'রাষ্ট্রক্ষমতার কোথা থেকে মানগুলি নেওয়া উচিত সেটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল সে নিজেই যেসব মানের প্রবর্তন করেছে, তার মধ্যে কোনগুলি সে মেনে চলবে।'**

আরেক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার বিধানকে অন্যায় বলে গণ্য করা যায়, যদি 'আমাদের আত্তীকৃত অথবা খোদ আইনপ্রণয়ন দ্বারা ইতিমধ্যেই প্রবর্তিত আইনের সাধারণ মৌল বক্তব্যের' অনুযায়ী তা না হয়***। তাই ইয়েরিঙ্গ বলবৎ আইনের বর্ণনায় 'ন্যায্যতার' বর্গ থেকে মোটেই পালাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টবাদ প্রকাশ পাচ্ছে এইখানে যে তিনি তার একটা 'ব্যবহারিক'. অর্থাৎ মূলত উপযোগিতাবাদী সংজ্ঞা দিতে চেষ্টিত। তিনি লিখছেন: 'ন্যায্যতা হল তা-ই যা সবার পক্ষে লাভজনক, যাতে সবারই চলে... (আদর্শবাদী যে দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈতিক বোধের পরম স্বীকার্য রূপে কোনো লক্ষ্য নির্বিশেষে ন্যায্যতা প্রতিভাত, তা থেকে পৃথক ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি)'****। অ্যায্যতা বিষয়ে 'ব্যবহারিক'

দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সমতা প্রতিষ্ঠা বলে এবং জোর দিয়েছেন আনুষ্ঠানিক বাহ্যিক সমতার ওপর, 'পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের সমরূপিতার' ওপর।

ইয়েরিঙ্গের সমস্ত রচনায় দেবত্বারোপ করা হয়েছে আইনের ওপর, যেটাকে তিনি রেখেছেন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে। বিচারকদের স্বাধীনতা, কেবল আইনের কাছে তাদের দায়িত্ব, বিচারকদের অনপসরণীয়তা, বিচারক অধিবেশনের গোপনীয়তা এবং বিচারকদের শ্রদ্ধেয় কর্তব্য অনুযায়ী পারিশ্রমিকের পক্ষ নিয়েছেন তিনি দৃঢ়ভাবে। তিনি জোর দিয়েছেন সমাজে আইনের ভূমিকাকেই শুধু নয়, ব্যবহারশাস্ত্রীয় বৃত্তিকেও সম্মানীয় করে তোলার ওপরে।

এতে করে 'আইনী রাষ্ট্রের' নীতি কার্যত প্রতিষ্ঠার জন্য উদারনৈতিক ও নরমপন্থী রক্ষণশীল বুর্জোয়া স্তরের সংগ্রামে তিনি অবদান যোগ করেছেন।

বুর্জোয়া রাজনৈতিক-আইনী ভাবাদর্শের পরবর্তী বিকাশে ইয়েরিঙ্গের প্রভাব বিপুল। এই প্রভাব পেঁাছেছে বহু বুর্জোয়া দেশে। বিশেষ করে রাশিয়ায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বকীয় ধরনে বিকশিত করেছেন ন. ম. করকুনভ, স. আ. মুরোম্‌ৎসেভ, গ. ফ. শেরশেনেভিচ।

বেনথাম ব্যক্তিগত উপকারের যে উপযোগিতাবাদী নীতি সূত্রবদ্ধ করেছিলেন তা থেকে ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও সমাজের স্বার্থের সামঞ্জস্যের একটা ধারণার মধ্যবর্তী ধাপ হল ইয়েরিঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গি। যেমন, আইনকে 'সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং' রূপে ভাবা, 'রক্ষিত' স্বার্থকে সাধারণী, সামাজিক, ব্যক্তিগত হিশেবে বর্গবিভাগ বিষয়ে র. পাউন্ডের ধারণা স্পষ্টতই ইয়েরিঙ্গের প্রভাব-প্রসূত।

আধুনিক বুর্জোয়া আইনী ভাবাদর্শে ইয়েরিঙ্গকে সঙ্গত কারণেই আইনের সমাজতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যবহারশাস্ত্রের 'জনক',* 'স্বার্থের ব্যবহারশাস্ত্রের' (ফ. হেক), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহারশাস্ত্রীয় প্রয়োগবাদের, এমনকি 'স্বাধীন

আইন' আন্দোলনের (গ. কাণ্টরোভিচ, এ. এরলিখ) অগ্রদূত বলে ধরা হয়।* স্বনির্ভর একটা তাত্ত্বিক ধারা হিশেবে বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক ব্যবহারশাস্ত্রের পরবর্তী বিকাশে ইয়েরিঙ্গের গবেষণার সামাজিক-আইনী দিকটার প্রভাব এইরূপই। সেই সঙ্গে যে ধারাটা আইনী ডগমাটিজম বলে প্রচলিত, সেটা সমেত বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টবাদের পরবর্তী বিকাশেও আইন রচনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নৈতিক ও সামাজিক কারিকাগুলির কথা মনে রেখে আইনী বোধগুলির পরিপূরক যুক্তির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ইয়েরিঙ্গের ধারণা ফলপ্রসূ হয়েছে।

বুর্জোয়া আইনী ভাবাদর্শে এই ধারার নবতম বিকাশের আলোয় আইনী দৃষ্টবাদের প্রবক্তা হিশেবে ইয়েরিঙ্গের এই ধারণাগুলি গুরুত্ব অর্জন করেছে। সালে ইয়েরিঙ্গের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত যে সিম্পোজিয়মে ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশের আইনী দৃষ্টবাদের মুখ্য প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন, তাতে উল্লিখিত হয়েছে যে বর্তমানেও ইয়েরিঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব কেটে যায় নি। ইয়েরিঙ্গের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ করা হয়েছে ঠিক এইখানে যে আইনকে তিনি 'সামাজিক স্বার্থের সেবায় হাতিয়ার' হিশেবে দেখতে শুরু করেন, আইনী বোধগুলির নিছক যৌক্তিক বিশ্লেষণের অপ্রতুলতায় জোর দেন, তাঁর কাছে যা আইন-অন্তর্গত লক্ষ্য তার সাহায্যে তিনি খোঁজেন আইন-বহির্ভূত, নৈতিক ও সামাজিক কারিকা, যা আইনের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাত করতে সক্ষম। প্রখ্যাত ইংরেজ আইনবিদ ক. লারেনট্স আইন-অন্তর্গত লক্ষ্য নিয়ে গবেষণার ওপর প্রতিষ্ঠিত চিন্তার পরমকারণবাদী পদ্ধতিকে আইনী বোধগুলির সৃষ্টি, আইনী মানের ব্যাখ্যা, বিচারকের অধিকারের ফাঁকগুলিকে ভরাট করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আরো বিকশিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।*

হ. ল. আ. হার্ট উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর মতে, ইয়েরিঙ্গ কর্তৃক 'ব্যবহারশাস্ত্রীয় বোধের' সমালোচনা এবং বোধগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ অনুধাবন করার জন্য তাঁর আহ্বান আর আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক ব্যবহার-শাস্ত্রের স্বীকার্যগুলি সমগোত্রীয়, এই স্বীকার্য অনুসারে মূর্ত-নির্দিষ্ট

পরিস্থিতির সমস্ত বৈচিত্র্য আগে থেকে অনুমান করতে আইনী বোধগুলি অক্ষম, এ ক্ষেত্রে আইনী বোধের অন্তঃসার নির্ধারণে তা প্রকাশের ভাষা মাধ্যমের বিশ্লেষণ খুবই তাৎপর্য ধরে।*



ষষ্ঠ অধ্যায়

ফ্রিডরিখ ভিলহেল্‌ম নিট্‌শে

ফ্রিডরিখ ভিলহেল্‌ম নিট্‌শের (১৮৪৪-১৯০০) জন্ম ১৫ অক্টোবর, রিওকেন গ্রামে (সাকসোনিয়া), প্রটেস্টাণ্ট পুরোহিত পরিবারে। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি পান নাউমবার্গে (স্কুল ও বিদ্যালয়) আর ১৮৫৪-১৮৬৪ সালে পড়াশুনা করেন প্‌ফোর্টের বিখ্যাত মঠ শিক্ষায়তনে। এখানে, প্‌ফোর্টে পুরাতন ভাষা ও প্রাচীন যুগের চিরায়ত সাহিত্য নিয়ে চর্চা করার সময় তিনি আকৃষ্ট হন খ্রিঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকের গ্রীক কবি মেগরের থিয়োগনিডাস আভিজাতিক ধ্যানধারণায়, যিনি ছিলেন সম্ভ্রান্তদের উগ্র ভক্ত আর 'ইতরদের' শত্রু। কৈশোরের এই আকর্ষণ থেকে যায় অটুট

এবং পরবর্তী কালে তাঁর সমস্ত আভিজাতিক বিশ্ববীক্ষার রূপলাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

১৮৬৪ সালে নিট্‌শে ঈশ্বরতত্ত্ব ও চিরায়ত ভাষাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, কিন্তু অচিরেই ঈশ্বরতত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে ১৮৬৫ সালের শরতে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন, সে সময় সেখানে তাঁর শিক্ষক, ভাষাবিদ্যার প্রফেসার ফ. রিচ্‌ল্‌ও এসে গিয়েছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় নিট্‌শের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠায় প্রাচীন কালের লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে বেশ প্রভাব ফেলেন দার্শনিক আ. শোপেনহাওয়ার আর সুরকার র. ভাগনার।

১৮৬৭ সালে বাধ্যতামূলক সামরিক তালিমে থাকার সময় তিনি জখম হন। সেরে ওঠার পর ১৮৬৮ সালে তিনি আবার লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া চালিয়ে যেতে থাকেন। পরের বছর বয়স পঁচিশ পূর্ণ না হতেই তিনি বাজেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ল্যাসিকাল ভাষাবিদ্যার অধ্যাপকের পদে আমন্ত্রিত হন। নিট্‌শের অধ্যাপনা (১৮৬৯-১৮৭৯) কিছু কালের জন্য বন্ধ থাকে ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময়, যাতে তিনি স্যানিটারি স্বেচ্ছাসেবক হিশেবে যোগ দেন। বোঝা যায়, সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে তিনি তাঁর নাগরিকত্বও পরিবর্তন করেন আর নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডের 'বিশ্বস্ত নাগরিক' হওয়ায় তিনি যুদ্ধরত জার্মান ফৌজে নাম লেখাতে পারেন না। স্যানিটারি কর্মী হিশেবে কয়েক সপ্তাহ কাজের পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বলতে গেলে রোগ সারা জীবন তাঁকে ভুগিয়েছে এবং বোঝা যায়, অনেক গবেষক যা লক্ষ করেছেন, তাঁর রচনায় সেটা ছাপ রেখে গেছে।

১৮৭৯ সালে তিনি অস্বাস্থ্যের কারণে অধ্যাপনা ছেড়ে দেন এবং শিগগিরই ইতালিতে চলে যান। ১৮৮৯ সালের জানুয়ারিতে তিনি গুরুতর মনোরোগে আক্রান্ত হন। ১৯০০ সালে ২৫ অগস্ট তাঁর মৃত্যু হয় ভাইমারে।

নিট্‌শের দৃষ্টিভঙ্গির রূপলাভ ও বিকাশের খুবই আপেক্ষিক ও ছকবাঁধা একটা সাধারণ চিত্র হবে এইরকম।

প্রথম পর্ব — প্রাচীন গ্রীসের, তার কবি ও দার্শনিকদের ভাবাদর্শে অনুরাগের শুরু।

দ্বিতীয় পর্ব শোপেনহাওয়ার (১৮৬৫ সালের শীতকাল থেকে ১৮৬৬) এবং ভাগনারের (ব্যক্তিগত পরিচয় ১৮৬৮ সালের শরতে) ধ্যানধারণার প্রভাবে চিহ্নিত। এই সময়ে শোপেনহাওয়ারের নৈরাশ্যবাদ আর ভাগনারের

কান্তিকলার প্রভাবে রূপলাভ করতে থাকে ইতিহাস ও জীবনে সৃজনশীল প্রতিভার ভূমিকা সম্পর্কে নিট্‌শের ধারণা, যা অর্থের দিক থেকে দার্শনিক-নান্দনিক আর তাৎপর্যের দিক থেকে আভিজাতিক। ভাষাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, রাষ্ট্র এবং আইনের সমস্যাবলিতেও তাঁর আগ্রহ দেখা দেয়। নিট্‌শের ১৮৬৯-১৮৭৫ সালের রচনাগুলি এই পর্বে পড়ে।

তৃতীয় পর্বের (১৮৭৬-১৮৮০) বৈশিষ্ট্য হল শোপেনহাওয়ার ও ভাগনারের প্রভাব থেকে সমালোচনামূলক মুক্তি, একাধিক তাত্ত্বিক উপস্থাপনার পুনর্বিচার, নতুন অবস্থানের অন্বেষণ।

চতুর্থ পর্ব নিট্‌শের রচনার (১৮৮০-১৮৮৯) শেষ পর্যায় নিয়ে। এ পর্বের প্রধান বিষয় হল আগের সমস্ত মূল্যবোধের 'পুনর্মূল্যায়ন', 'সু আর কু'য়ের অপর দিক থেকে' নীতিসূত্র, নিহিলিজম আর অবক্ষয়ের সমালোচনা, মানুষকে 'মানবোত্তরে' যাবার সেতু এবং জরথুস্ত্রকে পয়গম্বর বলে বর্ণনা, 'ক্ষমতার বাসনা', 'অবিরাম প্রত্যাবর্তনের' নিরীক্ষা।

নিট্‌শের সৃজনী বিবর্তনকে বলা যেতে পারে তাঁর আলোচিত সমস্ত প্রসঙ্গ ও সমস্যায় জঙ্গী আভিজাতিক বিশ্ববীক্ষার গভীরতা লাভ, সম্প্রসারণ, যুক্তিসিদ্ধি ও তীব্রায়ণ।

রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতি নিয়ে নিট্‌শের কোনো প্রণালীবদ্ধ মতবাদ নেই, যেমন নেই আসলে তাঁর দর্শনতন্ত্রও। তিনি লিখেছেন: 'তন্ত্রকারদের আমি বিশ্বাস করি না, তাদের কাছ থেকে পালাই। তন্ত্র গঠনের বাসনা হল সততার একটা ত্রুটি'*। রাজনৈতিক-আইনী সমস্যার ক্ষেত্রে নিট্‌শের বক্তব্য ছড়িয়ে আছে তাঁর সমস্ত রচনায়, 'অরাজনৈতিক' নানা প্রসঙ্গ ও সমস্যায় আলোকপাতের সময় তা এসে গেছে। একাধিকবার তিনি তাঁর 'অরাজনৈতিকতায়' জোর দিয়েছেন, 'যথাসম্ভব কম রাজনীতির' দাবি করেন, নিজেকে এমনকি 'শেষ রাজনীতিবিরোধী জার্মান' বলেও অভিহিত করেছেন।

নিট্‌শের মনোযোগের কেন্দ্রস্থল হল সংস্কৃতির সমস্যাবলি (তার জাতিরূপ, গঠন ও চরিত্র, উচ্চতম সংস্কৃতি লাভের পথ, তার অধঃপতনের লক্ষণ ইত্যাদি) আর বাকি প্রশ্নাদির বিচার (ইতিহাস, নীতিসূত্র, সমাজ,

রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতি প্রভৃতি) অর্থপূর্ণ হয় কেবল তাঁর সাংস্কৃতিক প্রস্তাব ও ভাবকল্পের ব্যাপকতর পটে।*

নিট্শে মনে করেন যেকোনো দর্শনেই সবচেয়ে মূল্যবান, আগ্রহবহ, অবিসম্বাদী এবং সংরক্ষণযোগ্য বিষয় হল সেইটে যেখানে ফুটে ওঠে দার্শনিকের 'ব্যক্তিত্ব', তার 'ব্যক্তিগত মনোভঙ্গি, আভা'**। সচেতনভাবেই নিট্শে এগোন এই 'ব্যক্তিত্বসূচক' বিন্দু থেকে, একক কেন্দ্র হয়ে থাকায় সেটা তাঁর সমগ্র আলোচনার বহুরূপিতাকে একটা অখণ্ড চরিত্র দান করে।

স্টাইলকে সংস্কৃতির মূলগত মানদণ্ডরূপে ব্যাখ্যায়, অখণ্ড এবং নান্দনিক দিক থেকে একমাত্র শিক্ষা হিশেবে সর্বাগ্রে সাংস্কৃতিক সমস্যাবলিতে নিট্শের আগ্রহে তাঁর রাজনৈতিক সহ সমস্ত অবস্থানের তাৎপর্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হয়ে উঠেছে **নান্দনিকতা**। নীতিশাস্ত্র ও জ্ঞানতত্ত্বের ওপর তাঁর দার্শনিকতায় প্রাধান্য করে আভিজাতিক নান্দনিকতা, তাঁর সমর্থিত সংস্কৃতির আভিজাতিক স্টাইলের প্রেক্ষিতাধীন হয় সবকিছুই।

নিট্শের দর্শনের বাক্যভাণ্ডার খুবই স্বেচ্ছাচারী ও মৌলিক ধরনের। এখানে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা উচিত যে নান্দনিক এবং সাধারণভাবেই ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপারগুলির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে তিনি প্রচুর ব্যবহার করেছেন রাজনৈতিক বোধের শব্দ, আবার রাজনৈতিক-আইনী ও সামাজিক সমস্যায় প্রায়ই আলোকপাত করেছেন সাহিত্যিক-নান্দনিক, নৈতিক আর সাংস্কৃতিক পরিভাষায়। এর ফলে দাঁড়ায় এই যে একটা বিষয়ে বলতে গিয়ে অন্য আরেকটা ভাবেন, যেমন, সংস্কৃতি, নীতিসূত্র, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদির আলোচনায় থাকে অনুক্ত রাজনৈতিক উপভাষ্য আর রাজনৈতিক-আইনী বক্তব্যে ধরে নেওয়া হয় সাংস্কৃতিক পট ও প্রসঙ্গ।

নিট্শের দার্শনিকতার ধরনে থাকে বিস্তীর্ণ প্রসঙ্গের একটা বিশেষ রাজনৈতিকীকরণ, আর অনেক কিছু, মূলত যা রাজনৈতিক নয়, তার একটা রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা। অন্তত নিট্শের দর্শনের বহু ভাষ্যের মধ্যে তার রাজনৈতিক পঠনের ন্যায্যতা অসঙ্গত নয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ যেমন নিট্শের

খোদ মতবাদের উপলব্ধি ও মূল্যায়নের জন্য, তেমনি তাঁকে নিয়ে পরবর্তী ব্যাখ্যা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও।

নিট্শের ধারণায়, রাষ্ট্র, আইন, আইনপ্রণয়ন, রাজনীতি হল সংস্কৃতির সেবক হাতিয়ার, উপায়, কলকব্জা, যে সংস্কৃতি আবার বিশ্ব পরিসরে শক্তি ও ইচ্ছার খেলার আত্মপ্রকাশ, আবিষ্কার, রূপলাভ।

বহুক্ষেত্রে কিছু রদবদল করে নিট্শে ফিরে গেছেন হেরাক্লিটাস, পিথাগোরাসপন্থী, ডারউইনপন্থী, শোপেনহাওয়ার, যান্ত্রিকপন্থীদের ভাবনার দিকে। তাঁর ভূজাগতিক, সাধারণ বিশ্ববীক্ষার ধারণায় বিশ্ব (মহাজগৎ, মহাবিশ্ব, মানবিক জগৎ, জীবন) হল বহমানতা এবং সংগ্রাম। তাঁর কাছে **অস্তিত্ব** বলে কিছু নেই, আছে কেবল অন্তিম লক্ষ্য বিনা **রূপলাভ**। বিশ্ব একটা বিশৃঙ্খলা, দেহসত্তা নয়।*

স্থায়ী থেকেও বিশ্বের তেজ 'চিরন্তন ক্রমাবর্তনে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পেঁছে আবার নেমে আসে'। তাঁর মতে, বিশ্বের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন: "**শক্তির**' যে উল্লসিত বোধে আমাদের পদার্থবিদরা ঈশ্বর ও পৃথিবীকে গড়েছেন, তা কিন্তু পরিপূরণের অপেক্ষা রাখে: তাতে কিছু কিছু অভ্যন্তরীণ ইচ্ছা যোগ করা প্রয়োজন, যাকে আমি বলব '**ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা**', অর্থাৎ ক্ষমতা প্রকাশের অতৃপ্ত প্রবণতা, কিংবা ক্ষমতা প্রয়োগ, ক্ষমতাকে সৃজন প্রবৃত্তি রূপে ব্যবহার ইত্যাদি'**। হয়ে-ওঠার প্রবাহ হিশেবে বিশ্বের তাই একটা ঐচ্ছিক গঠন আছে: নিট্শের এই ধারণায় হেরাক্লিটাসের চিরন্তন প্রবাহ একরকম মিলেছে শোপেনহাওয়ারের মহাবিশ্বের ইচ্ছার সঙ্গে। শোপেনহাওয়ারকে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী বলেছেন। তাঁর থেকে নিট্শের পার্থক্য হল এই যে, শোপেনহাওয়ারের মতে, ইচ্ছাটা কু এবং কষ্ট। তাই ইচ্ছার প্রতি শোপেনহাওয়ারের মনোভাব নৈতিক দিক থেকে নেতিবাচক। বৌদ্ধ মতবাদের প্রেরণায় তিনি বলেন যে প্রাজ্ঞের উচিত স্বীয় ইচ্ছা দমন করা, ইচ্ছা নির্বাপিত করা, কু'কে হ্রাস করা, অনস্তিত্বের প্রশান্তিতে যাওয়া, অর্থাৎ নির্বাণে। নিট্শে, তাঁর নিজেরই কথায়, শোপেনহাওয়ারের এই নৈরাশ্যবাদ ও নিহিলিজম নিয়ে সম্পূর্ণ ভেবে দেখে তাকে বর্জন করেছেন অবক্ষয়ের লক্ষণ, ভুল মতবাদ, নৈতিকতাবহির্ভূত একটা ব্যাপারের মর্মার্থ রূপে ইচ্ছাকে বুঝতে না পারা বলে।

নিট্‌শে নিজে ইচ্ছার এই কু'য়ে সায় দিয়েছেন, 'হ্যাঁ', শোপেনহাওয়ারকে যা অস্থির করে তুলেছিল, আর এতে করে পরিপ্রেক্ষিত আমূল বদলে যাচ্ছে। এটা ঠিক যে তিনি 'সু আর কু'য়ের অপর দিক থেকে' ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাকে (শুধু **ইচ্ছা** বলে কিছু নেই, তিনি বলেন, আছে কেবল কিছুর জন্য ইচ্ছা, লক্ষ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে ইচ্ছা, **ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা**) দেখাতে চান যেন তা অনৈতিক, বাস্তব ঘটনা। আর নৈতিকতাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি বার বার বলেছেন যে, বাস্তব ঘটনাকে নীতিসূত্রের পর্যায়ে তোলা, নৈতিক মূল্যায়ন দিয়ে তার অর্থ বিকৃত করা, 'নৈতিকতা' দিয়ে নষ্ট করা অনুচিত। তিনি লিখেছেন: 'ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাটা অস্তিত্ব নয়, হয়ে-ওঠা নয়, সেটা একটা **আবেগ,** অতি প্রাথমিক একটা ব্যাপার, যা থেকে দেখা দেয় কিছু কিছু হয়ে-ওঠা, কিছু কিছু ক্রিয়া।'* সবই হল ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার প্রকাশ। 'জিনিস' বলে কিছু নেই, আছে কেবল গতিশীল পরিমাণ এবং তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাই হল একমাত্র চালিকা শক্তি; তা ছাড়া দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি অন্য আর কোনো শক্তি নেই। মহাবিশ্ব, জৈব ও অজৈব জীবন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক গঠন ইত্যাদি কেবল ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার আংশিক কতকগুলি ঘটনা।

জীবন্ত সবকিছুই সচেষ্ট নিজেকে রক্ষা করতে নয়, আরো বড়ো হতে, ধাবিত 'সুখের' জন্য নয়, ক্ষমতার জন্য, সঠিক বললে — ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। '**শক্তি সঞ্চয়ের** ইচ্ছা হল জীবন, পুষ্টি, জন্মগ্রহণ, বংশগতির — সমাজ, রাষ্ট্র, প্রথা, কর্তৃত্বের বিশিষ্ট ধর্ম।'** সবকিছুর বনিয়াদে ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা থাকে, সেটাকে নিট্‌শে বলেছেন একান্ত আদিম ধরনের মত্ততা, ঠিক 'আদেশের মত্ততাই'; বাকি অন্যকিছু মত্ততা তার প্রকারভেদ মাত্র। ''ইচ্ছা করার' অর্থ বাসনা, প্রয়াস, লালসা **নয়**: তাদের থেকে ইচ্ছার পার্থক্য হল আদেশের মত্ততায়।'***

নিট্‌শে তাঁর সমগ্র মতবাদ উপস্থিত করেছেন ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার অঙ্গসংস্থান হিশেবে। ইচ্ছার নানাবিধ প্রকাশ থাকে অবিরাম সংঘর্ষ ও সংগ্রামের মধ্যে, নিজের ক্ষমতা বাড়ায় কিংবা হারায়; এই বিশৃঙ্খল যুদ্ধের রূপ হল 'বাধ্যতা' আর 'আদেশ'। তাঁর মতে, ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা মৌল রূপগঠনী কারিকা হিশেবে দেখা দেয় শক্তির আত্মরক্ষামূলক (প্রবলতর

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে) এবং আক্রমণমূলক (দুর্বলদের বিরুদ্ধে) **সংযুক্তি ও সম্মিলনের** মধ্য দিয়ে। প্রত্যেকটি বিশিষ্ট দেহ সর্বাধিক শক্তি ও ক্ষমতা লাভে চেষ্টিত, কিন্তু অন্য দেহের অনুরূপ দাবির সম্মুখীন হতে হয় বলে তা 'শেষ হয় তাদের সঙ্গে আপোসে ('মিলনে') যারা তার যথেষ্ট সমগোত্রীয়; — এইভাবে ক্ষমতা জয়ের জন্য তারা তখন একত্রে ষড়যন্ত্র করে। এবং প্রক্রিয়াটা এগিয়ে চলতে থাকে।'* এই প্রক্রিয়ার গতিপথে নির্ধারিত হয়ে যায় প্রভুত্বের ব্যবস্থা — ক্ষমতার সীমা, পর্যায়, পার্থক্য ইত্যাদি।

নিজের 'নীতিগত অভিনবত্বের' তালিকায় নিট্শে বিশেষ করে উল্লেখ করেন: ''নৈতিক মূল্যবোধের' জায়গায় — একান্তরূপেই প্রাকৃতিক মূল্যবোধ। নীতিসূত্রের প্রাকৃতিকীকরণ। 'সমাজতত্ত্বের' জায়গায় — **প্রভুত্বের রূপ ও নিদর্শনের** মতবাদ। 'সমাজের' জায়গায় — **আমার** প্রধান আগ্রহের বিষয় হিশেবে **সাংস্কৃতিক যৌগিক** (খানিকটা অখণ্ড, নিজের অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত)। 'প্রজ্ঞান তত্ত্বের' জায়গায় — **মত্ততার পরিপ্রেক্ষিতমূলক মতবাদ** (তার জন্য মত্ততার সোপানশ্রেণী প্রয়োজন...)। 'অধিবিদ্যা' ও ধর্মের জায়গায় — **অবিরাম প্রত্যাবর্তনের মতবাদ** (শিক্ষণ ও নির্বাচনের উপায় হিশেবে)।**

একই জিনিসের অবিরাম প্রত্যাবর্তন বিষয়ে নিট্শের মতবাদ হল মহাজাগতিক ও সামাজিক যুগ এবং সমস্ত ঘটনার চক্রাবর্তন, কোনো এক সময়ে যা ছিল তার পুনরাবর্তন বিষয়ে প্রাচীন কাল ও প্রাচ্যের, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পিথাগোরাসপন্থী ও প্লেটোর ধারণার কিছুটা রদবদল। কিন্তু গতির চক্রাবর্তনের এই ধারণাটা যেখানে প্রাচীন যুগের লেখকদের ক্ষেত্রে ইতিহাসকে গতিমুখী, অগ্রগামী বলে না জানার প্রতিফলন, নিট্শের ক্ষেত্রে সেটা ইতিহাসকে প্রগতি বলে মানতে সচেতন অস্বীকৃতির ফল।

বিকাশের চরিত্র যে অগ্রগতিমূলক এমন দাবি করা ভুল বলে তিনি মনে করেন। যেমন, তাঁর মতে, ১৯ শতক ১৬ শতকের চেয়ে এগোয় নি। ১৭ শতক ১৮ শতকের চেয়ে বেশি আভিজাতিক ও প্রবল। ''মানবজাতি' সামনে এগুচ্ছে না, আসলে তার অস্তিত্বই নেই।'*** যুগের, কালের পালাবদলে কোনো সম্পর্ক ও অবশ্যম্ভাবিতা, শৃঙ্খলা ও যুক্তি নেই। খ্রিস্টধর্মের উদয় — একটা

প্রগতি নয়, পূর্ববর্তী ধর্মমতগুলির তুলনায় তা অবক্ষয়। 'পশুর তুলনায় মানুষ একটা অগ্রপদক্ষেপ নয়; সংস্কৃতিমান আদুরে গোপাল আরব বা কর্সিকানদের তুলনায় একটা কুলাঙ্গার; চীনেরা সার্থক একটা টাইপ, ঠিক ইউরোপীয়দের চেয়েই সুস্থায়ী।'* ''প্রগতিতে' কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের' বিরুদ্ধে আঘাত হানার সুযোগ পেলে তিনি ছাড়েন না।

মূল্যবোধের যে র্যাডিকাল পুনর্মূল্যায়নের দাবি করেন নিট্শে, তার ফলে আগে যাকে প্রগতি বলে ধরা হত (নীতিসূত্রে, আচার-ব্যবহারে, সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয়-আইনী শৃঙ্খলা ইত্যাদিতে), তাকে তিনি গণ্য করেন অবক্ষয় বলে। কোন মূল্যবোধ থেকে? — ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার ইচ্ছা থেকে। নিট্শে তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেছেন: 'মূল্যবোধ হল সর্বাধিক পরিমাণ ক্ষমতা যা মানুষ আয়ত্ত করতে পারে, — মানুষ, মানবজাতি নয়! মানবজাতি যে লক্ষ্যের চেয়ে বরং একটা উপায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কথাটা হচ্ছে টাইপ নিয়ে: মানবজাতি স্রেফ পরীক্ষার মালমশলা, অসার্থকদের বিপুল উদ্বৃত্তি, — ভাঙাচোরা আবর্জনার মাঠ।'**

তাঁর মতে, আগেকার জীববিদ ও ডারউইনপন্থীদের মূলগত ভুলটা হল এই যে তাঁরা বোঝেন নি যে স্বতন্ত্র এক-একজন চালিত হয় নিজস্ব লাভের প্রেরণায়, বংশের উপকারের কথা ভেবে নয়; ব্যাপারটা বংশ নিয়ে নয়, অনেক প্রবলভাবে অভিব্যক্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের নিয়ে, যাদের কাছে জনগণ কেবল উপায় মাত্র। ডারউইনপন্থীরা ভুল করে বলে যে নির্বাচন চলে প্রবলদের, সার্থকদের অনুকূলে; 'প্রজাতির প্রগতি' বলে কিছু নেই, পক্ষান্তরে আছে 'ভাগ্যবান সম্মেলনের বিলুপ্তি, উচ্চতর টাইপের অকার্যকরতা, মাঝারি, এমনকি নিম্নমাঝারি টাইপদের অনিবার্য আধিপত্য।'*** কিন্তু উচ্চতর ধরনের অল্পসংখ্যক লোকেরাই, মহান ব্যক্তিরাই (সিজার, নেপোলিয়নের মতো) হলেন তাঁদের অস্তিত্বের স্বল্পস্থায়িত্ব সত্ত্বেও এবং উত্তরাধিকার হিশেবে তাঁদের গুণাবলি বংশধারায় না বর্তালেও, নিট্শের মতে, ঘটমানতার ও ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার গোটা সংগ্রামটার অর্থ, লক্ষ্য ও ন্যায্যতার প্রতিপাদন। 'মূল ব্যাপার: অসংখ্য ব্যক্তিসত্তা হচ্ছে অল্পসংখ্যকের বলি, — তাদের সম্ভব হয়ে ওঠার শর্ত হিশেবে। আত্মপ্রতারণার প্রয়োজন নেই: জাতি ও বর্ণের

ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই — তারা হল এক-একজন **মূল্যবান ব্যক্তিকে** গড়ে তোলার 'মালমশলা' — যারা মহান প্রক্রিয়াটা চালিয়ে যাচ্ছে।'*

এই সবের প্রেক্ষাপটে অবিরাম প্রত্যাবর্তনের অতিকথাটির উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার তেমন সম্মেলনের সৌভাগ্যবান পুনরাবর্তনের সম্ভাবনা প্রতিপাদন যা মহান ব্যক্তির এবং নতুন আভিজাত্য ও নতুন দাসত্ব নিয়ে উচ্চ সংস্কৃতির রূপলাভের শর্ত। অবিরাম প্রত্যাবর্তনের মতবাদকে নিট্শে জ্ঞান করেছেন নিজেদের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য 'অতি পরাক্রান্ত লোকেদের হাতে হাতুড়ি' বলে: 'আলোকপ্রাপ্তির নতুন যুগ — পুরনোটার চরিত্র ছিল গণতান্ত্রিক পশুপালের উপযোগী — সবার সমমাত্রিকতা। নতুনটা পথ দেখাতে চায় পরাক্রান্ত প্রকৃতিদের — যেহেতু তাদের কাছে (যেমন রাষ্ট্রের কাছেও) তেমন **সবকিছু অনুমোদনীয়** যা পালের জীবদের ক্ষেত্রে অনুমোদনীয় নয়।'**

সমগ্র সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসকে নিট্শে বিশেষিত করেছেন ক্ষমতা লাভের দুই ইচ্ছার সংগ্রাম হিশেবে — প্রবলদের (উচ্চতম প্রজাতি, অভিজাত প্রভু) ইচ্ছা আর দুর্বলদের (জনগণ, দাস, জনতা, পাল) ইচ্ছা।

নিট্শের মতে, ক্ষমতার জন্য আভিজাতিক ইচ্ছা হল উত্থানের স্বতঃপ্রবৃত্তি, জীবনের ইচ্ছা; ক্ষমতার জন্য দাসোচিত ইচ্ছা হল পতনের স্বতঃপ্রবৃত্তি, মৃত্যুর, নাস্তির ইচ্ছা। উচ্চ সংস্কৃতি হল আভিজাতিক, জনতার আধিপত্যে দেখা দেয় সংস্কৃতির অধঃপতন, অবক্ষয়। নীতিসূত্র হল প্রভুর বিরুদ্ধে দাসদের হাতিয়ার, প্রবলদের বিরুদ্ধে দুর্বলদের নৈতিক বিচার আর অনুশাসন, উচ্চতর প্রজাতির ওপর পালের প্রভুত্বের ন্যায্যতা প্রতিপাদন। মানবজাতির শেষ কয়েক সহস্রকের ইতিহাসের (প্রাচীন আভিজাত্যের প্রাধান্য থেকে বর্তমান কাল অবধি) মূল্যায়ন নিট্শে করেছেন সুস্থ, জীবনীশক্তিসম্পন্ন নীতির প্রাধান্যের ক্রমিক অধঃপতন, শেষ বিচারে, প্রবলদের সংখ্যাল্প আভিজাত্যের ওপর সংখ্যাবহুল দুর্বল ও নিপীড়িতদের বিজয় বলে।

কিন্তু অতীতে যা একবার ছিল, তা ভবিষ্যতেও আবার সম্ভব — এইটে হল অবিরাম প্রত্যাবের্তনের পেছনকার ভাবনা। এবং নতুন আভিজাতিক ব্যবস্থার আদর্শ সন্ধানে নিট্শে প্রাচীন কালের অভিজাত-প্রভুত্বের ইতিহাসের

আশ্রয় নিয়েছেন, অতীতের নিজস্ব ব্যাখ্যাকে পরিণত করেছেন পরিকল্পিত অবিরাম প্রত্যাবর্তনের এক সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মসূচিতে।

রাষ্ট্র ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের তাৎপর্য ও কাজ সম্পর্কে যে যুক্তিবাদী ভাবনা সক্রেটিসের সময় থেকে চলে এসেছে, সেটাকে বর্জন করে নিট্‌শে মিথ বা অতিকথাকে সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের আসল বনিয়াদ বলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন: 'অতিকথা ছাড়া সর্ববিধ সংস্কৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সুস্থ সৃজনী চরিত্র হারায়: অতিকথার দিগন্তই কেবল গোটা সাংস্কৃতিক গতিকে পরিসমাপ্ত সমগ্র কিছু একটার সঙ্গে যুক্ত করে।... অতিকথার প্রতিমাগুলিকে সর্বত্র বিরাজমান অলক্ষ্য দানবদের নিয়ে পাহারায় থাকতে হবে; তাদের রক্ষণাধীনে বেড়ে ওঠে তরুণ অন্তর, তাদের চিহ্ন দেখেই মানুষ নিজের জীবন ও লড়াইকে বোঝে, এমনকি রাষ্ট্রই এই অতিকথামূলক ভিত্তির চেয়ে বেশি পরাক্রান্ত, অলিখিত অন্য কোনো আইন জানে না।'* অতিকথার অর্থে বোঝা এই স্বাভাবিক সুস্থ রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের বিপরীত বলে তিনি দেখিয়েছেন বিমূর্ত রীতিনীতি, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ও আইনকে, যা নাকি অতিকথা থেকে সরে যাওয়ার, ব্যাপকাকারে যুক্তিবাদী-বিমূর্ত চিন্তাধারার ফল।

বীর যুগের গ্রীস, প্রাচীন রাজা ও অভিজাতদের আধিপত্যের সময়টা, যখন অতিকথার রাজত্ব চলছিল, সেটা তাঁর কাছে উচ্চ সংস্কৃতির আদর্শ বলে প্রতিভাত হয়েছে আর অ্যাপলোর বিপরীতে গ্রীক পঞ্জিকার পুরাদেব দিওনিসিয়াসের তিনি গুণগান করেছেন সুস্থ জীবনীশক্তি ও স্বতঃপ্রবৃত্তির বিজয়ের প্রতীক, অবিরাম প্রত্যাবর্তনরূপ রহস্যের দেবতা বলে। তিনি লিখেছেন: 'আমি দার্শনিক দিওনিসিয়াসের শেষ ছাত্র, আমি অবিরাম প্রত্যাবর্তনের শিক্ষক।'**

তাঁর মতে, হেলেনীয় স্বতঃপ্রবৃত্তির মূলকথা হল জীবনস্পৃহা, যা রূপ লাভ করেছে জাতির, পুরাতন, অভিজাত রুচির, বংশ মর্যাদার; নগর-রাষ্ট্রের মূল্যবোধগুলিতে। 'দাসোচিত' দৃষ্টিকোণ — রাষ্ট্রের উদ্ভব ও কাজের প্রশ্নে নৈতিক মনোভাব নস্যাৎ করার সময় তিনি অভিজাত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপের ইতিহাস থেকে এমনসব দোষ, জুলুম আর বিদ্বেষের

দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অনুমোদনক্রমেই (গ্রীস, ভারত, রোমে), যা ছাড়া, তাঁর মতে, সংস্কৃতি হতেই পারে না।

বিভিন্ন প্রকারভেদ সত্ত্বেও নিজের সমগ্র রচনায় নিট্‌শে তাঁর এই মূল আভিজাতিক ধারণাটার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন: সংস্কৃতির প্রয়োজন দাসত্ব, সংখ্যাল্প, সুবিধাভোগী শ্রেণীকে কায়িক শ্রম আর অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন থেকে মুক্তি দেবার জন্য অত্যধিকাংশ লোকের বাধ্যতামূলক শ্রম। তাঁর মতে, কেবল এই পথেই লোকেদের উচ্চতম প্রজাতির শিল্পীয় ও আত্মিক বিকাশ এবং তদনুযায়ী উচ্চ সংস্কৃতির ফলপ্রসূ জমি তৈরি হতে পারে। তিনি লিখেছেন: 'এর ফলে আমাদের উচিত বুক বেঁধে এই নির্মম সত্যটা পেশ করা যে **সংস্কৃতির মর্মার্থে নিহিত দাসত্ব**।... অল্পসংখ্যক অলিম্পিয়াবাসীদের শিল্পজগৎ সম্ভব করে তোলার জন্য যে লোকেদের জীবন দুর্বহ, তাদের কষ্ট আরো বাড়িয়ে তুলতে হবে।'* তাঁর মতে, সংস্কৃতির এই নির্মমতায় সমস্ত মহান ধর্ম ও ক্ষমতাও চিহ্নিত, প্রকৃতিগতভাবেই যা অশুভ। প্রাচীন কালের পক্ষে দাসত্ব আর মধ্যযুগের পক্ষে ভূমিদাসত্বের স্বাভাবিকতাকে নিট্‌শে একটা যুক্তি বলে খাড়া করেন আধুনিক কালের 'অস্বাভাবিকতার' বিরুদ্ধে, যা, তাঁর মূল্যায়নে, ধ্বংস পাবে ঠিক এই দাসত্ব না থাকার জন্যই।

রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তাৎপর্য বিষয়ে নানাবিধ ধারণা নাকচ করে দিয়ে নিট্‌শে লিখেছেন যে রাষ্ট্র হল সেই বলাত্মক সামাজিক প্রক্রিয়াটার উদ্ভব ও অনুবর্তনের একটা উপায়, যার গতিপথে দেখা দেয় সুবিধাভোগী সংস্কৃতিশীল সেই মানুষ, যে অবশিষ্ট জনগণের ওপর প্রভুত্ব করে। 'এক-একজন লোকের মধ্যে আদান-প্রদানের প্রবণতা যত প্রবলই হোক, কেবল রাষ্ট্রের লৌহ সাঁড়াশিই অধিকাংশ লোককে পরস্পরের সঙ্গে এতটা পিষে পেলতে পারে যাতে সমাজের রাসায়নিক বিয়োজন শুরু হয় এবং তার নতুন পিরামিডাকার উপরিকাঠামো গড়ে উঠতে থাকে।'**

নিট্‌শের আভিজাতিক নান্দনিকতা খোলাখুলি একটা রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা পায় যখন তিনি রাষ্ট্র আর শিল্প, রাজনৈতিক রিপুবেগ আর শিল্প-সৃষ্টি, রণক্ষেত্র আর শিল্পীয় রচনার মধ্যে রহস্যময় সম্পর্কের কথা বলেন।

সবার সঙ্গে সবার যুদ্ধের স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্র ছাড়া সমাজের মূল গভীরে প্রোথিত হতে পারে না; কেবল রাষ্ট্র — লৌহ সাঁড়াশিটাই — বলপ্রয়োগে সেই সামাজিক প্রক্রিয়ার জন্ম দেয় যাতে প্রতিভার প্রস্ফুরণ ঘটে। এই অবস্থান থেকে নিট্‌শে অনুমোদনক্রমে উল্লেখ করেছেন যে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রেরও প্রধান লক্ষ্য ছিল অলিম্পিয়ার জীবনযাপন ও প্রতিভার লালন।*

আভিজাতিক নান্দনিকতার একটা বিশ্বব্যাপী পরিপ্রেক্ষিত দিতে গিয়ে নিট্‌শে যেসব ক্ষেত্রে, তাঁর মতে, নিম্নোক্ত দুয়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য, বিচ্ছিন্নতা, সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে, সেখানে নীতিগতভাবে রাষ্ট্র ও রাজনীতির চেয়ে সংস্কৃতি ও প্রতিভাকেই পছন্দ করেছেন। তিনি আভিজাতিক সংস্কৃতির দৃঢ়প্রত্যয়ী অনুরাগী, যা দেখা দিতে পারে কেবল অল্পসংখ্যকের আধিপত্য ও বাকিদের দাসত্বের পরিস্থিতিতে, তিনি উচ্চকোটিবাদী, কিন্তু রাষ্ট্রবাদী নন। রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে তিনি ততটাই অনুমোদন, এমনকি প্রশংসাও করেন, যতটা আভিজাতিক সংস্কৃতি ও প্রতিভার সেবায় কাজে লাগার উপযুক্ত উপায় ও হাতিয়ার হিশেবে তারা তাদের ভূমিকা পালন করে।

নিট্‌শের মতে, মানবজাতির লক্ষ্য হল অতি সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত নমুনা সৃষ্টি করা, যা সম্ভব কেবল উচ্চ সংস্কৃতির পরিবেশে, কিন্তু মোটেই সুসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে ও রাজনীতিগ্রস্ততায় নয় — শেষের দুটি মানবজাতিকে দুর্বল করে, প্রতিভার উদয়ে বাধা দেয়।** নিজেদের টাইপ বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামে প্রতিভাধরের উচিত সুসম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বাধা দেওয়া, সে রাষ্ট্র সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে কেবল জীবনের বলাত্মক চরিত্র হারিয়ে এবং শিথিল ব্যক্তিত্ব উৎপাদন করে। তিনি লিখেছেন: 'ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র একটা বিজ্ঞ সংগঠন; যদি তাকে বড়ো বেশি রকম সুসম্পূর্ণ করা হয়, তাহলে শেষকালে ব্যক্তিত্ব দুর্বল, এমনকি বিলুপ্তই হয়ে যাবে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের আদি উদ্দেশ্যই আমূল ধ্বংস পাবে।'*** রাষ্ট্র দেখা দেয় স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সংস্কৃতির দিকে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় একটা হাতিয়ার হিশেবে যা গোটা প্রক্রিয়াটাকে চালিত করে প্রবলের ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার স্বার্থে। তাই জন্মসূত্রে রাষ্ট্র হল বিজয়ীদের

(উৎকৃষ্ট, প্রবলদের) সংগঠন এবং বিজিতদের (নিকৃষ্ট, দুর্বলদের ওপর) তার প্রভুত্বের ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নিট্শের মতে, 'যুদ্ধে এবং সামরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই রাষ্ট্রের রূপ, অথবা সঠিক বললে তার আদিরূপ'।*

যুদ্ধ থেকে যে 'সামরিক সমাজ' বেরিয়ে আসে, তার গঠন স্থির করে দেয় 'সামরিক জাতগুলি' যাতে প্রথম দিককার বিশৃঙ্খল জনপুঞ্জ স্থলিত হয়ে পড়ে। এই গোটা গতিটার যা অচেতন লক্ষ্য তীব্রভাবে অনুভব করে সামরিক উচ্চ জাতেরা, সেটা হল — **'সর্বোচ্চ প্রতিভার** জন্মদান, যাকে আমরা রাষ্ট্রের আদি প্রতিষ্ঠাতা বলে মেনেছি'**। বহু প্রাচীন সামরিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্তে (বিশেষ করে স্পার্টার লিকুর্গের ব্যবস্থায়) নিট্শে বলতে চেয়েছেন যে রাষ্ট্র উদ্ভবের পেছনে প্রধান ভাবনাটা ছিল সামরিক প্রতিভার জন্মদান।

এই প্রক্রিয়ার খাত বেয়ে উদিত সংস্কৃতি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত শৃঙ্খলার অনুকূল পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে আরো ব্যাপকতর অর্থে প্রতিভার অভ্যুদয়ে সহায়তা করে (সামরিক ছাড়াও শিল্পীয়, সৃজনমূলক ইত্যাদি)। কিন্তু সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের প্রবণতা নীতিগতভাবে বিভিন্ন। তদুপরি, উচ্চ সংস্কৃতি পরে অধঃপতিত হয় 'মেকি-সংস্কৃতিতে' আর 'রাষ্ট্রের স্বার্থপরতা' প্রকাশ পায়, বিশেষ করে সংস্কৃতিকে অধীনস্থ করার প্রয়াসে।*** রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি এইভাবে পরস্পরসম্পর্কিত, একটার কাছে অন্যটার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটা অত্যন্ত প্রপীড়িত, কেননা দুপক্ষেরই নিজ নিজ লক্ষ্য থাকায় তারা চেষ্টা করে অপরকে নিজের সেবায় লাগাতে।

রাষ্ট্রের প্রতাপ বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সমস্যাদিতে আচ্ছন্নতায় সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে। নিট্শে মন্তব্য করেছেন: 'সংস্কৃতি তার উচ্চ সুফলগুলির জন্য রাজনৈতিকভাবে দুর্বল যুগগুলির নিকট ঋণী।'**** তিনি মনে করেন, জনগণের রাজনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির প্রায় অনিবার্য পরিণাম হয় আত্মিক দীনতা ও দুর্বলতা, সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সৃজনকর্মের হ্রাস: রাজনীতির সাফল্যে সাংস্কৃতিক প্রতিভার উদয় ও সমুন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

নিট্শের মতে, সংস্কৃতির সবকটি মহান যুগ এসেছে রাজনৈতিক পতনের যুগ থেকে: সাংস্কৃতিক অর্থে যা মহান তা অ-রাজনৈতিক, এমনকি রাজনীতিবিরোধীই। রাষ্ট্র, যুদ্ধ, রাজনীতি, পার্লামেন্টপ্রথা ইত্যাদিতে যা লাগে, তা খোয়া যায় সংস্কৃতি থেকে। তিনি লিখেছেন: 'এ ব্যাপারে আত্মপ্রতারণার প্রয়োজন নেই, সংস্কৃতি আর রাষ্ট্র পরস্পরবিরোধী: 'সংস্কৃতিসম্পন্ন রাষ্ট্র' কেবল একটা হালফিল আইডিয়া।'* 'হালফিল' বলতে নিট্শে বোঝান: মিথ্যা, অবক্ষয়ী, মেকি-সাংস্কৃতিক। উচ্চতর মানবিক 'নমুনা' ও প্রতিভা চর্চার ঠিক এই পটেই — নিট্শের আভিজাতিক নান্দনিকতার প্রেক্ষিতে — বোঝা উচিত রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিরুদ্ধে, উচ্চ সংস্কৃতির পক্ষে তাদের ক্ষতিকর মাত্রাতিরিক্ততা ও সর্বনাশা চূড়ান্তপনার বিরুদ্ধে তাঁর বেশ ঘন ঘন আক্রমণগুলিকে।**

প্রাচীন কালের গ্রীক সমাজ নিট্শের মনোযোগ আকর্ষণ করে সর্বাগ্রে এই জন্য যে গ্রীক সংস্কৃতি প্রভুত্ব ও দাসত্বের সম্পর্কের মধ্যে নিহিত।

নগর-রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র ফিনিসিয়ার উদ্ভাবন, গ্রীকরা সেটা ধার নেয়। হেলেনীয় প্রকারভেদে নিট্শে তার সেই দিকগুলো অনুমোদন করেন যা উচ্চ সংস্কৃতির সোপানতান্ত্রিক চরিত্রের সহায়ক। 'শৃঙ্খলা ও বিযোজনের অপূর্ব বোধ এথেনিয়ানদের রাষ্ট্রকে অমর করে গেছে।'*** এথেন্সের বিপরীতে স্পার্টাকে চিত্রিত করা হয়েছে একটা কর্কশ রাষ্ট্র, গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের প্রহসন বলে। স্পার্টার মৌল প্রবণতা — সুসম্পূর্ণ স্পার্টান গড়ায় মহত্ত্ব কিছু নেই। তাছাড়া রাষ্ট্রাদির সামরিক জোট গঠনের গতিপথে এথেন্সকে রাজনীতির আলিঙ্গনে পুরোপুরি আবদ্ধ হতে বাধ্য করায় স্পার্টা হেলিনোস নষ্টে সাহায্য করে। প্রাচীন গ্রীসের পতন এবং তার রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিলোপ, নিট্শের মতে, সমস্ত সংস্কৃতির ভবিষ্যতের পক্ষে হয় দারুণ সর্বনাশা। তিনি লিখছেন: 'গ্রীসের পক্ষে রাজনীতির অধীনস্থ হওয়াটা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক পরম দুর্ভাগ্য, কেননা তা এই জঘন্য তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে যে আমরা সংস্কৃতির সেবা করতে পারি কেবল তখন, যখন সেই সঙ্গে আমরা আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত এবং হাতে পরেছি লৌহ দস্তানা। খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব আরেকটা বড়ো দুর্ভাগ্য: ওখানে রূঢ় শক্তি আর এ ক্ষেত্রে ভোঁতা মননশীলতা জয়লাভ করে জনগণের মধ্যস্থ

আভিজাতিক প্রতিভার ওপর। হেলেনীয়পন্থী হওয়ার অর্থ রূঢ় শক্তি ও ভোঁতা মননের বিরোধী হওয়া।'*

নিট্‌শের রাষ্ট্রিক-রাজনৈতিক ধারণা বোঝার ক্ষেত্রে আভিজাতিক (উচ্চ) ও অনাভিজাতিক (নিম্ন, গণ-) সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যের একটা নীতিগত তাৎপর্য আছে। নতুন আভিজাত্য গঠন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'প্রাচীন কালের কণ্ঠস্বরের' এই রকম অর্থ করেছেন: 'উচ্চ স্তরের সংস্কৃতি দেখা দিতে পারে কেবল সেখানে, যেখানে দুটি পৃথক সামাজিক জাত আছে: কর্মীদের জাত আর অকর্মীদের জাত, যারা সত্যকার বিশ্রাম উপভোগে সক্ষম; অথবা আরো কড়া করে বললে: বাধ্যতামূলক শ্রমের জাত এবং স্বাধীন শ্রমের জাত।'** নিট্‌শে মনে করেন, এই আভিজাতিক ব্যবস্থার জাতগুলোকে হতে হবে কিছু পরিমাণে খোলাখুলি চরিত্রের (প্লেটোর রাষ্ট্রের সম্প্রদায়গুলির মতো): জাতগুলির সদস্যদের বদলাবদলি হতে পারবে — নিচু জাতের বেশি স্বাধীন ও অনুপ্রাণিত লোকেরা উচ্চ জাতে প্রবেশ পাবে, তার খারাপ নমুনাদের নামিয়ে দেওয়া হবে নিচু জাতে।

মনুসংহিতায় যে জাতিভেদমূলক আভিজাতিক ব্যবস্থার কথা আছে তার প্রশংসা করে নিট্‌শে জাতিভেদ আদর্শের জৈব প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, প্রতিটি 'সুস্থ' সমাজে তিনটি বিভিন্ন. কিন্তু পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট শারীরবৃত্তীয় টাইপ থাকে, তাদের আছে নিজ নিজ 'স্বাস্থ্যব্যবস্থা' এবং প্রয়োগক্ষেত্র: ১) প্রতিভাধর লোক -- অল্পসংখ্যক; ২) প্রতিভাধরের ভাবনাচিন্তার নির্বাহক, তাদের দক্ষিণহস্ত ও সেরা শিষ্য — আইন. শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার রক্ষক (রাজা, যোদ্ধা, বিচারক ও আইনের অন্যান্য কর্তৃপক্ষেরা); ৩) অন্যান্য মধ্যস্থ লোকেরা। তিনি বলেন: 'জাতিভেদ, ধাপ ব্যবস্থা কেবল খোদ জীবনেরই সর্বোচ্চ নিয়মকে সূত্রবদ্ধ করছে; তিনটে টাইপকে আলাদা করা প্রয়োজন সমাজকে ধারণ করার জন্য, উচ্চ ও সমুচ্চ টাইপকে সম্ভব করার জন্য।'***

সংস্কৃতি হল পিরামিড: যত প্রশস্ত আর ঘনবদ্ধ হবে তার ভিত, ততই

সুদৃঢ় হবে তার গোটা গঠন। সুদৃঢ়তাকে তিনি দেখেছেন উচ্চ সংস্কৃতি ও তার সহায়ক ধরনের রাষ্ট্রের একটা মৌল অস্তিবাচক দিক বলে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন রাষ্ট্রপাটের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তই শুধু দেন নি, মাকিয়াভেলিরও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন: 'রাষ্ট্রের কথা ধরলে মাকিয়াভেলি বলেছেন যে 'সরকারের রূপ খুবই সামান্য তাৎপর্য ধরে', যদিও অর্ধশিক্ষিত লোকেরা অন্য কথাই ভাবে। রাষ্ট্রবিদ্যার মহান লক্ষ্যই হওয়া উচিত **সুদৃঢ়তা**, যা অন্য সবকিছু ছাড়িয়ে যায়, কেননা তা স্বাধীনতার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। কেবল শাসনের পাকাপোক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিশ্চিত দীর্ঘকালীনতাতেই সম্ভব সাধারণভাবে অবিরাম বিকাশ ও উন্নতি।'* দুই ধরনের মৌলিক রাষ্ট্রপাটের মধ্যে পার্থক্য করেছেন নিট্শে — আভিজাতিক আর গণতান্ত্রিক। আভিজাতিক রাষ্ট্রকে তিনি বলেছেন উচ্চ সংস্কৃতি ও সবল জাতের লোকেদের তাপঘর। গণতন্ত্রকে তিনি বলেছেন রাষ্ট্রের পতনশীল রূপ।** নিজের শেষ দিককার একটি রচনায় নিট্শে রোম সাম্রাজ্যকে দেখেছেন 'মহান শৈলীর শিল্পের বিস্ময়কর সৃষ্টি', 'সংগঠনের অতি মহিমান্বিত রূপ' হিশেবে। বাদশাহী রাশিয়ারও উচ্চ মূল্যায়ন করেছেন তিনি। কেবল উদারনীতিবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী প্রবৃত্তি ও আদেশপ্রবণতা থাকলে, কর্তৃত্বের, ঐতিহ্যের, আগামী শতবর্ষের জন্য দায়িত্ববোধের, পুরুষানুক্রমিকতার সঙ্গে সংহতির আভিজাতিক ইচ্ছা থাকলে তবেই রোম সাম্রাজ্য অথবা রাশিয়ার ধরনের সত্যকার রাষ্ট্রীয় গঠনের অস্তিত্ব সম্ভব — রাশিয়া '**একমাত্র** শক্তি যা বর্তমানে সুদৃঢ়, যা অপেক্ষা করতে, এখনো কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম, করুণ ইউরোপীয় ক্ষুদে প্রতাপ আর স্নায়বিকতা যা জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সংকটের পর্বে পড়েছে তার বিপরীতে রাশিয়া'।***

তাঁর সমকালীন দুনিয়ায় রাষ্ট্রপাটের অবনতি যে সাধারণভাবে আভিজাতিক প্রেরণার অবনতি ও সমস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানে দাসোচিত প্রবৃত্তির প্রাধান্যের ফল, এমন একটা ধারণার পুনরাবৃত্তি তিনি করেছেন নানানভাবে। জনগণের সার্বভৌমত্বের তিনি আপোসহীন বিরোধী। সরকার সম্পর্কে পুরনো ও নতুন ধারণার তুলনা করে তিনি পুরনো ধারণাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যাতে সরকার ও জনগণকে

ধরা হয় সংগ্রামরত ও আপোসে আসা শক্তির দুই ভিন্ন ক্ষেত্র: নম্রতায় শিক্ষিত 'নিচুর' কাছে সরকার হল অভিভাবক ও শ্রদ্ধেয় 'উঁচু'। নতুন যে ধারণা অনুসারে সরকার কেবল জনগণের একটা সংস্থা, সেটাকে নিট্‌শে দুরানুমানিক বলে অভিহিত করেছেন; এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত হলে রাষ্ট্রের ভিত্তি ঝাঁকুনি খাবে ও তার পতন হবে, 'ব্যক্তিগত' ও 'সাধারণের' মধ্যে বৈপরীত্য লোপ পাবে। তিনি লিখেছেন: **'রাষ্ট্রের প্রতি তাচ্ছিল্য, রাষ্ট্রের পতন ও মরণ, স্বতন্ত্র মানুষের** উচ্ছৃঙ্খলতা (ব্যক্তি বলা থেকে আমি সাবধান থাকছি) হল রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বোধের পরিণাম; এইটাই তার মিশন।'*

রাষ্ট্রের ভূমিকার পতন-প্রবণতার উল্লেখ করে এবং সুদূর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের বিলোপের কথা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েও নিট্‌শে মনে করেন যে 'সবচেয়ে কম হলে বিশৃঙ্খলা শুরু হবে, আর বেশি সম্ভব রাষ্ট্রের চেয়েও বেশি উপযোগী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের ওপর জয়লাভ করবে'।** সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের পতনে সক্রিয় সহায়তায় নিট্‌শে আপত্তি করেন এবং আশা রাখেন যে আরো বহুকাল রাষ্ট্র টিকে থাকবে।

মানবোত্তরতার যে প্রচার নিট্‌শের জরথুস্ত্র করেন, বাহ্যত তাতে নৈরাজ্যবাদী রং যথেষ্টই আছে, কিন্তু আসলে তা উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ভাবনা, নীতিসূত্র, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চালিত। তিনি মনে করেন, বর্তমান কালটা ইতরদের দখলে, তাই বর্তমান কালের সর্বাঙ্গীণ সমালোচনা (আধুনিক রাষ্ট্র ও আইন, ক্ষমতা ও রাজনীতিও তার ভেতর পড়ে), বিদ্যমান সমস্ত মূল্যবোধের পুনর্বিচার, মানবজাতিকে নতুন শিক্ষাদান তাঁর কাছে আসন্ন নতুন অভিজাতব্যবস্থার দিকে গতির একটা অত্যাবশ্যক কর্তব্য। নিট্‌শের সমালোচনা তাই আসছে বাম দিক থেকে নয়, চরম দক্ষিণপন্থী র‍্যাডিকাল আভিজাতিক অবস্থান থেকে। স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে এক্ষেত্রে নিট্‌শের আভিজাতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ খুবই বিশেষ ধরনের, উদারনৈতিক ধারার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে তা নীতিগতভাবে পৃথক। জনগণ, জনতা, 'ইতরজন', 'পাল', 'পাল-প্রবৃত্তি' ইত্যাদির ক্রুদ্ধ সমালোচনায় এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির জনসাধারণী ব্যবস্থা থেকে পৃথক পৃথক ব্যক্তির স্বাধীনতা সমর্থনে নিট্‌শে নীতিগতভাবে স্বাধীন ও সমান ব্যক্তিদের

সম্মিলনের ঘোর বিরোধী। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অর্থ সর্বাগ্রে এই যে প্রভুত্বকারী জাতটাকে গঠিত হতে হবে অল্পসংখ্যক উচ্চ ব্যক্তিসত্তা দিয়ে। নিচুর সংহতির বিপরীতে তিনি খাড়া করেন উঁচুর জাতিগত সংহতি, যা জনতার 'পাল-প্রবৃত্তিকে' নিজেদের উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবে নতুন আভিজাতিক ব্যবস্থার সেবায়। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: 'আমার দর্শন চালিত **সোপানতন্ত্রের** দিকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নীতিসূত্রের দিকে নয়। পালের প্রবৃত্তি প্রাধান্য করবে পালে, কিন্তু তার সীমা ছাড়িয়ে যাবে না: পালের নেতাদের নিজেদের আচরণের মূল্যায়ন করতে হবে পালের মূল্যায়ন থেকে আমূল পৃথকভাবে।'* নিট্‌শের মূল্যায়নে বর্তমান কালের রাজনৈতিক জীবনে অনাভিজাতিক সর্বকিছুই হল পতনশীল, উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক। এমনকি বিসমার্কী গঠনের জার্মান সাম্রাজ্যকেও তিনি ধরেন উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাট বলে। জরথুস্ত্রের মুখ দিয়ে তিনি তাঁর সমকালীন রাষ্ট্রকে, জনতার এই 'নতুন উপাস্যকে' নস্যাৎ করেছেন। তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন: 'সমস্ত ঠাণ্ডা বিকটদের মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডাকে বলা হয় রাষ্ট্র। ঠাণ্ডা গলায় সে মিথ্যা বলে, মিথ্যা বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে। সমস্ত ভাষায় সু ও কু'য়ের মিশ্রণ — এই লক্ষণ আমি তোমাদের দিচ্ছি রাষ্ট্রের লক্ষণ হিশেবে। এই লক্ষণের অর্থ আসলে মৃত্যুর বাসনা!'** রাষ্ট্রকে 'জনগণের মৃত্যু', কেবল 'নিষ্প্রয়োজন লোকেদের' জন্য প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করে নিট্‌শের জরথুস্ত্র তাঁর শ্রোতাদের ডেকেছেন নিষ্প্রয়োজন লোকেদের মূর্তিপূজা থেকে — রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে মুক্ত হতে। 'যেখানে রাষ্ট্র শেষ হয়, সেখানে মানুষ দেখা দেয় প্রথমে যে নিষ্প্রয়োজন নয়: সেখানে শুরু হয় তাদের গান যারা আবশ্যক, সুর যা একদা ছিল, যা অপ্রত্যাহার্য। 'যেখানে শেষ হচ্ছে রাষ্ট্র, সে দিকে তাকিয়ে দেখ, ভাইয়েরা আমার! দেখতে পাচ্ছ না কি জ্যোতির্ময় আকাশ আর অতিমানবিকে পৌঁছবার সেতু?' — এই কথা বলেছেন জরথুস্ত্র'।*** এই রাষ্ট্রবিরোধিতার অর্থ মনে হয় এই যে বর্তমান রাষ্ট্রকে তিনি আভিজাতিক সংস্কৃতির সহায়ক বলে আর মানতে পারছেন না, কেননা তাঁর মূল্যায়নে, এ রাষ্ট্র নিকৃষ্টদের, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্লিবিয়ানদের হাতে চলে গেছে। মূলত ঐ একই আভিজাতিক পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিদ্রূপ করেছেন হেগেল থেকে 'জার্মানিতে বর্তমান ব্যাপার-স্যাপারের

সামনে পিঠ নোয়াবার যে ধারা' চলে এসেছে তাকে, এবং 'চীনা গবেট পুতুলের মতো যেকোনো ক্ষমতাতেই যান্ত্রিকভাবে মাথা নেড়ে সায় দেওয়াকে', তা সে তথ্য অথবা ইতিহাসের ক্ষমতাই হোক, সরকার, সামাজিক মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতাই হোক।'*

নিজের অনৈতিকতাকে নিট্শে 'সদ্গুণের মহান নীতি' বলে দেখাতে চান।** তাঁর মূল্যায়নে নিখুঁত রাজনীতির নিদর্শন হল মাকিয়াভেলিবাদ, কিন্তু সেটা অতিমানবিক, দেবত্বমণ্ডিত, তুরীয়; এ আদর্শ মানুষ কোনও দিন কার্যে পরিণত করবে না, হয়ত শুধু তার সংস্পর্শে আসতে পারে। মাকিয়াভেলিবাদী আদর্শ নিজের 'সদ্গুণের নীতিতে' প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি ধরে নিয়েছেন যে সদ্গুণের প্রভুত্বপ্রয়াসী আগেকার নৈতিকতাবাদীদের (প্লেটো সমেত) ভুল হল এই যে তাঁরা অনৈতিকতাবাদী ছিলেন না। তাঁর মতে, নৈতিক আদর্শের বিজয় দাবি করে নীতিসূত্র থেকে নৈতিকতাবাদীর মুক্তি, কেননা সমস্ত বিজয়ের মতোই সে বিজয় অর্জিত হয় একই উপায়ের সাহায্যে — বলপ্রয়োগ, মিথ্যা, কুৎসা, অন্যায্যতা দিয়ে।*** এই ধারাতেই বুঝতে হবে সমস্ত নৈতিক-রাজনৈতিক প্রশ্নে 'স্বাভাবিকতার' দিকে নিট্শের ঝোঁক, 'ঈশ্বরতত্ত্ব, নীতিসূত্র, অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর শারীরবৃত্তকে' তুলে ধরা, 'জীবন থেকে সাধারণভাবে সামাজিকতার (দোষ, শাস্তি. সততা, ন্যায়বোধ, মুক্তি, ভালোবাসা ইত্যাদির) খেয়াল দূর করার জন্য' তাঁর ডাক।**** সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও নীতিসূত্রের ক্ষেত্রে সমস্ত মূল্যবোধকে উলটো করে ধরে নিট্শে চেষ্টা করেছেন মাকিয়াভেলি রাজনীতির যে মানগুলি প্রাথমিকভাবে ইতিমধ্যেই নীতিসূত্র থেকে মুক্ত তাকে নৈতিক মূল্যায়ন ও দিশার ক্ষেত্রে 'সদ্গুণের মহান রাজনীতি' হিশেবে নতুন করে প্রবর্তন করতে।

আইনের উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক, তথা সমাজতান্ত্রিক ধারণার সমালোচনা করে নিট্শে বিকশিত করেন আইন বিষয়ে আভিজাতিক ভাবনা।

তাঁর মতে, আইন হল গৌণ একটা ব্যাপার, ক্ষমতার ইচ্ছা থেকে তা উৎপন্ন, তার প্রতিবর্তী। এই অবস্থান থেকে তিনি আক্রমণ করেন স্বাভাবিক-

বিধি মতবাদের ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রগতিশীল নানা ভাষ্যকে, বাতিল করে দেন মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুক্তি, সমতা ও ন্যায়ের ধারণা, প্রতিপন্ন করেন বিশেষ সুবিধা, প্রাধান্য ও অসাম্যের ন্যায্যতা।

নিট্শে মনে করেন, অধিকার যে আদৌ আছে, তার শর্তই হল অধিকারের অসাম্য। অধিকার হল বিশেষ সুবিধা। প্রত্যেক ধরনের অস্তিত্বেরই নিজ নিজ বিশেষসুবিধা আছে। তিনি বলেন: 'অবিচার কখনো অসমান অধিকারে নিহিত থাকে না, থাকে 'সমান' অধিকারের দাবিতে।'* তাঁর মতে, ন্যায় হল এই যে লোকে সমান নয়, তাই আইনী ন্যায় আসে বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকারে অসমতার নীতি থেকে — সেটা নির্ভর করে তারা কি প্রবল, অভিজাত উঁচু মহলের অন্তর্গত, নাকি তারা সেই জনতার 'শূন্য', যাদের তাৎপর্য ও কাজ হল পালের 'নেতা' ও 'রাখালের' সেবা, তার ওপর। ওপরতলাকে সেবার পট থেকে আলাদা করে ধরা মানুষের কোনো অধিকার, মূল্য বা দায়িত্ব থাকে না।

তাঁর মতে, আইন হল যুদ্ধ ও বিজয়ের ফল। এই বলে তিনি প্রাচীন গ্রীকদের 'আইনী প্রবৃত্তি' সূত্রবদ্ধ করেছেন যার সঙ্গে তিনি একাত্ম: 'বিজিত তার স্ত্রী, সন্তান, সমস্ত সম্পত্তি সহ বিজয়ীর অধিকারে। প্রথম অধিকার দেয় শক্তি, এমন কোনো অধিকার নেই, যার ভিত্তিটা দখল, বাজেয়াপ্তি, বলপ্রয়োগ নয়।'**

স্বাভাবিক বিধির নানাবিধ ব্যাখ্যায় আপত্তি করলেও নিট্শে চেষ্টা করেছেন যুদ্ধ ও বিজয়ীর আইন বিষয়ে, আভিজাতিক সম্প্রদায়মূলক আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে তাঁর ধারণাটাকেই সত্যকার স্বাভাবিক বিধি বলে চালাতে। আইনকে নিট্শে যেভাবে বোঝেন, তার ভিত্তিতে যে আভিজাতিক স্বাধীনতা রয়েছে, তার অর্থ 'সুখ' ও 'সমৃদ্ধি' প্রবৃত্তির ওপর পুরুষালী, জঙ্গী, বিজয়ী প্রবৃত্তির প্রাধান্য, নিজ কর্মের জন্য লোকেদের ও নিজেকেও বলিদান, উচ্চ স্তরের আবেগ ও বাকিদের থেকে নিজের ব্যবধান, নিজস্ব দায়িত্ব বোধের ইচ্ছা—এক কথায়, স্বাধীনতা—এটা হল কেবল তাই যা চাই এবং জয় করি। এই স্বাধীনতার সমার্থক হল দাবি করা ও জয় করার অধিকার।

নিট্শে মনে করেন, আবশ্যকীয় আত্মরক্ষার অধিকারের মতো আবশ্যকীয়

আগ্রাসনের অধিকারও স্বীকার করা উচিত। যুদ্ধে বিজয়ীর অধিকারে দেখা দেয় ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন ইচ্ছার মধ্যে সংগ্রামের যোগফল এবং তা আভিজাতিক আইন-শৃঙ্খলার ভিত্তির কাজ করে। উৎসের দিক থেকে আইন যদি হয় যুদ্ধের অধিকার, তাহলে প্রতিষ্ঠিত আইনে, গড়ে ওঠা আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতিতে আইনে নিবদ্ধ হয় ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন ইচ্ছার মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল, সুতরাং তাতে যুধ্যমান শক্তিদের মধ্যে কিছু একটা সম্মতি, কিছু একটা চুক্তি ধরে নিতে হয়। তিনি বলেছেন: 'চুক্তি ছাড়া আইনও থাকে না।'* এই অর্থে তিনি আইনকে বলেছেন স্বীকৃত ও প্রত্যায়িত ক্ষমতা। আইন (অধিকার, কর্তব্য) নিয়ে যুদ্ধোত্তর চুক্তি ও তার প্রতিপালনের দিকে ঠেলে দেয় বিচারবুদ্ধি, ভীতি ও সাবধানতা। চুক্তিবদ্ধ আইন অনুসারে, আমাদের যা কর্তব্য সেটা হল আমাদের ওপর অন্যদের অধিকার, আর আমাদের যা অধিকার সেটা হল আমাদের শক্তির সেই অংশটা যা অন্যেরা শুধু মেনেই নেয় নি, রক্ষাও করছে।** বীরযুগের গ্রীকদের আভিজাতিক আইনী প্রতিষ্ঠানের গুণগান করেছেন নিট্‌শে, উচ্ছ্বসিত হয়েছেন মনুর 'মানবিক আর্য' বিধানে, বর্ণব্যবস্থা বিধির কর্তৃত্বে***। তিনি লিখেছেন: '**বর্ণপ্রথা,** সর্বোচ্চ প্রভুত্বকারী নিয়ম হল কেবল **স্বাভাবিক শৃঙ্খলার** অনুমোদন, প্রথম শ্রেণীর স্বাভাবিক নিয়মবদ্ধতা, তার ওপর কোনো স্বেচ্ছাচারের, কোনো 'আধুনিক ধারণার' ক্ষমতা খাটবে না।'****

আইনের ক্ষেত্রেও আভিজাতিক মান থেকে বিচ্যুতিকে তিনি বলেছেন অবক্ষয় আর নিহিলিজম, 'সুস্থ' আইনী প্রবৃত্তি থেকে পশুপালসুলভ প্রবৃত্তিতে অধঃপতন। তাঁর সমকালীন উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, অনুজ্ঞা ও আইনকে তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন এই বলে যে তা 'পশুপালসুলভ আইনপ্রণয়ন', মাঝারি ধরনের লোকেদের জন্য তা রচিত, ব্যতিক্রমদেব বিরুদ্ধে চালিত।*****

সমস্ত মূল্যবোধের আভিজাতিক পুনর্মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ নব অভিজাততন্ত্রের গঠনের পথ সন্ধানের অবস্থান থেকে নিট্‌শে তাঁর সমকালীন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির জাতীয় রাজনীতির সমালোচনা করেছেন ইউরোপীয়দের পারস্পরিক কলহের তুচ্ছ রাজনীতি বলে। জাতীয়তায় সীমাবদ্ধ এই ওঁছা রাজনীতির মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন বিসমার্কের রাজনীতিকেও, যাতে এক সময় (১৯ শতকের ৭০-এর দশকের গোড়ায়) তিনি নিজেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাকে সমালোচনা করতে থাকেন। 'বৃহৎ রাজনীতির' ভাবনাকে প্রথম দিকে সন্দিহান ও বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে দেখার পর তাকেই তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচনায় এবং আসন্ন ভবিষ্যতের রাজনৈতিক রূপরেখা — ২০ শতকের রাজনীতির ওপর আলোকপাতে।*

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ক্ষুদ্র রাজনীতির কাল কেটে গেছে; পরবর্তী, ২০ শতক হবে বৃহৎ রাজনীতির — বিশ্ব আধিপত্যের জন্য সংগ্রামের, অভূতভূর্ব যুদ্ধের কাল। রাজনীতির বোধ নিয়ে বেধে উঠবে আত্মিক যুদ্ধ এবং মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত পুরনো সমাজের সমস্ত রাজনৈতিক গঠন চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। আসন্ন ভবিষ্যতের তেমন নিয়তিকে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিট্‌শে বলেছেন তাঁর কাছ থেকেই বৃহৎ রাজনীতির সূত্রপাত। ভবিষ্যৎ কল্পনায় তিনি নজির দিয়েছেন বিকাশের বর্তমান-প্রবণতার। অবশ্যই, তাঁর মতে, বর্তমান কালের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতি আভিজাতিক চরিত্রের সর্বজনীন অধঃপতনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাহলেও নিট্‌শে মনে করেন যে, ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন একদিকে এমন সব লোকের জন্ম দেবে যারা নতুন দাসত্বের জন্য প্রস্তুত, তখন দেখা দেবে 'সবল ব্যক্তি' — কুসংস্কারহীন, বিপজ্জনক ও আকর্ষক গুণের অধিকারী, 'টাইরান' বা 'স্বেচ্ছাচারী', যাদের ইউরোপীয় গণতন্ত্রই তৈরি করেছে অজান্তে।** অন্যদিকে বর্তমানে চলেছে বিভিন্ন জাতির ইউরোপীয়দের কাছাকাছি আসার প্রক্রিয়া, 'ভবিষ্যৎ ইউরোপীয় গঠনের প্রক্রিয়া' — এবং সেটা কোনো

কোনো পর্বে জাতীয় আবেগের প্রবল বিস্ফোরণ সত্ত্বেও। পরিণামে নিজেদের জনগণের মধ্যে অস্বাভাবিক শত্রুতায় বর্তমানে বিভক্ত ইউরোপ হবে এক।* ইউরোপের এই আগামী ঐক্যকে নিট্শে ব্যাখ্যা করেছেন যেমন বৃহৎ রাজনীতি ও মহান যুদ্ধের পূর্বাভাষ দানের প্রেক্ষিতে, তেমনি নতুন দাসত্ব ও নতুন আভিজাতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পটেও। ইউরোপীয় সমস্যাকে তিনি সমগ্রভাবে দেখেছেন 'ইউরোপের পরিচালক নতুন জাতি লালনপালনের' সমস্যা হিশেবে।**

বিকাশ প্রবণতার এইরূপ ব্যাখ্যা থেকেই বোঝা যায় কেন তিনি আভিজাতিক লালনের সমস্যায়, নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারে নির্ধারক তাৎপর্য আরোপ করেন, কেন তাঁর এই স্বকীয় ধরনের জাতি-ঊর্ধ্ব আভিজাতিক সংহতি। জাতি-ঊর্ধ্ব উচ্চকোটিবাদের এইসব অবস্থান থেকেই তিনি সমালোচনা করেন জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সীমাবদ্ধতার, এশিয়াবাসীদের প্রসঙ্গে ইউরোপীয়দের উন্নাসিকতার, জার্মানদের জাতীয় আত্মাহংকার, ফরাসিবিরোধী, স্লাভবিরোধী, সেমেটিকবিরোধী মনোভাব ও দৃষ্টি-ভঙ্গির।***

আন্তর্জাতিকতাবাদের গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ধারণার তো বটেই, ঘোর বিরোধী হলেও নিট্শে শোভিনিজম, জাতীয়তাবাদ, জাতিদম্ভেও সায় দেন না। এটা অবশ্য ঠিক যে বহুপ্রচলিত ইউরোপকেন্দ্রিকতার সমালোচনা এবং জার্মান জাতীয়তাবাদ ও জার্মানভক্তিকে একাধিকবার তীব্র আক্রমণ করলেও তিনি ভবিষ্যৎ ইউরোপীয়ের ওপর ভরসা করেছেন এবং জার্মানদের মধ্যে ঠিক সেই জাতিকে দেখেছেন যারা অতীতের ইহুদি ও রোমানদের মতো আসন্ন 'নতুন জীবনব্যবস্থাকে' গর্ভবতী করবে।**** আর যার ইতিমধ্যেই গর্ভাধান হয়েছে, নীট্শের মতে, গ্রীক আর ফরাসিরা তা কেবল প্রসব করতে পারে।

ইউরোপীয় জাতিগুলির ভবিষ্যৎ সংঘ তাঁর কাছে ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ডীকরণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে: ভৌগোলিক দিক থেকে উপযোগী সীমার মধ্যে বাস করে এক-একটা জাতি হবে নিজেদের ক্যাণ্টনীয়

অধিকারাদি সহ এক-একটা ক্যান্টনের মতো। নিট্‌শের অনেক যুক্তিতে ইউরোপীয় সংঘের প্রবণতা ছড়িয়েছে সারা ভূগোলকে এবং তিনি 'বিশ্ব ঐক্যের প্ররিপ্রেক্ষিতের' কথা, ভবিষ্যতে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি পরিচালনার একক সংস্থার অনিবার্য উদ্ভব ইত্যাদির কথা বলেছেন।* নিজের ক্ষেত্রে তিনি একাধিকবার এই কথায় জোর দিয়েছেন ও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তিনি জার্মান নন, ইউরোপীয়।

'Race' বা অধিজাতি কথাটা নিট্‌শে প্রায়ই ব্যবহার করেছেন জাতির চেয়ে বরং আভিজাতিক অর্থে। অধিজাতির প্রশ্নটা ধাপের প্রশ্ন, রক্তের নয়। তাঁর মূল্যায়নে, race-এর 'সুস্থ' স্বতঃপ্রবৃত্তি অভিজাত ওপরতলার প্রকৃতিগত।

Race কথাটাকে নিট্‌শে যেভাবে ব্যবহার করেন তাতে আভিজাতিক পরিপ্রেক্ষিতে তার জাতিগত-নরকৌলিক দিক থেকে জোরটা সরে আসে জৈব ও সামাজিক-রাজনৈতিক দিকে: সবল race হল শেষ বিচারে ক্ষমতাধরদের একটা বিশেষ প্রজাতি, অভিজাত প্রভুরা আর দুর্বল race হল জীবনশক্তিতে দুর্বল, নিপীড়িত ও পরাধীনেরা।

ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন ইচ্ছার নিরন্তর সংগ্রাম, খোদ জীবনেরই বলাত্মক চরিত্র প্রসঙ্গে নিট্‌শে বিকশিত করেছেন যুদ্ধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিও। 'যুদ্ধ' কথাটাকে প্রায়ই তিনি যথেষ্ট খুশিমতো ব্যবহার করেছেন, হেরাক্লিটাসের মতো তাতে বুঝিয়েছেন রূপলাভের প্রবাহে যেকোনো সংগ্রামকেই। এই অর্থে (ব্যাপক, হেরাক্লিটাস ধরনে) নিট্‌শের যুদ্ধ — জীবনেচ্ছার সাক্ষ্য, শান্তি — মরণেচ্ছার প্রতীক। এই রকমের দার্শনিক বিশ্ববীক্ষার দিক থেকে নিট্‌শে সর্বাগ্রে যুদ্ধের জয়গান করেন, নস্যাৎ করেন শান্তিকে। তাঁর ধারণায়, যুদ্ধ হল জীবনের বলাত্মক চরিত্রের ক্ষেত্রে বীর্যবান উত্তর, আর যেহেতু ক্ষমতার জন্য নিরন্তর যুদ্ধ তো চলতেই থাকবে, তাই তাকে নিরুদ্বেগে গ্রহণ করে নির্ভীক যোদ্ধার পৌরুষদৃপ্ত অবস্থান নিতে হবে। নিট্‌শের জরথুস্ত্র তাঁর শ্রোতাদের বলছেন: 'যুদ্ধক্ষেত্রের ভ্রাতৃদল! অন্তরের গভীর থেকে তোমাদের ভালোবাসি।... তেমনিও আমি তোমাদের সেরা শত্রু।... তোমরা যদি প্রজ্ঞানের ঋত্বিক হতে না পার, তাহলে অন্তত তার সৈন্য হও।... নিজের শত্রুকে খোঁজো, নিজের যুদ্ধ চালাও — নিজের চিন্তার জন্যে!..

শান্তিকে ভালোবাসো নতুন যুদ্ধের উপায় বলে। আর সেক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন শান্তির চেয়ে বেশি ভালোবাসো স্বল্পকালীন শান্তি।'*

জরথুষ্ট্রের এই গালভরা জঙ্গী আহ্বানকে ব্যবহারিক, বাস্তব-রাজনৈতিক সমরবাদ প্রচারের সঙ্গে এক করে দেখলে নিশ্চয় ভুল হবে, কিন্তু এগুলির শান্তিবিরোধী উদ্দীপনা শুধু নয়, 'যুদ্ধ' ব্যাপারটার প্রসারিত ব্যাখ্যানের অনুকূলে নতুন যুক্তি পাওয়া, সাধারণভাবেই যুদ্ধের গুণগান করার জন্য নিট্‌শের প্রয়াসও স্বতঃস্পষ্ট। নিট্‌শের জরথুষ্ট্র বলে যাচ্ছেন, 'তোমরা বলো শুভ উদ্দেশ্য কি যুদ্ধকেও পবিত্র করে? আমি বলছি, যুদ্ধের কল্যাণ সবকিছু উদ্দেশ্যকে পবিত্র করে। নিকটজনের জন্য ভালোবাসার চেয়ে যুদ্ধ ও পৌরুষ মহত্তর কীর্তি সাধন করেছে।... তোমরা জিজ্ঞাসা করো, — কোনটা ভালো? ভালো সাহসী হওয়া।'** যুদ্ধ বিষয়ে নিট্‌শের বহুমাত্রিক আলোচনার মূল্যায়ন নীতিগতভাবে সঠিক হবে ক্ষমতা লিপ্সা সম্পর্কে তাঁর ধারণার আভিজাতিক পরিপ্রেক্ষিতে, সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর মতবাদের আলোয়। যুদ্ধ অনিবার্য ও আবশ্যক। অধিবিদ্যার ধরনে যুদ্ধকে সমর্থন করে নিট্‌শে তাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন নতুন উচ্চ সংস্কৃতির ওপর তাঁর ভরসার সঙ্গে। '...রাষ্ট্রের কাছে যুদ্ধ তেমনি প্রয়োজন, যেমন সমাজের কাছে দাসের'।*** এই জন্যই তিনি যুদ্ধ ও সামরিক সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রের আদিরূপ বলে গণ্য করেছেন।

বাস্তব একটা রাজনৈতিক ঘটনা হিশেবে যুদ্ধকে নিট্‌শে দেখেছেন রাষ্ট্র ও সাধারণভাবে রাজনীতির ব্যাখ্যায় অনুসৃত একই নিরিখ থেকে। তিনি আভিজাতিক সংস্কৃতির সেবায় যুদ্ধের পক্ষপাতী, যুদ্ধের সেবায় সংস্কৃতির পক্ষে নন। এটা তাঁর সংস্কৃতিবাদী মূলমন্ত্র। বাস্তব যুদ্ধে অবশ্যই সাংস্কৃতিক ঋদ্ধি লোপ পায়, কিন্তু সেটাই নিয়ম; তারপর, নিট্‌শে অনুমান করেন, নতুন তেজে তা সামনে এগিয়ে দেবে আত্মিক আন্দোলনকে। 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে: বিজয়ীদের তা নির্বোধ প্রতিপন্ন করে, বিজিতদের করে বিদ্বিষ্ট। যুদ্ধের অনুকূলে বলা যেতে পারে: এই উভয় ক্ষেত্রেই তা লোককে বর্বর করে তোলে এবং তাতে ক'রে তারা হয়ে ওঠে বেশি স্বাভাবিক, সংস্কৃতির পক্ষে সেটা শীতকালীন নিদ্রা, তা থেকে মানুষ জেগে

উঠবে সু আর কু'য়ের জন্য আরো প্রবল হয়ে।'* যুদ্ধের মূল্যায়নে এই দ্বৈততার সূত্রায়ণ এ প্রশ্নে তাঁর অন্যান্য সমস্ত বিচারের বৈশিষ্ট্যসূচক। ব্যাপারটা হল এই যে ক্ষমতা লিপ্সু দুই বিপরীত পক্ষের মধ্যে যুদ্ধে তিনি মনে করেন সব বিজয়ীই যে সঠিক তা নয়: আভিজাতিক পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁর মতে, পরাজিত পক্ষও (আভিজাতিক ক্ষমতা লিপ্সা) সঠিক হতে পারে। সামরিক সমেত সাফল্যের যেকোনো ঘটনাই মূল্যের দিক থেকে সুসিদ্ধ নয়, যদিও ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিট্‌শে পুনরায় হেগেল থেকে তাঁর মতভেদ জ্ঞাপন করেছেন। 'হেগেল: তাঁর জনপ্রিয় দিকটা হল যুদ্ধ আর মহাপুরুষদের নিয়ে তাঁর মতবাদ। ন্যায় বিজয়ীর দিকে, সেই রূপ দেয় মানবজাতির অগ্রগতিকে। ইতিহাস থেকে নীতিসূত্রের প্রভুত্ব দেখাবার প্রয়াস।'**

যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করায় হেগেল ও নিট্‌শের মধ্যে ধারাবাহিকতার যে ধারণাটা প্রচলিত তার বিপরীতে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নিট্‌শে সমালোচনা করছেন যুদ্ধ সম্পর্কে হেগেলীয় মতবাদের 'জনপ্রিয় দিকটার'। তিনি যে হেগেলীয় ভাবনার বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করেছেন, আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের অভিগমন থেকে তার পার্থক্যটা দেখছেন না তাতে আসলে কিছু এসে যায় না। হেগেল অবশ্যই তা থেকে অনেক দূরে, কিন্তু নিট্‌শের সংস্কৃতিবিদ্যার কাছে হেগেল হলেন আশাবাদী ইতিহাসপন্থী, নীতিসূত্র ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্কের অন্যান্য ভাষ্য থেকে তাঁর পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিট্‌শের মতে, উচ্চ সংস্কৃতিগুলি সামনের দিকে বিকাশমান ইতিহাসের সংযোগ ধাপনয়, ঐতিহাসিক পট থেকে যেন তা বিচ্ছিন্ন, অবিরাম প্রত্যাবর্তনের কালানুক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নিট্‌শে কর্তৃক যুদ্ধের ঐতিহাসিক নয় (তার যেকোনো ভাষ্যে), সংস্কৃতিবাদী অনুমোদনে শেষ বিচারে সূচিত হয় উচ্চ সংস্কৃতির অবিরাম প্রত্যাবর্তনের কারিকা হিশেবে তার সমর্থন, ঐতিহাসিক গতির ঘটনা হিশেবে নয়। সাংস্কৃতিক কারিকা হিশেবে যুদ্ধ নীতিগতভাবেই ঐতিহাসিক ঘটনারূপ যুদ্ধ থেকে পৃথক, আর যে যুদ্ধে সংস্কৃতির ক্ষতি হয়, তাকে যে নিট্‌শে প্রায়ই আক্রমণ করেছেন সেটা বুঝতে হবে কেবল এই পার্থক্যের প্রেক্ষিতেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এইরূপ অর্থই ছিল 'বিজয়ীর দাম্ভিক চেতনার' বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ, আর

সেইসব জার্মানদের নিয়ে তাঁর উপহাসের পেছনে, যারা ফরাসিদের সঙ্গে সফল যুদ্ধের পর 'পরস্পর পাল্লা দিয়ে যুদ্ধের গৌরব গাওয়ার চেষ্টা করছে আর নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও শিল্পের ওপর তার প্রভাবের প্রবল প্রকাশ নিয়ে মেতেছে সোল্লাসে'।* এই ধারাতেই নিট্‌শে উল্লেখ করেছেন 'বর্তমানে যার অত প্রশংসা করা হচ্ছে, সেই জাতীয় ফৌজের মহা অপকারের' কথা, যা উচ্চতম, শ্রেষ্ঠ লোকেদের জলাঞ্জলি দিচ্ছে এবং বিদ্রূপ করেছেন 'স্থূল রোমক দেশপ্রেমের' আধুনিক প্রকাশকে।**

সেই সঙ্গে নিট্‌শে বাস্তব-ঐতিহাসিক যুদ্ধ এবং সাধারণভাবে সামরিক ব্যবস্থাদি সমর্থন করেছেন সেখানে, যেখানে তিনি মনে করেন যে, সামরিক-ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁর সাংস্কৃতিক ধারণার অনুকূলে সক্রিয়। তিনি লিখছেন: 'আমায় **আনন্দ দেয়** ইউরোপের সামরিক বিকাশ, তথা অভ্যন্তরীণ অবস্থায় অরাজকতা: এ শতকের জন্য গালিয়ানি যে শান্তি ও চৈনিক আমলের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সে যুগ বিগত।... চমৎকার পুরুষেরা আবার সম্ভব হয়ে উঠছে।'***

ভবিষ্যৎ আভিজাতিক সংস্কৃতির সৃষ্টিতে সাহায্য করবে বিশ শতকের মহাযুদ্ধগুলিও।

নিট্‌শে ঘোরতর সমাজতন্ত্রবিরোধী, কমিউনিজমবিরোধী।

তিনি মনে করেন, গোটা ইউরোপীয় সংস্কৃতি বহুদিন থেকে মূল্যবোধের সংকটে ভুগছে, এগিয়ে চলেছে বিপর্যয়ের দিকে। ''বর্তমানের ধ্যানধারণা' আর তাদের সংগুপ্ত অরাজকতা থেকে,' লিখেছেন তিনি, 'সমাজতন্ত্র সত্যিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।'****

গোটা সামাজিক প্রশ্নটাকে নিট্‌শে মনে করেন বর্তমান মানুষের অবক্ষয়, পরার্থবাদ আর পেলবতার, এবং প্রভুত্ব ও দাসত্বের আভিজাতিক সম্পর্ক না থাকার ফল। এই অবস্থান থেকে তিনি তীব্র আক্রমণ করেছেন যেমন বর্তমান সরকারি সমাজকে, তেমনি শ্রমিক প্রশ্নের প্রতি তাদের মনোভাবের জন্য সমাজতন্ত্রীদেরও। তিনি বিলাপ করেছেন যে নিজেদের জীবনযাত্রায় তুষ্টিবোধ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে শ্রমিকদের, তাদের করে তোলা হয়েছে জঙ্গী আর প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাদের দেওয়া হয়েছে ভোটের, সমিতি

গঠনের এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার, এতে ক'রে তাদের তৈরি করা হয়েছে দাসত্বের জন্য নয়, প্রভুত্বের জন্য।*

বিপ্লব ও নিপীড়িতদের অভ্যুত্থানে তিনি আপত্তি করেন, মনে করতেন যে সেটা সংস্কৃতির পক্ষে বিপদ। সরোষে এবং অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তিনি ভবিষ্যতে জনগণের অনিবার্য বৈপ্লবিক অভিযানের হুঁশিয়ারি দেন। জরথুস্ত্রের উক্তি দিয়ে তিনি সেই যুগের ভয় দেখিয়েছেন, যখন জনতা হয়ে দাঁড়াবে প্রভু, এবং নিজের অনুরাগীদের, নতুন অভিজাতদের ডাক দিয়েছেন জনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, নিজেরাই ভবিষ্যতের প্রভু হয়ে উঠতে: শ্রেষ্ঠদের প্রভুত্ব করা উচিত। অন্য একটা রচনায় তিনি লিখেছেন: 'সামনের শতককে জায়গায় জায়গায় পেটের রীতিমতো 'শূলবেদনায়' ভুগতে হবে আর যে প্যারিস কমিউন পেয়েছে এমনকি জার্মানিতেও তার উকিল ও সমর্থকদের তা হয়ে থাকবে ভবিষ্যতের তুলনায় কেবল একটা লঘু 'বদহজম'।'** উনি তাহলেও আশা রাখেন যে শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের ওপর জয়লাভ করবে সম্পত্তিমালিকের স্বতঃপ্রবৃত্তি।

সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর পরম বিদ্বেষ তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর পাঠকদের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক ভাবনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যঙ্গাত্মক প্রচার প্রথম শুরু করেন প্রবলভাবে, তিনি তাঁদের অন্যতম। এই দৃঢ়প্রত্যয়ী সমাজতন্ত্রবিরোধীর কাছে একটা পরীক্ষা হিশেবে সমাজতন্ত্র এমনকি বাঞ্ছনীয়ও। তিনি লিখেছেন: 'আর সত্যিই, আমার ইচ্ছে হয় যে কয়েকটি বড়ো বড়ো দৃষ্টান্তে দেখানো হোক যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে জীবন নিজেই নিজেকে নাকচ করছে, নিজেই নিজের শিকড় কেটে ফেলছে।'*** তিনি উল্লেখ করেছেন, এরূপ ব্যবহারিক শিক্ষাদান বিপুল বলিদান দাবি করলেও তা অবাঞ্ছনীয় হবার পক্ষে পৃথিবী অনেক বৃহৎ আর জনসংখ্যা বড়ো বেশি অপরিমিত।

তাঁর জীববিদ্যামূলক সংস্কৃতিতন্ত্র অনুসারে, সমাজ সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীদের ধারণা সমাজের সোপানতন্ত্রে নিম্নতম। নিট্শের মতে, নিপীড়িতদের দাবির ক্রমরূপান্তর এইরকম: প্রথমে তারা দাবি করবে ক্ষমতাধরদের কাছ থেকে ন্যায়; তারপর স্বাধীনতার কথা বলে চাইবে ক্ষমতাধরদের কাছ থেকে অব্যাহতি; তারপর সমাধিকার দাবি করে নিজেরা

ভারাধিক্য না পাওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করবে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতাপ বৃদ্ধিতে বাধা দিতে; আর ক্ষমতায় এসে তারা স্থাপন করবে 'পশুপালের' স্বেচ্ছাচার।

নিপীড়িতদের বিরুদ্ধে, তাদের নীতিসূত্র ও ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে এই আক্রমণকে নিট্‌শে পরিপূরিত করেছেন এই দৃঢ়োক্তি দিয়ে যে সমাজতন্ত্রীরা আইন ও বিচারব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। আভিজাতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবস্থান থেকে তিনি মন্তব্য করেন যে সমাজতন্ত্রীরা একব্যক্তিক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক দাবি, অধিকার ও বিশেষ সুবিধা অগ্রাহ্য করে খোদ আইনকেই নাকচ করছে, কেননা 'সাধারণ সমতার পরিস্থিতিতে অধিকারের কোনো দরকার থাকবে না কারো।'

সমাজতন্ত্রের আমলে আইনপ্রণয়নকে তিনি চিত্রিত করেছেন অত্যন্ত কালো রঙে আর পক্ষপাতদুষ্টতায়। সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: 'ওরা যদি কখনো নিজেরাই **আইন** জারি করতে থাকে, তাহলে নিশ্চিত থাকা যায় যে ওরা নিজেদেরই লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধবে এবং দাবি করবে ভয়ঙ্কর শৃঙ্খলা — **ওরা নিজেদের চেনে!** আর এসব আইনকে তারা মানবে এই চেতনায় যে এসব আইন তারা নিজেরাই জারি করেছে।'*

রাজনৈতিক সংগঠন বিষয়ে সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও এই আভিজাতিক মনোভাব সুপ্রকট। নিট্‌শের মতে, বিদ্যমান সমস্ত রাষ্ট্রের অপসারণে চেষ্টিত সমাজতন্ত্র 'চূড়ান্ত সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে কেবল সংক্ষিপ্ত ও আপতিক অস্তিত্বের ভরসা করতে পারে'**। সমাজতন্ত্রকে তিনি দোষী করেছেন একই সময়ে রাষ্ট্রপাটের প্রতি শত্রুতায় আর রাষ্ট্রক্ষমতার স্বৈরাচারী পূর্ণতার দিকে প্রয়াসের জন্য। নিজের ভয়াবহ পূর্বাভাষে সমকালীনদের ভয় দেখিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রের আমলে ব্যক্তিসত্তার ধ্বংস, সামাজিক সংঘের উপযোগী সংস্থায় তাদের রূপান্তর, পরম রাষ্ট্রের নিকট সমস্ত নাগরিকের বিশ্বস্ত বশ্যতার এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে শুধু সমাজতন্ত্রের নয়, সর্ববিধ উদারনৈতিকতা ও গণতান্ত্রিকতার এই প্রকাশ্য শত্রুর অশুভ দিব্যবাণীগুলো পরবর্তী কালে লুফে নেয় কমিউনিজমের ভাবাদর্শ ও কাজকর্মের নানা ধরনের সমালোচক, উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক মতাদর্শীরাও তার অন্তর্ভুক্ত। এটা চিত্তাকর্ষক যে কমিউনিস্টবিরোধী এইসব যুক্তির উৎসমূলে দাঁড়িয়ে আছে আভিজাত্য ও নব-দাসত্বের প্রবক্তা।

মার্কসবাদ আর নিট্‌শেবাদ তাদের বিশ্ববীক্ষীয়, ভাবাদর্শীয়, সামাজিক

ও রাজনৈতিক-আইনী নীতি, ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে একেবারে বিপরীত মেরুপ্রান্তিক। সেই জন্য অতীতে এবং বর্তমানেও যা দেখা যায়, নিট্শেবাদ আর মার্কসবাদকে 'একই সাধারণ তন্ত্রে' অংশত বা পুরোপুরি মেলাবার*, ব্যক্তিসত্তা বিষয়ে নিট্শীয় ও মার্কসীয় আদর্শের সমান্তরালতা খোঁজা, ইত্যাদির প্রয়াস নীতিগতভাবে অসিদ্ধ।

তাঁর জীবদ্দশায় নিট্শের রচনা ছিল স্বল্পজ্ঞাত। যেমন, জরথুস্ত্র সম্পর্কে বইটা প্রকাশিত হবার পর তা কেনে মাত্র কয়েক ডজন লোক। কিন্তু ৯০-এর দশকের পর থেকে তাঁর রচনায় আগ্রহ ক্রমেই বাড়তে থাকে আর বিশ শতকের গোড়ায় তাঁর ভাবনা-ধারণায় আকর্ষণ হয় খুবই ব্যাপক এবং প্রবল। শুরু হয় সেই সময়টা, সমকালীনদের উপেক্ষাক্ষুব্ধ নিট্শে যার স্বপ্ন দেখেছিলেন: 'কেবল আগামী দিনটা আমার। কেউ কেউ জন্মায় তাদের মৃত্যুর পরে।'**

দুই শতকের সন্ধিক্ষণে সমগ্রভাবে নিট্শে সম্পর্কে এমন একটা ধারণা বহুল প্রচলিত ছিল যে তিনি 'অরাজনৈতিক' ব্যক্তি ও লেখক, রাজনীতি-ঊর্ধ্ব 'আত্মার অভিজাত'। নিট্শের আভিজাতিক মতবাদে নানা ধরনের আকর্ষণের এই যে পরিস্থিতি তখনো পুরো সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে নি, তাতে বাড়তে থাকে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির কালে রূপলাভ করে নিট্শের উত্তরাধিকারের জাতিবাদী-রাজনৈতিক ভাষ্যের প্রবণতা। ক্ষমতা লিপ্সা, মহাযুদ্ধ আর বৃহৎ রাজনীতি, প্রুশীয় সৈনিক আর শৃঙ্খলা, জার্মান প্রাণের ব্রত ইত্যাদি নিয়ে তাঁর প্রশংসা লুফে নেয় অভ্যন্তরীণ বলপ্রয়োগ ও বহিরাগ্রাসনের মতাদর্শীরা, 'মহান জার্মানির' জন্য যোদ্ধারা।

দার্শনিক-তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু কুণ্ঠা রেখে নিট্শীয় মতবাদের ধারণা গ্রহণ, অভিযোজন এবং বিশ শতকের গোড়ায় ও প্রথম দশকগুলির আত্মিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কথা মনে রেখে ঈষৎ রূপান্তরিত করেন জীবনের দর্শনের প্রতিনিধিরা (ভ. ডিলটেই, গ. জিম্মেল, ম. শেলার)***। এই দিকে বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠেন সে সময়কার ও. স্পেঙ্গলার, ল. ক্লাগেস, এ. ইউঙ্গার, আ. মেল্লার প্রভৃতির মতো নামকরা লেখকেরা। তাঁদের প্রয়াসে

বর্তমান কালের মহান দার্শনিক হিশেবে চিত্রিত নিট্‌শের বনিয়াদী ভাবধারাগুলি স্থান পায় শুধু বিদ্যায়তনিক পুঁথিতে নয়, পরিণত হয় রাজনৈতিক সাহিত্য ও ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে দার্শনিক দিক দিয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ দিশারিতে।

যেমন, জার্মান দার্শনিক এ. ইউঙ্গারের রচনায় ক্ষমতা লিপ্সা যা পরিণত হয়েছে সর্বশক্তিমত্তার ইচ্ছায়, তা নিট্‌শের যুদ্ধ, আভিজাতিক সোপান, প্রভু জাতি, নতুন শৃঙ্খলা ও মানবোধের্বর প্রশংসার সূত্র ধরে পেঁৗছে গেছে সর্বাত্মক সৈন্য প্রস্তুতি ও ফ্যুরার (নেতার) ক্ষমতার ধারণায়।*

ফ্যাসিজম ও নাৎসিবাদের ভাবাদর্শীরা নিট্‌শেকে তাদের অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেছে। জনতার হুজুগকে আশ্রয় করা ফ্যাসিজম ও নাৎসিবাদের সঙ্গে নিট্‌শে মতবাদের যেসব দিক স্পষ্টতই মেলে না (আভিজাতিকতা; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য; জনপুঞ্জ, জনগণ, জনতা, 'পালের' খোলাখুলি বিরূপতা; জার্মান জাতিবাদের সমালোচনা; ইহুদিদের উপর কিছু কিছু আক্রমণ সত্ত্বেও একাধিক বার ইহুদি জাতির উচ্চ মূল্যায়ন প্রভৃতি), সেগুলি এড়িয়ে গিয়ে তারা নিট্‌শেবাদ ও নিজেদের ভাবাদর্শের মধ্যে মিল ও ক্রমানুবর্তনে জোর দিয়েছে। নিট্‌শের ভাবধারার (প্রভু জাতি, নব-শৃঙ্খলা, জাতীয় ব্রত, অতিমানবিকতা, ক্ষমতা লিপ্সা ইত্যাদি) ব্যাখ্যা তারা করেছে নাৎসিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে। জার্মান দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বড়ো ও জনপ্রিয় নামের মধ্যে নাৎসি ভাবাদর্শের কাছে বেশি কাজে লেগেছেন নিট্‌শে — সেটা যেমন তাঁর বহু যুক্তি ও বক্তব্যের বিষয়বস্তুর জন্য, তেমনি নাৎসি ভাষ্য ও রদবদলের পক্ষে তাঁর মতবাদের সেইসব সহজসাধ্য দিকের জন্যও, যা সত্যিই নিট্‌শেবাদ আর নাৎসিবাদের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের সাক্ষ্য দেয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নাৎসি ভাবাদর্শীরা (আ. রোজেনবার্গ, আ. বোইমলার প্রভৃতি) বিশেষ করে তুলে ধরেছেন ভূতপূর্ব জার্মান রাষ্ট্রিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নিট্‌শের সমালোচনা, যেটা পুরনো আমল সম্পর্কে তাঁদের নিজেদেরও বিরূপতা ও নতুন, 'সত্যকার জার্মান' ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াসের সঙ্গে খাপ খায়। যেমন. বিসমার্কের রাইখকে পর্যন্ত আ. রোজেনবার্গ বলেছেন, ওটা নিছক বাহ্যিক-রাষ্ট্রিক একটা গঠন। রাষ্ট্রপাট

সম্পর্কে নিট্শে আর নাৎসিদের ধারণার যে মূলগত দিকটা এক, সেটা হল রাষ্ট্রকে সমুচ্চ লক্ষ্য, বিকাশের স্বসার্থক লক্ষ্য বলে নয়, অন্য লক্ষ্য সাধনের উপায় বলে দেখা: নিট্শের কাছে অন্য সেই লক্ষ্যটা হল উচ্চ, আভিজাতিক সংস্কৃতি; নাৎসিদের কাছে — নৃকুল-জাতীয় সর্বগ্রাসী শক্তি রূপে তাদের ভাবাদর্শীয় মানের রূপায়ণ।

নিট্শে মতবাদের 'প্রগাঢ়তম অর্থ' রোজেনবার্গ লক্ষ করেছেন পূর্বতন উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তাঁর বিরূপতায়, নতুন ব্যবস্থার জন্য কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শিক্ষাদানের জন্য তাঁর আহ্বানে, আইন ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে জাতিগত অভিমুখ সমর্থনে: সেটা তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেছিলেন ১৯৩৪ সালে জার্মান আইন আকাদেমির দার্শনিক-আইনী বিভাগ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাঁর বক্তৃতায়।*

নিট্শে যে রাষ্ট্রকে লক্ষ্য হিশেবে নয়, ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের উপায় ও প্রতিভার হাতিয়ার হিশেবে দেখেছিলেন, সেটাকে আ. বোইমলার মনে করেন তাঁর সমস্ত ধ্যানধারণার চাবিকাঠি এবং মর্মার্থের দিক থেকে সত্যকার জার্মান। একই প্রকার নীতিসূত্র নেই, আছে প্রভুর নৈতিকতা আর দাসের নৈতিকতা, এ মতবাদও, তাঁর মূল্যায়নে, বিকশিত হয়েছে জার্মান শিকড় থেকে। নিট্শের প্রধান প্রধান ভাবধারার ব্যাখ্যায় (ক্ষমতা লিপ্সা, আভিজাতিক ধাপ ও সোপানতন্ত্র, অতিমানবিকতা, বৃহৎ রাজনীতি প্রভৃতি) জার্মান গবেষক বোইমলার তাঁর 'বীর্যবান বাস্তববাদ' ও 'জার্মানিকতার' জয়গান গেয়েছেন নাৎসি জাতিবাদী প্রেরণায়।**

আইন ও ব্যবহারশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নিট্শের ভাবনাকে নতুন পরিস্থিতিতে কিছু রদবদল করে একইভাবে কাজে লাগিয়েছেন গ. নিকোলাই, তিরালা, গ. দাখ্ম, ক. মিখায়েলিস, ক. হেইনট্সে প্রভৃতিরাও। তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় নাৎসিবাদের প্রেরণায় বর্ণবাদী দিকে পালটানো ব্যবহারশাস্ত্র হিটলারী আমলের সেবায় লেগেছিল।

অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে নাৎসি আইনপ্রণয়ন ও ফৌজদারি আইন তত্ত্বের সঙ্গে নিট্শের দৃষ্টিভঙ্গির 'বিস্ময়কর, দৃষ্টি-আকর্ষক মিলের' কথা লিখেছেন জার্মান বিজ্ঞানী, ব্যবহারশাস্ত্রে ডক্টর ক. হেইনট্সে। জাতিকুল (race),

দোষ ও জবাবদিহি বিষয়ে, 'অপরাধী জাতিকুল', 'কৌলিক বিশুদ্ধতা' ও 'সুস্থতা', 'অসুস্থ' জাতদের নির্মম উৎপাটন ইত্যাদি বিষয়ে নিট্শের বক্তব্যগুলি কেবল নাৎসিদের ক্ষমতালাভের কালেই আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে — এই বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন হেইনট্সে।*

ফ্যাসিজম ও হিটলারী রাইখের সামরিক বিপর্যয়ের পর শুরু হয়েছে নিট্শের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যার নতুন পালা। সোজাসুজি নাৎসি ভাষ্য সরে গেছে অতীতে। নিট্শের মতবাদের নাৎসি ব্যাখ্যানের যথৌচিত্য বা অযথৌচিত্য নিয়ে নিট্শের পক্ষপাতী ও বিরোধীদের মধ্যে বিতর্ক বেধে যায় এবং আজ অবধি তা চলছে। নিট্শে সম্পর্কে নতুন পথের সন্ধান ও অভিগমনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পশ্চিমে তাঁকে নিয়ে আগ্রহের নতুন একটা জোয়ার, ঘটেছে নিট্শের নতুন 'উজ্জীবন'। নাৎসিবাদের ভাবাদর্শ ও ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে নিট্শে মতবাদের বিজড়ন থেকে উদ্ধার করে তাঁর 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার' পক্ষপাতীরা ফের তাঁকে বলছেন বর্তমান কালের শেষ প্রামাণ্য ও মহান দার্শনিক আর সমালোচক। পশ্চিম জার্মানির ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ক. লেভিট ঘোষণা করেছেন যে নিট্শের নাৎসি ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ভুল, দার্শনিকের আসল দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতি। যেমন, লেভিট মনে করেন, বোইমলার নিট্শের 'ক্ষমতার জন্য ইচ্ছাকে' পরিণত করেছেন 'ক্ষমতা রূপে ইচ্ছায়', তাছাড়া সেটাকে 'নিরন্তর প্রত্যাবর্তনের' দার্শনিক প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। তার ফলে দাঁড়ায়, যেন শক্তির নগ্ন বিস্ফোরণে উচ্চতম ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব; এরূপ নাৎসিবাদী ব্যাখ্যা স্বয়ং নিট্শের ভাবনার বিরোধী।** নাৎসি লেখকেরা যে নিট্শের 'ক্ষমতা লিপ্সার' মূলত দার্শনিক, অরাজনৈতিক ভাবনার রাজনৈতিক-ভাবাদর্শীয় বিকৃতি ঘটিয়েছে, এইরকম একই কথা বলেছেন তাঁর ডক্টর থিসিস সমর্থনে পশ্চিম জার্মানির গবেষক ভ. রিজ-ও।***

হেরাক্লিটাস ধরনে 'অবিরাম নতুন অবস্থানধারী' মনীষী হিশেবে নিট্শের চরিত্রায়ণ করেছেন পশ্চিম জার্মানির পণ্ডিত ক. এমগে, প্রাচীন কাল, সংস্কৃতি, দর্শনের ভূমিকা ইত্যাদির সমস্যায় তাঁর ভাবধারার প্রাসঙ্গিকতার

উল্লেখ করেছেন তিনি।* নিট্‌শের নিকট শেখার ডাক দিয়ে তিনি রাজনীতিক ও সংস্কৃতি-কর্মীদের কাছে তাঁর বিশ্ববীক্ষার যে ভূমিকা তার সমুচ্চ প্রশংসা করেছেন।

প্রমুখ জার্মান দার্শনিক ক. ইয়াস্পার্স নিট্‌শে মতবাদের যে অস্তিবাদী (existentialist) ব্যাখ্যা করেছেন তাতে প্রাধান্য পেয়েছে দার্শনিক দিকটা। রাষ্ট্র, যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে নিট্‌শের দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি দেখিয়েছেন মানবিক অস্তিত্বের সর্বজনীন সীমার সূচক ও তার ওপর দার্শনিক আলোকপাত হিশেবে**। কখনো নিট্‌শের, কখনো তাঁর বলে ধরে নেওয়া 'সীমান্তবর্তী পরিস্থিতির' অবলোকনে জোর দিয়ে ইয়াস্পার্স মনে করেন যে নিট্‌শে 'শান্তির শত্রু নন, যুদ্ধের প্রশংসা তিনি করেন নি'। তাঁর মতে, নিট্‌শে শান্তির ভাবনায় এমনকি নিমগ্নই ছিলেন, তবে শান্তিসর্বস্ববাদ বা সর্বজনীন নিরস্ত্রীকরণের পথ দিয়ে নয়। শান্তি সম্পর্কে নানান ইউটোপিয়ার বিপরীতে নিট্‌শে উপস্থিত করেছেন তাঁর নিজস্ব বক্তব্য: সম্ভব যে সেই মহাদিবস আসবে, যখন যুদ্ধ ও বিজয়ে চিহ্নিত জাতি অন্য জাতির কাছে ঘোষণা করছে যে তারা স্বেচ্ছায় তাদের তরবারি ভেঙে ফেলছে — আর সেটা হবে সত্যকার শান্তির উপায়। নিট্‌শের এই কথাগুলো উদ্ধৃত করে ইয়াস্পার্স তাকে তাঁর 'শান্তির বীর্যবান ভাবনা' বলে অভিহিত করেছেন।***

শান্তি সম্পর্কে নিট্‌শের বিরল কয়েকটি অস্তিবাচক উক্তির ওপর জোর দেওয়ায় ইয়াস্পার্সের নিট্‌শে ব্যাখ্যা একটা শুভ স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, বিশেষ করে যদি ৩০-এর দশকে হিটলারী জার্মানির পরিস্থিতির কথা মনে রাখি, কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালেও তার পুনরাবৃত্তিতে তা তার আগেকার পরিস্থিতিগত সুবিধা হারায়, যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে নিট্‌শের সমগ্র যুক্তির ক্ষেত্রে তা যথোচিত হয় না।

নিট্‌শে ও বিসমার্কের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আলোকপাত প্রসঙ্গে ট. শিডার এই থিসিসে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে নিট্‌শে আর বিসমার্ক সর্বগ্রাসী একনায়কত্বের পূর্বপ্রবক্তা ও আয়োজক। সার্বিক ইউরোপীয় ডামাডোলের

রাজনীতিক হিশেবে বিসমার্কের পক্ষে এ ভূমিকা খাটে না, কিন্তু নিট্শের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে যদিও তিনিও নতুন ইউরোপের কথা বলেছেন, তাহলেও, কী করে এই অভিজাত 'প্লিবিয়ান আধিপত্যকে' নাৎসি অর্থে বুঝতে পারেন, তা অস্পষ্ট থেকে যায়। তবে 'রাশিয়ার বিপজ্জনক বৃদ্ধির' ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনি নিট্শের 'সত্যকার পয়গম্বরের' গুণ স্বীকারে রাজি। পরবর্তী ইতিহাসে নিট্শে ও বিসমার্কের ভূমিকা সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্ত তিনি সূত্রবদ্ধ করেছেন খুবই চাতুর্যে: 'বর্তমানের ইউরোপ, বিশ্ব নিট্শে বা বিসমার্কের ইউরোপ, বিশ্ব নয়, কিন্তু উভয়ই, হেগেলের কথায়, 'অপসারিত', অর্থাৎ 'অতিক্রান্ত' আর সেই সঙ্গে 'সংরক্ষিত'।'*

নিট্শে মতবাদের যুদ্ধোত্তর পরিব্যাখ্যানে তাঁর বৃহৎ রাজনীতি, ক্ষমতা লিপ্সা, উচ্চ সংস্কৃতি ইত্যাদি ধারণাকে প্রাচ্যের বিপরীতে পশ্চিমের পরবর্তী বিকাশের পথ নির্দেশে, 'জনগণের জবরদস্তি', আধুনিক নিহিলিজম, শান্তিসর্বস্ববাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, এক কথায় নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পশ্চিমের বিকাশের যুক্তিযুক্ত কমিউনিস্টবিরোধী পরিপ্রেক্ষিত সন্ধানে কমিউনিস্টবিরোধী শক্তি সংহত করার কাজে লাগানোর একটা ধারা সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছে, (ভ. ভেইমান-ভেইয়ে, ব. নল, ইয়ে. শ্ভার্টস, ভ. এরলিখ, ভ. শ্লাম প্রভৃতি)।

নিট্শেবাদের সমালোচনা, ফ্যাসিজম ও নাৎসিবাদের বীভৎসতার জন্য তাঁর দায়িত্বের উল্লেখ আছে ব. রাসেল, ও. ফ্লাকে, ফ. গ্রুম, এ. সাণ্ডভস প্রভৃতি লেখকদের রচনায়।**

ট. মান তাঁর সুপরিচিত 'আমাদের অভিজ্ঞতার আলোয় নিট্শের দর্শন' প্রবন্ধে (১৯৪৭) নিট্শের অতিমানবকে বলেছেন 'ফ্যাসিস্ট নেতার আদর্শায়িত মূর্তি', তাঁর মতে, নিট্শে নিজেই তাঁর সমস্ত দর্শনে 'ইউরোপে ও সারা বিশ্বে ফ্যাসিজমের পথ প্রদর্শক এবং আত্মিক স্রষ্টা ও পূর্বসূরী ছাড়া বেশি কিছু নন।' সেই সঙ্গে তাঁর নাৎসি ভাষ্য থেকে স্বয়ং নিট্শেকে পৃথক করতে গিয়ে মান মনে করেছেন যে শক্তির দার্শনিক বন্দনায় নিট্শে সংবেদ্য ভূকম্প যন্ত্রের মতো অনুভব করেছিলেন কেবল আসন্ন বিপদের

প্রথম লক্ষণ, পশ্চিমী দুনিয়াকে খবর দিয়েছিলেন নিকটাপন্ন ফ্যাসিস্ট যুগের। তিনি লিখেছেন: '...আমার যা মনে হয়, নিট্শে ফ্যাসিজমের স্রষ্টা নন, বরং ফ্যাসিজমই নিট্শের স্রষ্টা। আমি বলতে চাই যে নিট্শে মূলত রাজনীতির কাছে অনাত্মীয়, ফ্যাসিজমের জন্য তিনি দায়িত্বভাজন হতে পারেন না...'*। পরে তিনি নিট্শেকে বলেছেন মানবিকতাবাদী, তাঁর নৈতিকতার সমালোচনাকে — আলোকপ্রাপ্তি যুগের শেষ রূপান্তরণ, আর যুদ্ধের স্তুতিকে — যুদ্ধ না-জানা লোকের উৎকল্পনা।

নিট্শেবাদ সম্পর্কে ট. মানের সমালোচনামূলক মনোভাব, সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতবাদের তাৎপর্য উপলব্ধি ও মূল্যায়নের গুরুত্ব মেনেও এ কথা বলা উচিত যে নিট্শেকে অরাজনীতিক বলে দেখানোটা অতিসরলীকরণ। নিট্শের নিজের উদ্ধৃতি থেকে তাঁর 'অরাজনৈতিকতার' ব্যাখ্যা করা যায় নানাভাবে, কিন্তু গ্রহব্যাপী, বৃহৎ রাজনীতির যে লক্ষ্য ছিল নিট্শের মতবাদে (অভিজাত উচ্চ সংস্কৃতির স্বার্থে), সেটাকে মনে রাখতে হবে।

'আগামী কালের' জন্য রচিত সক্রিয় এক কর্মসূচি থেকে নিট্শের মতবাদকে নেহাৎ তাঁর যুগের প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় পরিণত করা ঠিক হবে না। যে আহবান নিট্শে জানিয়েছিলেন তা অবশ্যই শুনেছিল কেবল তাঁর অনুরাগীরাই নয়, বিরোধীরাও আর তারা যদি তদুপযোগী তরঙ্গে মন দিত তাহলে তারা নব আভিজাত্য সম্পর্কে নিট্শের প্রতিশ্রুতিকে অনুবাদ করে নিতে পারত নিজেদের ভাষায় আসন্ন বিপদের সংকেত হিশেবে এবং তাঁর ভূকম্প তথ্যকে নিজেদের মতো করে কাজে লাগাতে পারত। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় শক্তি ও প্রবণতার মধ্যে সংগ্রামের সত্যকার ঐতিহাসিক চিত্রের অতি সরলীকৃত এই ছক থেকেও এ কথা আসে না যে তিনি জেদের সঙ্গে এবং 'অকালে' (নিজের কালের বিপরীতে, অন্য ভবিষ্যতের জন্য) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার রূপায়ণের জন্য নৈতিক দায়িত্ব থেকে নিট্শে মুক্ত।

নির্দিষ্ট একটা পরিপ্রেক্ষিত, যথা, আভিজাতিক, গণতন্ত্রবিরোধী ইত্যাদি পরিপ্রেক্ষিত আঁকড়ে থাকাই হল মূল্যবোধগুলির নিট্শে কৃত সমস্ত পুনর্মূল্যায়নের, তাঁর সমস্ত 'হ্যাঁ' ও 'না'-এর মূলনীতি।

নামের সূচি

মধ্যপন্থার ভাবাদর্শী; প্রথম দিকে মার্কসবাদী, পরে নীতিদ্রোহী। —৪৭

কান্ট (Kant), **ইম্মানুয়েল** (১৭২৪-১৮০৪) — জার্মান ক্ল্যাসিকাল দর্শনের প্রমুখ প্রতিনিধি। — ১১, ৩৩, ৩৭, ৪৪, ৭৫

কাবে (Cabet), **এতিয়েন** (১৭৮৮-১৮৫৬) — ফরাসি প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট। — ৭৬

কাভেলিন, কনস্তান্তিন দমিত্রিয়েভিচ (১৮১৮-১৮৮৫) — প্রমুখ রুশ উদারনৈতিক ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ, রুশ ইতিহাসবিদ্যায় ব্যবহারশাস্ত্রীয় (রাষ্ট্রতত্ত্বীয়) স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। — ২৪, ১১৫

কার (Carr), **ই.** — খ্যাতনামা ইংরেজ ঐতিহাসিক, বুর্জোয়া সাহিত্যে বাকুনিনের একটি বিশদ জীবনীর লেখক। — ১০৬

কারামজিন, নিকোলাই মিখাইলভিচ (১৭৮৬-১৮২৬) — বিশিষ্ট রুশ ঐতিহাসিক, রক্ষণশীলতার মতপ্রবক্তা, চেষ্টা করেন রুশ পরারাজতন্ত্রের নিষ্ঠুর জনবিরোধী আমলকে ন্যায়সঙ্গত বলে দেখাবার ও তা চিরস্থায়ী করার। — ১০—১১

কার্লাইল (Carlyle), **টমাস** (১৭৯৫-১৮৮১) — ইংরেজ প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, তাঁর বিশ্ববীক্ষা গড়ে ওঠে জার্মান রোমান্তিকতা আর ক্ল্যাসিক ভাববাদের প্রভাবে। — ৬৯

কুনিৎসিন, আলেক্সান্দর পেত্রভিচ (১৭৮৩-১৮৪০) — রুশ জ্ঞানপ্রচারক, আ. ন. রাদিশ্যেভের অনুগামী। — ১৪

ক্রমওয়েল (Cromwell), **অলিভার** (১৫৯৯-১৬৫৮) — ১৭ শতকের ইংরেজ বুর্জোয়া বিপ্লবের কর্মকর্তা, ইন্ডেপেন্ডেন্ট-পন্থীদের নেতা। — ৯১

গ

গড়ুইন (Godwin), **উইলিয়ম** (১৭৫৬-১৮৩৬) — ইংরেজ প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, শিল্প-বিপ্লবের কালে নৈরাজ্যবাদী ভাবাদর্শের প্রবর্তক। — ৮০

গিবন (Gibbon), **এডওয়ার্ড** (১৭৩৭-১৭৯৪) — বড়ো দরের ইংরেজ রোম্যাণ্টিক ধর্মী ঐতিহাসিক। — ১৩৪

গির্কে (Gierke), **অট্টো** (১৮৪১-১৯২১) — আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের ভেকধারী, তাঁর মন্তব্য — আইন হল রহস্যময় 'লোক প্রাণের' উৎপাদ; জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের সময় তাঁর অনেক কথাই চালু করা হয়েছিল। — ৪৩

গের্ৎসেন, আলেক্সান্দর ইভানোভিচ (১৮১২-১৮৭০) — প্রথম রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের একজন, 'রুশ কৃষক সমাজতন্ত্র' তত্ত্বের স্রষ্টা, বিদেশে স্বাধীন রুশ সংবাদপত্রের প্রবর্তক, 'জেমল্যা ই ভোলিয়া' (ভূমি ও

চ

ট

ত

গ্রুপের মধ্যে ন্যায্য পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম নতুন পুরুষদের শিক্ষিত করে তোলার কর্মসূচির রচয়িতা। — ১৪

প

পুখ্‌তা (Puchta), **গিওর্গ ফ্রিডরিখ** (১৭৯৮-১৮৪৬) — আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের প্রতিনিধি, 'সাধারণ আইন' ও 'প্রতিষ্ঠান বিষয়ে কোর্স'এর লেখক। — ২৯, ৩১—৩২, ১৩৫

পেস্তেল, পিওতর ইভানোভিচ (১৭৯৩-১৮২৬) — 'দক্ষিণী সমাজের' প্রধান, রাশিয়ায় আসন্ন পুনর্গঠনের খসড়া কর্মসূচি 'রুস্কায়া প্রাভদা'র (রুশ সত্য) প্রণেতা, এটিকে তিনি ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সরকারের ওপর অনুজ্ঞা বলে ধরেছিলেন; জাতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন, কৃষি প্রশ্নের আমূল সমাধানের প্রস্তাব দেন। — ১৫—১৭

পোস্ট (Post), **এমিল লিওন** (১৮৯৭-১৯৫৪) — আইনের তত্ত্বে দৃষ্টবাদের প্রবক্তা। — ১৩৪

প্রুধোঁ (Proudhon), **পিয়ের জোসেফ** (১৮০৯-১৮৬৫) — ফরাসি পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, নৈরাজ্যবাদের তত্ত্বকার। — ৭০, ৭৬, ৮১, ৮২, ৮৩, ৯০, ১০৩, ১২৮

প্লেখানভ, গেওর্গি ভালেন্তিনোভিচ (১৮৫৬-১৯১৮) (ছদ্মনাম ন. বেলতভ, ন. কামেনস্কি, ন. আন্দ্রেয়েভিচ, গ. ভালেন্তিনভ, আ. কির্সানভ, দ. কুজনেৎসভ প্রভৃতি; নারোদবাদের পর্বে 'জর্জ', 'বক্তা' ইত্যাদি সাংকেতিক নাম) — রুশ ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মকর্তা, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও প্রচারক, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পরে (১৯০৩ সাল থেকে) মেনশেভিকবাদের একজন নেতা। — ৯৩

প্লেটো (Plato), (খ্রিঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) — প্রাচীন গ্রীক ভাববাদী দার্শনিক, সক্রেটিসের শিষ্য; আকাদেমি নামক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, যা ছিল ভাববাদী দর্শন প্রচার ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কেন্দ্র। — ১৫৮, ১৬৩, ১৬৬, ১৭০

ফ

ফনভিজিন, দেনিস ইভানোভিচ (১৭৪৪-১৭৯২) — রুশ সাহিত্যিক, সর্বজনীন শিক্ষার, 'আলোকপ্রাপ্তি' অনুসারে ক্রমে ক্রমে কৃষকদের মুক্তির পক্ষপাতী; তাঁর রাজনৈতিক ব্যবস্থার আদর্শ ছিল আলোকপ্রাপ্ত রাজতন্ত্র। — ১৪

ফানন (Fanon), **ফ্রানৎস** (১৯২৫-১৯৬১) — আলজেরিয়ার রাজনৈতিক

ভ

ম

র

ল

শ

হ